কবি শ্রীমধুসূদন

কবি শ্রীমধুসূদন

(কাব্য ও কবি-চরিত)

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
প্রণীত

বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়
কুলগাছিয়া-গ্রাম, মহিষরেখা-পোঃ
হাওড়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্র ও ছাত্রীদের করকমলে

স্নেহ-উপহার

কবি শ্রীমধুসূদন

(জন্ম ১২৩০ মৃত্যু ১২৮০)

গ্রন্থকারের নিবেদন

'কবি শ্রীমধুসূদন' প্রকাশিত করিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল ; বিলম্বের কারণ, দেশের এই দারুণ অবস্থা, সে অবস্থায় মনোমত করিয়া ছাপার বহু বিঘ্ন ছিল। এত দিন পরে আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে, এবং আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ শ্যামসুন্দর মাইতির অকৃপণ আনুকূল্যে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে পুস্তকখানি একটু ভদ্রবেশে বাহির হইতে পারিল। এজন্য আমি সর্ব্বাগ্রে আমার ঐ সাহিত্য-সেবাব্রতী প্রকাশককে শুভাশিস ও অভিনন্দন জানাইতেছি।

গ্রন্থখানির সম্বন্ধে ভূমিকাস্বরূপ দুই একটি কথা বলিবার আছে। ইহার বিষয় হইয়াছে—কবি শ্রীমধুসূদনের কাব্য ও কবি-চরিত। কথাটার একটি বিশেষ অর্থ আছে। আমি এই গ্রন্থে মেঘনাদ-বধ কাব্যেরই বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছি, তার কারণ, উহাই মধুসূদনের একমাত্র কাব্যকীর্ত্তি—যাহা শুধুই তাঁহার কবি-প্রতিভার নয়, তাঁহার কবি-জীবনের, বা তাঁহার অন্তরস্থ সেই কবি-পুরুষেরও পূর্ণ-পরিচয় বহন করিতেছে। আধুনিক কাব্যমাত্রেই গীতিকাব্য ; তাহাতে যে কবি-মানসের অতিশয় সজ্ঞান আত্ম-প্রকাশ থাকে তাহা ঠিক এইরূপ নহে, কবি-মানস কবি-চরিত হইতে স্বতন্ত্র। মধুসূদন যে-জাতীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে কবির আত্ম-জীবন বা কবি-মানস কোনটাই প্রতিফলিত হইবার কথা নয়। কিন্তু এই কাব্যেও কবি আপনাকে নানা ছন্দে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন ; তাই আমি তাঁহার কাব্যও যেমন, তেমনই তাঁহার কবি-হৃদয়ের আকুতি ও উৎকণ্ঠা, তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শের অভিমান ও আত্ম-প্রত্যয়, প্রাচীনের বিরুদ্ধে ভ্রূক্ষেপহীন মনোভাব, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার ব্যক্তিগত বাসনা-কামনা, অনুরাগ-বিরাগের—এক কথায়, সেই চরিত্রের—যে একটি সুস্পষ্ট আভাস আছে, তাহাও আমার এই আলোচনার অঙ্গীভূত করিয়াছি, এবং সেজন্য ঐ একখানি কাব্যকেই উপযুক্ত ও যথেষ্ট মনে করিয়াছি। অন্য কাব্যগুলির সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে যাহা বলিয়াছি তাহার অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। অতএব, এই গ্রন্থ শুধুই মধুসূদনের কাব্য-সমালোচনা নয়, ইহাকে কবি-চরিত-কথা হিসাবেও পাঠ করা যাইবে।

তথাপি, মধুসূদনের কবি-প্রতিভা ও কাব্য-নির্ম্মাণশক্তির পরিচয়টি সুসম্পূর্ণ করিবার জন্য আমি এই গ্রন্থে আরও দুইটি অঙ্গ যোজনা করিয়াছি। একটি, তাঁহার নূতন ছন্দের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ; এই নিবন্ধগুলি ইতিপূর্ব্বে আমার বাংলা কবিতার ছন্দ নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে গুলি আদৌ এই উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছিল, পরে বাংলা ছন্দোজিজ্ঞাসার একটা আবশ্যক অধ্যায়রূপে অপর গ্রন্থেও স্থান পাইয়াছে।

ঐ একই উদ্দেশ্যে, আর একটি—বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—কাজ আমি করিয়াছি, আমি মধুসূদনের একটি 'কাব্য-প্রদর্শনী'ও ইহাতে যুক্ত করিয়াছি। আমি জানি, মধুসূদনের কাব্য এ কালে নিতান্ত দায়ে না পড়িলে, কেহ আর পড়েন না, পড়িলেও আদ্যন্ত পাঠ করিবার ধৈর্য্য সকলের নাই। ইহাও জানি যে, আজকাল সকল কবিরই কাব্যগুলি হইতে 'সঞ্চয়ন' করিয়া না দিলে, কবিদের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় না; মধুসূদনের জন্যও তাহা না করিলে, কবি ও পাঠক উভয়ের প্রতি অন্যায় করা হইবে। এই কারণে, আমি মধুসূদনের কাব্যগুলি হইতেও একটি 'সঞ্চয়ন' করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস উহাতেই পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীগণেরও যেমন, কাব্যরসপিপাসু পাঠকেরও তেমনই, সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। সে দিক দিয়া হয়ত' এই গ্রন্থের ঐ অংশই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান হইয়াছে; যদি তাহাই হয়, আমিও কৃতার্থ বোধ করিব।

বড়িশা, ২৪ পরগণা,
মহালয়া, ১৩৫৪।

গ্রন্থকার

সূচী

প্রথম খণ্ড

মেঘনাদবধ-কাব্য-পাঠ

বিষয় | পত্রাঙ্ক

তৃতীয় খণ্ড

মধুসূদনের কাব্য-প্রদর্শনী

বিষয় | পত্রাঙ্ক

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

আরও দুইটি কবিতা

প্রথম খণ্ড

মেঘনাদবধ-কাব্য-পাঠ

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

নব্য-বাংলাকাব্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যে বাঙালী কবি তাঁহার নামের পূর্ব্বে কেন যে বিজাতীয় 'মাইকেল'-শব্দটি সন্নিবিষ্ট হইয়া আছে, বালক-বয়সে তাহা বুঝিতাম না; তাঁহার পুরা নামটিও সকল সময়ে ব্যবহৃত হইত না, বোধ হয় আজিও হয় না—'মাইকেলের গ্রন্থাবলী' 'মাইকেলের মেঘনাদ-বধ'—শব্দ-সংক্ষেপের প্রয়োজনে এইরূপ উল্লেখই আমরা সচরাচর করিয়া থাকি। সে বয়সে কাব্যই মুখ্য বস্তু ছিল, পাঠ ও আবৃত্তির আনন্দে কবির নাম-গোত্র সম্বন্ধে কোন কৌতূহলই মনে স্থান পাইত না। পরে নামের ইতিহাস যখন জানিলাম, তখনও কিছুমাত্র ভাবান্তর ঘটে নাই; কাব্যে যাঁহার সহিত পরিচয়, বাহিরের ইতিহাস তাঁহাকে কিছুমাত্র অপরিচিত করিয়া তোলে নাই। কবি তাঁহার জীবদ্দশায় এই নামঘটিত ব্যাপারের জন্য তাঁহার স্বজাতি-সমাজে কিছুমাত্র অনাদর বা শ্রদ্ধা-প্রীতির অভাব অনুভব করেন নাই—তাঁহার যে সুলিখিত জীবন-কাহিনী ভাগ্যক্রমে আমরা পাইয়াছি, তাহাতে ইহার নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। মধুসূদন দত্ত মাইকেল-নামেই বাঙালীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুগণ তাঁহাকে 'মধু' বলিয়া ডাকিতেন, বাহিরের সমাজে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল 'মাইকেল' নামে। আজ আমরা মাইকেল-নামটি ত্যাগ করিবার পক্ষপাতী, কারণ 'কবি শ্রীমধুসূদন' নামটি অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। এককালে কবির ব্যক্তি-পরিচয় অপেক্ষা কবি-পরিচয়টাই ছিল বড়, তাই নামে কিছু যায় আসিত না, অথবা সেকালের বাঙালীসমাজ কবির ধর্ম্মান্তরকেই জাত্যন্তর বলিয়া মনে করিত, এবং সেদিকে অতিশয় রক্ষণশীল মনোভাবের জন্যই কবিকে শ্রদ্ধা করিলেও, ব্যক্তিটিকে বাঙালী-সমাজ হইতে মনে মনেও দূরে রাখিয়াছিল; তাই 'মাইকেল'-নামটা কখনও বিস্মৃত হইতে চাহিত না। তখন কাব্যের মধ্যে কবির ব্যক্তিত্ব-সন্ধানের প্রয়োজন ছিল না, কবির সঙ্গে কবি-মানুষটির সম্বন্ধ ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ হইত না। আজ কাব্যের মধ্যেই কবির যে প্রাণের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই কাব্যের টীকাহিসাবে মূল্যবান হইয়াছে, তাই কবির নামের সঙ্গে তাঁহার বহির্জ্জীবন-ঘটিত যে

বিজাতীয় শব্দটি সংযুক্ত ছিল, তাহার কোনও বিশেষ মূল্য নাই। কবি নিজেও যেন ইহা জানিতেন, নিজ-মানসে তাঁহার সেই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল ; নিজের সমাধি-লিপি রচনা কবিবার কালে কবি-সুলভ দিব্য চেতনার বশে তিনি অতি সংক্ষেপে যে কয়টি কথায় নিজ পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাই সার সত্য—

মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

—ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত পরিচয়। তাঁহার নাম শ্রীমধুসূদন, তিনি কবি ছিলেন, তাঁহার বাড়ী ছিল কপোতাক্ষ-তীরে সাগরদাঁড়ী গ্রামে, পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, মায়ের নাম জাহ্নবী। কোনও কবির সমাধি-ফলকে এমন পরিচয় আর কোথাও আছে ? বাড়ী কোথায়, পিতার কি নাম—পরিচয় দিবার এই রীতি খাঁটি বাঙালী-রীতি। যে বাঙালী সন্তান খৃষ্টান হইয়া মৃত্যুর পর কবরস্থ হইবে জানে, সে তাহার সেই কবরের উপরেই লিখিয়া রাখিতে চায় যে, সে বাঙালী, তাহার নাম শ্রীমধুসূদন ; তাহার জন্মভূমি, গোত্র ও পিতৃ-মাতৃ-পরিচয় কেহ যেন বিস্মৃত না হয়। মধুসূদনের কাব্যেও এই বাঙালীত্বের নিগূঢ় পরিচয় সর্ব্বত্র জাজ্জ্বল্যমান। জীবনের বাহিরের দিকটায় যাহাকে তিনি যেন অস্বীকার করিতেই সতত যত্নবান, তাহাই 'মর্ম্মে-বিজড়িত-মূল' হইয়া আছে। পাশ্চাত্য আদর্শ ও পাশ্চাত্য কাব্যকলার অনুকরণে তিনি যে নব্য বাংলাকাব্যের সৃষ্টি করিলেন, পরবর্ত্তী বাংলা কাব্যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কলা-কুশলতা ও কল্পনাগৌরব লক্ষিত হইলেও, খাঁটি বাঙালীর কাব্যহিসাবে কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। মধুসূদনের প্রতিভা ও কবি-কীর্ত্তির আলোচনায় এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, এবং তাহাতেই তাঁহার সেই অত্যল্পকালের সাহিত্য-সাধনায় যে অসাধারণ সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল, তাহার কারণ পাওয়া যাইবে।

মধুসূদন হইতে বাংলা কাব্যের যে পুনরুজ্জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই ধারা স্বাভাবিক পরিণতিক্রমে রবীন্দ্রনাথে আসিয়া নিঃশেষ হইয়াছে ; রবীন্দ্রনাথ সেই ধারার যে গতি-পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন—মহাকাব্যের ঘনঘটা গীতিকাব্যে বিগলিত হইয়া যে স্রোতের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার গতি-পথ ভিন্ন হইলেও মূল উৎস একই ; মধুসূদনের কাব্য-প্রেরণাও গীতি-কাব্যেরই অনুকূল। মধুসূদন হইতে

রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিতের ধারা একটানা; মধুসূদন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ—একই যুগের ভাবস্রোতে পরস্পরবাহী তরঙ্গ। অতি আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের পরিচয় দিবার সময় এখনও আসে নাই, এবং অতি আধুনিক রবীন্দ্রনাথকে, বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে একটু পৃথক ও বিশিষ্ট স্থানে, একালের প্রতিনিধিরূপেই বরণ করিতে হইবে। তথাপি ১৮৬০ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত মোটামুটি এই চল্লিশ বৎসর কাল বাংলা-সাহিত্যে বাঙালীত্ব সুস্থ ও প্রাণবন্ত ছিল—বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই-দশকে সাহিত্যের সেই প্রাণধারা বিদ্যমান থাকিলেও তাহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। মধুসূদন ও বঙ্কিমের কালে যে-সাহিত্য জাতির আশা, বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণা হইতে শক্তিলাভ করিয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে প্রবল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভ্যুদয়ে সেই সাহিত্য জাতীয় চেতনা হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়িল—অত্যুচ্চ ও অতি সূক্ষ্ম ভাব-কল্পনায় সমাহিত হইয়া হৃদয়হীন ও রক্তহীন হইয়া পড়িল। তাই আজ নব্য বঙ্গসাহিত্যের সেই আদি কবির দিকে ফিবিয়া চাহিবার প্রয়োজন থাকিলেও মনে হয়, সে যেন এক দূরবিস্মৃত অতীতের অনাবশ্যক কাহিনী: এযুগের বাঙালী তাঁহাকে চিনিবে না, নিজের দেশেই তিনি আজ বিদেশী। কবি তাঁহার সমাধি-লিপিতে সর্ব্বাগ্রে যে অনুনয় করিয়াছেন—

> দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে,—

আজ আর তাহার কোনও মূল্য নাই, জাতি ও দেশের দোহাই দিয়া আজ আর কোনও বাঙালী কবি, বাঙালীর স্মৃতিমন্দিরে একটুকু স্থান দাবী করিতে পারেন না। বাঙালী আজ বঙ্গবাসী নয়—বিশ্ববাসী; কবতক্ষতীরে সাগরদাঁড়ী গ্রামের নাম শুনিলে সে নাসা কুঞ্চিত করিবে। হে সেকালের কবি! তুমি খৃষ্টান হইয়াও যাহা ভুলিতে পার নাই, সে হিন্দু থাকিয়াই তাহা ভুলিতে সক্ষম হইয়াছে। "অন্নপূর্ণার ঝাঁপি" "শ্রীমন্তের টোপর" "নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির"—এ সকলে আর কোন কাজ হইবে না। তোমার কাব্যের অনেক কথাই আজ তাহার নিকটে অর্থহীন—

> করি' স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে
> ফিরিল লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
> বিসর্জ্জি' প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে!

—"বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে"—সর্ব্ব সুখ সর্ব্ব আনন্দের অবসানে মহাশূন্যতা ও রিক্ততার অনুভূতি জাগাইবার জন্য এই যে উপমা তুমি তোমার

কাব্যের শেষ শ্লোকে গাঁথিয়া দিয়াছিলে, বাঙালী-প্রাণের পক্ষে যাহা অপেক্ষা অমোঘ উপমা আর হইতে পারে না, এবং তোমার বাঙালীতম প্রাণের অভ্রান্ত স্বাক্ষর যাহাতে রহিয়াছে—সে উপমার সার্থকতা আজ কয়জন বাঙালী বুঝিবে? অথবা যখন পড়ি—

বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা
হায় রে, সুমনোহর—বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব-বাদ্য, দেবদল যবে
আবির্ভাবি ভবতলে পূজেন রমেশে!

তখন এই বিশেষ উপমাটিতে প্রভাতী বাজনার যে অনির্ব্বচনীয় মাধুরী উপলব্ধি করি—এই কয় পংক্তির মধ্যে কবির বাল্যজীবনের যে স্মৃতি রসকল্পনায় উজ্জীবিত হইয়াছে—বাঙালীর চিত্তে সে রসের প্রবাহপথ আজ রুদ্ধ। নিদাঘ-প্রত্যূষে, অরুণোদয়েরও পূর্ব্বে, শুদ্ধ পল্লীপ্রকৃতির ধ্যান ভঙ্গ করিয়া 'দেবদোলে'র সেই যে প্রভাতী-বাজনা—যে তাহা শুনিয়াছে, সে যদি কবি হয়, তাহা হইলে বাংলা ভাষায় এতবড় একখানা কাব্য রচনা করিবার কালে, বাদ্যসঙ্গীতের বর্ণনায়, এ উপমা তাহার মনে না আসিয়া পারে না, এবং বাঙালী না হইলে এ রস আস্বাদন করা অপরের পক্ষে দুরূহ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাহিত্যের সে আদর্শ, সে প্রেরণা আজ আর নাই —বোধ হয় কোনও সত্যকার কাব্য-প্রেরণাই আর নাই; এমন অবস্থায়, কি জাতীয়তার অনুপ্রেরণায়, কি কাব্যরসের সন্ধানে, বাঙালী আজ মধুসূদন দত্তকে স্মরণ করিতে অপারগ।

কিন্তু মধুসূদন কি সত্যই বাংলাসাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন? এত কথার পরেও এ প্রশ্ন অবান্তর বা নিস্প্রয়োজন নহে। মধুসূদনের মত কবি কি কোনও কালে মরিয়া থাকেন? তাহা হইলে ত কালিদাসও বাঁচিয়া নাই। এ যুগের কবি রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

কালিদাস ত' নামেই আছেন,
আমি আছি বেঁচে।

সাধারণ মানুষ আমরা—কালের সঙ্গে, বংশপরম্পরাগত জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের কোনও যোগ নাই, জীবন বা বাঁচিয়া-থাকা অর্থে যাহা বুঝি, তাহাতে 'মরিয়া অমর হওয়া' একটা কথার কথা। আয়ুষ্কালের পরিমাণে যে অস্তিত্ব, তাহাই একটু দীর্ঘ হওয়ার মত সৌভাগ্য আর কি আছে? কবি রহস্যচ্ছলেও একটা বড় সত্য কথা বলিয়াছেন। এ বাঁচা মানুষ একবারই বাঁচে, এবং

তাহাও অতি শীঘ্র ফুরায় বলিয়া এত অমূল্য! মধুসূদন দত্ত আর বাঁচিয়া নাই। তুমি আমি বাঁচিয়া আছি, মধুসূদন নামমাত্রে পর্য্যবসিত; তুমি আমি এখনও কর্ম্মেন্দ্রিয়-সম্পন্ন জীবরূপে সূর্য্যালোকে বিচরণ করিতেছি। কিন্তু মধুসূদন তবু নামে বাঁচিয়া আছেন, তোমার আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিবে না—এই জীবন্ত-বর্ত্তমান অন্ধকার-অতীতে বিলীন হইয়া যাইবে। অতএব এই নামে বাঁচিয়া থাকাও একপ্রকার বাঁচা—যাহাদের জীবন অসাধারণ, তাহারা মৃত্যুর পরে নাম-জীবন ভোগ করে। কিন্তু কবিগণ, শুধুই নামে নয়, তারও চেয়ে সত্যকার অর্থে বাঁচিয়া থাকেন, আর কেহ তেমন করিয়া বাঁচে না। যাহারা কর্ম্মী বা চিন্তাবীর রূপে ইতিহাসে অমরতা লাভ করে তাহারাও মৃত্যুর পরে কবির মত বাঁচিয়া থাকে না। কালিদাস বা মধুসূদন কেবল নামে বাঁচিয়া নাই—তাঁহাদের কবিজীবন তাঁহাদের কাব্য-সন্ততির দেহে অমর হইয়া আছে; তাহাতেই তাঁহাদের প্রাণবায়ু নিঃশ্বসিত হইতেছে, তাঁহাদের নিজ-কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইতেছে—তাঁহাদের হৃদয়-মনের ভঙ্গিমা অবিকৃত অবস্থায় সর্ব্বকালের গোচর হইয়া আছে—তাঁহাদের ব্যক্তি-শরীরই অমর হইয়া আছে। কারণ কবিদের বাণী কেবল অর্থবান নয়, তাহার ধ্বনিরও একটা বিশেষ মূর্ত্তি আছে, এবং সে মূর্ত্তি কবিরই প্রাণের মূর্ত্তি। এমনই করিয়া বাণী-ব্রহ্ম কবি-বিশেষের ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করিয়া অমর শরীর ধারণ করে, কাব্যের মধ্যে তাহার সেই রূপ জাগ্রত প্রত্যক্ষ হইয়া চিরদিন বাঁচিয়া থাকে। তাহাকে আমরা যেমনভাবে চিনি, কোনও জীবিত মানুষকেও তেমনভাবে চিনি না। যাহা কিছু অবান্তর—যাহা বাস্তব-জীবিত দশায় প্রকৃত পরিচয়ের পক্ষে বাধা হইয়াছিল, সে সকল জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া কবি-মানুষের স্বরূপটি প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি অপেক্ষা তাহা সত্য ও যথাযথ—এবং তাহা জীবিত; কারণ, কবির সেই কাব্য-দেহে তাঁহার চোখের চঞ্চল চাহনি, কণ্ঠস্বরের আবেগপূর্ণ আকুতি, এমন কি নিঃশ্বাসপতন কিছুই নষ্ট হয় না। কবি ভিন্ন আর কেহ এমন প্রত্যক্ষভাবে বাঁচিয়া থাকে না।

আরও একপ্রকার অপ্রত্যক্ষভাবে কবিরা বাঁচিয়া থাকেন। যতদিন বংশ-লোপ না হয়, ততদিন দূরতম বংশধরের মধ্যে পূর্ব্ব-পুরুষ যেমন বাঁচিয়া থাকেন, তেমনই যতদিন কোনও সাহিত্যের জীবিত ধারা লুপ্ত না হয়, ততদিন সেই সাহিত্যের নিত্যনব বিবর্ত্তনের মধ্যেও গৌণভাবে কবির প্রভাব বিদ্যমান থাকে। আমার রক্তে যেমন পূর্ব্ব-পুরুষের রক্তের প্রভাব রহিয়াছে, সে প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন না হইলেও তাহা যেমন কখনই নিষ্ক্রিয় নহে, তেমনই সাহিত্যের

ভাষা-দেহে ও ভাব-শোণিতে পূর্ব্ব কবিপিতৃগণের শোণিত-ধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে, মনে বিস্মৃত হইলেও দেহে তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নেই। মধুসূদনের সম্বন্ধে এ কথা যেমন খাটে, তেমন উপস্থিত আর কাহারও সম্বন্ধে নহে। আজিকার কাব্যে মধুসূদনের বাণী-ভঙ্গী ও ছন্দ-সঙ্গীত প্রত্যক্ষ না হইলেও, তাহার প্রচ্ছন্ন প্রভাব কোনও সাহিত্যদর্শীর অগোচর নহে।

তাই মধুসূদনকে বিস্মৃত হইলেও বাংলার কাব্য-সাহিত্য হইতে তাঁহাকে বহিষ্কার করা বাঙালীর পক্ষে অসাধ্য। বাঙালীর সাহিত্য-বোধ, তথা জাতীয়তা-বোধ এ যুগে যেখানে আসিয়া ঠেকিয়াছে, বাংলা সাহিত্যের যে গতি-প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে, তাহাই স্মরণ করিয়া আজ এত কথা বলিতে হইতেছে; নতুবা অন্য সমাজে এমন সকল কথা বলিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। বাঙালীর বাঙালীত্ব যে পরিমাণে লুপ্তপ্রায়, কবি শ্রীমধুসূদনও সেই পরিমাণে বাংলা-সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। মধুসূদন বিপুল বিক্রমে স্বহস্তে খাত কাটিয়া যে কাব্যধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা যে সেকালের নবপ্রবুদ্ধ বাঙালী-সন্তানকে কতখানি আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করিয়াছিল, সেকালের সেই সাহিত্যিক নৈরাশ্যের মধ্যে কি আশার সঞ্চার করিয়াছিল, সে কাহিনী ইতিহাসগত হইয়া আছে। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের এই কয়টি কথা এখানে উদ্ধৃত করা অবান্তর হইবে না। মধুসূদনের প্রতিভার মূল প্রবৃত্তি ও তাহার প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই—বড়ই বড়কে বুঝিতে পারে। মধুসূদনের মৃত্যু হইলে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সেই মনোভাব অকপটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন; বাঙালীর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যে আদি ও শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিককে আকুল করিয়াছিল, নিদ্রায় জাগরণে যাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না, সেই ভাবুক মনীষী ও মহাকবি, দ্রষ্টা ও স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিম, মধুসূদন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল—নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।

"স্মরণীয় বাঙালীর অভাব নাই। কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন-নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল।

"সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ, 'শ্রীমধুসূদন!'"

এ সকল হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রও মধুসূদনকে বাংলার নবজাগরণের কবি বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। বহুকাল পরে বাঙালীর জীবনে যে গতিপরিবর্ত্তন হইল, সাহিত্যে তাহার প্রথম সূচনা মধুসূদনের প্রতিভায়। আধুনিক সাহিত্যের সেই আদি প্রতিভার পরিচয়, আজ প্রায় আশি বৎসর পরে নূতন করিয়া সাধন করিতে হইবে। নূতন করিয়া বলিতেছি এই জন্য যে, প্রায় সমসাময়িক, বা সে যুগের প্রাচীন সংস্কারমুগ্ধ সমালোচক মধুসূদনের প্রতিভার সম্যক ধারণা করিতে পারেন নাই। এ পর্য্যন্ত আধুনিক সাহিত্যের কোনও ইতিহাস রচিত হয় নাই, এ সাহিত্যেব আদর্শ বা গতিপ্রকৃতির বিশ্লেষণমূলক কোনও সুনিপুণ আলোচনা হয় নাই; তাই মধুসূদনের একাধিক জীবন-কাহিনী লিখিত হইলেও তাঁহার কবিমানস ও কবিকীর্ত্তির সঠিক মূল্য নির্দ্ধারিত হয় নাই। স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার যে জীবনবৃত্ত লিখিয়াছেন, তজ্জন্য সাহিত্য-সেবী বাঙালীমাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ; উক্ত গ্রন্থে কবিব জীবন-কাহিনী, সাহিত্য-সাধনা ও কাব্য-পরিচয় যেরূপ পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্য সহকারে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এই গ্রন্থ এক হিসাবে আদর্শস্থানীয় হইয়া আছে। কিন্তু লেখক কবি-চরিত্র ও কবি-কীর্ত্তিব আলোচনায় যে আদর্শ ধরিয়াছেন, তাহাতে সেই যুগের মূল প্রবৃত্তিকেই অস্বীকার করিয়াছেন; মেঘনাদবধ-কাব্যের সমালোচনাকালে তিনি প্রাচীন আলঙ্কারিকের পন্থাই অনুসরণ করিযাছেন; সেই কাব্যের অন্তরালে যে নবজাত দেশশিশুর ক্রন্দনধ্বনি রহিয়াছে, এক নূতন মানুষের নূতন পিপাসা রহিয়াছে—তাহা একেবারেই তাঁহার হৃদয়গোচর হয় নাই। সে দিক দিয়া তাঁহার সমালোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। যে কালে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, মধুসূদন সে কালেরও অগ্রবর্ত্তী। 'মধু-স্মৃতি' নামক দ্বিতীয় গ্রন্থখানির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। ইহার সঙ্কলয়িতা মধুসূদন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য একত্র সঙ্কলন করিয়া, সুধী পাঠকমাত্রেরই নিজ-বুদ্ধি ও বিচারশক্তির সহায়তা করিয়াছেন—এই তথ্যরাশি হইতে মধুসূদনের পরিচয় গড়িয়া লইবার ভার পাঠকের। তৃতীয় উল্লেখযোগ্য একটি বিস্তৃত প্রবন্ধের কথা এস্থলে বিশেষ করিয়া বলা উচিত মনে করি। সুপণ্ডিত ও সুকবি স্বর্গীয় শশাঙ্কমোহন সেন 'মধুসূদন' নামে এই পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা-রীতি কিঞ্চিৎ বক্র ও জটিল; হয় ত'

এই জন্য তাঁহার রচনাগুলি পাঠক-সমাজে তেমন আদৃত হয় নাই। কিন্তু এই ‘মধুসূদন’ প্রবন্ধে এ যাবৎ একমাত্র তিনিই মধুসূদনের কবি-প্রতিভা ও অন্তর্জ্জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপযুক্ত আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রচনাভঙ্গীর দোষ আছে; পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তির যথেষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও লেখকের প্রস্তাবটির মধ্যে উক্তির অসম্বদ্ধতা ও কবিজনোচিত প্রগল্ভতা আছে, কিন্তু মধুসূদন সম্বন্ধে তিনি এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহার মৌলিকতা ও গভীরতা সাতিশয় চমকপ্রদ। কবিচিত্তের সহিত যে আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত না হইলে কবি-পরিচয় যথার্থ হইতে পারে না, সেই সহানুভূতি ও অন্তর্দ্দৃষ্টির প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই প্রবন্ধে আছে।

মধুসূদনের মেঘনাদ-বধই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কীর্ত্তি। তাহার পূর্ব্বে বা পরে তিনি যাহা কিছু রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কবিমানসেব কাব্যকলাকুতূহল প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার নাটকগুলিতে নবতন আদর্শের জয়োৎফুল্লতাই আছে—নাট্যকলার সংস্কারসাধনই তাঁহার অভিপ্রায়। প্রধানতঃ সাময়িক প্রয়োজনের তাড়নায় এবং কতকটা নূতন কিছু করিবার উৎসাহে, তিনি এইগুলি লিখিয়াছিলেন; তাহাতে শক্তির পরিচয় থাকিলেও স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় নাই। ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের কাব্যরস আস্বাদন করিয়া তাঁহার কবি-হৃদয়ের যে উল্লাস, সেই রসগ্রাহিতাই এই নাটকগুলির জন্মহেতু। এইরূপ রচনাকে tour de force বা সাহিত্যিক পালোয়ানী বলা যাইতে পারে। ‘ব্রজাঙ্গনা’ ও ‘বীরাঙ্গনা’ এই দুই কাব্যের একখানিতে তিনি পুরাতনের নাম মাত্র রক্ষা করিয়া নূতন ভঙ্গীতে গীতিকাব্য রচনার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; ‘বীরাঙ্গনায়’ একটি সম্পূর্ণ নূতন form বা রচনা-ভঙ্গী বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছিলেন। এই দুই কাব্যের ভাব-কল্পনা খুব গভীর নহে—কাব্যকলার সংস্কার ও সমৃদ্ধিসাধনই ইহাদের একমাত্র সার্থকতা। প্রসঙ্গক্রমে ‘ব্রজাঙ্গনা’ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। ‘ব্রজাঙ্গনা’র কাব্যগুণের যে অতিরিক্ত প্রশংসা এককালের কাব্যরসিক-মহলে শুনা যাইত এবং হয়ত এখনও কেহ কেহ করিয়া থাকেন, তাহা বিচারসহ নয়—অনেকে এই কাব্যখানিকে বৈষ্ণব-কবিতার সমকক্ষ-জ্ঞানে আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু ‘ব্রজাঙ্গনা’র কবিতাগুলি অতিশয় সরল সহজ গীতি-কবিতা মাত্র, উহাতে ধ্যান-গভীর আত্মিক অনুভূতি বা প্রাণগত উৎকণ্ঠার দিব্য মূর্চ্ছনা নাই—উহার ভাষাও যেমন একান্তই রীতি-সম্মত, ভাবও তেমনই আলঙ্কারিক

কল্পনার (Conceit)কৌশলপূর্ণ। 'ব্রজাঙ্গনা'য় যে নূতন আকারের শ্লোক (Stanza) এবং যে স্বচ্ছন্দ সুরস্রোত আছে, তাহাতেই সেকালের কাব্যে উহার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। নতুবা বৈষ্ণব-পদাবলীর তুলনায় উহার ভাবৈশ্বর্য্য অকিঞ্চিৎকর বলিতে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সকল রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য—কাব্যকলার সংস্কারসাধন; উত্তরকালে ঐ একই উদ্দেশ্যে মধুসূদন সনেট-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'ব্রজাঙ্গনা'য় কোনও মৌলিক কাব্য-প্রেরণা নাই, বরং তাহাতে একপ্রকার Literary Revivalism-এর লক্ষণ আছে। 'ব্রজাঙ্গনা' যে এককালে এত জনপ্রিয় হইয়াছিল, তার কারণ, প্রথমতঃ, রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্ক মাত্রেই বাঙালীর চিত্তে অবশে রস-সঞ্চার হয়; দ্বিতীয়তঃ, এই কাব্যের লিরিক-ভঙ্গীই ছিল নূতন—ঠিক এই ধরণের গীতি-কবিতা পূর্ব্বে ছিল না; পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা পাঠ অপেক্ষা গানেরই অধিকতর উপযোগী; মধুসূদনের রচনা গীতিসুরযুক্ত কবিতা।

নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকা-রমণ,

অথবা—

কেনে এত ফুল তুলিলি, সজনি,
ভরিয়া ডালা?

—প্রভৃতির যে গীতি-মাধুরী, তাহা কবিতাহিসাবেই উপভোগ্য—গান করিয়া শুনিবার অপেক্ষা রাখে না। 'ব্রজাঙ্গনা' যে বৈষ্ণব-পদাবলীর পর্য্যায়ভুক্ত নয় অর্থাৎ রাধা-বিষয়ক হইলেও এ কাব্য যে নিছক কাব্য মাত্র—তাহা কবিতাগুলির বিষয় দেখিলেই বুঝা যায়। 'ব্রজাঙ্গনা'র রাধা বৃন্দাবনের রাধা নয়, তাহার শ্যাম-বিরহও বৈষ্ণবী কৃষ্ণ-বিরহ নহে। রাধার ভূমিকামাত্র গ্রহণ করিয়া কবি এই কাব্যে আধ্যাত্মিকতাবর্জ্জিত প্রকৃতি-প্রেমের রসসৃষ্টি করিয়াছেন। কবিতাগুলির নাম এইরূপ—প্রতিধ্বনি, ঊষা, পৃথিবী, কুসুম, মলয় মারুত, গোধূলি, কৃষ্ণচূড়া, বসন্তে। তাঁহার কবিতায় প্রকৃতি-রাধাই কৃষ্ণ, এবং কবিচিত্তই রাধা হইয়াছে। এ কাব্যেও মধুসূদনের স্বভাবসিদ্ধ Paganism জয়ী হইয়াছে।

অতএব মধুসূদনের কবি-প্রতিভা ও কবি-কীর্ত্তির সম্যক পরিচয় এই সকল রচনায় নাই; যে একখানি কাব্যে তিনি নিজের কবি-স্বপ্ন ও কবি-শক্তি নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা 'মেঘনাদবধ'। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসে বাঙালীর যে ভাব-জাগরণ তাহার সাহিত্যে ঘটিয়াছিল, তাহাকে যদি আজ বুঝিয়া

লইবার প্রয়োজন থাকে, তবে 'মেঘনাদবধে'র কবিকে ঐতিহাসিক ও কাব্য-রসিক —উভয়ের দৃষ্টিতে চিনিয়া লইতে লইবে। 'মেঘনাদবধে'র কাহিনী বা বিষয়-বস্তু অপেক্ষা সে কাব্যের অন্তর্নিহিত কবি-স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্নেরই আবেগসম্ভূত ছন্দধ্বনি, এই দুইটিকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। সে কাব্যের রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ কেবলমাত্র কাহিনীঘটিত চরিত্র নহে, বাল্মীকি কৃত্তিবাসের সন্ততি তাহারা নহে—কবি তাহাদিগকে স্বকীয় স্বপ্নে দৃষ্টি ও সৃষ্টি করিয়াছেন। সকল বড় কাব্যের কল্পনামূলে কবির যে অবচেতনা ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে, মেঘনাদবধেও তাহা হইয়াছে ; প্রাণের সেই স্বপ্নোৎকণ্ঠা জাগ্রত-চেতনার রূপ-জগতে প্রতিফলিত করিবার নিমিত্ত যে রূপকের প্রয়োজন হয়—মেঘনাদবধেও সেই রূপক-রূপ আছে। কবির সেই স্বপ্ন সেই যুগেরই প্রতীক—তাঁহার নিজেরও অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ে আসন পাতিয়াছে, কবিকে আবিষ্ট করিয়াছে। সে স্বপ্ন সফল হইবার নয়, তাই মেঘনাদবধ মহাকাব্য হইতে পারিল না, জয়োল্লাসের পরিবর্ত্তে ট্র্যাজেডির করুণরসে অভিষিক্ত হইয়াছে—কবির সে স্বপ্ন আমাদের কাব্যসাহিত্যেও নিস্ফল হইয়াছে। কেবল সেই স্বপ্নের আবেগসম্ভূত যে ছন্দধ্বনি, তাহাই আধুনিক বাংলা কাব্যে ভাবগম্ভীর গভীর আবেগের বাণীকে মহিমান্বিত করিয়াছে—বঙ্গবাণীর একতারাকে সপ্তস্বরায় পরিণত করিয়াছে। পরবর্ত্তী বাংলা পয়ারের বিচিত্র বিকাশের মধ্যে মধুস্দনের সেই ছন্দধ্বনি—তাঁহার কবিপ্রাণের সেই অসীম আকুতি অমর হইযা আছে ; মধুস্দনের আত্মা এমনই করিয়া বাংলা কাব্যে চিরবসতি স্থাপন করিয়াছে।

এই মধুস্দনকে জানিবার প্রয়োজন আছে। জীবনের গতির মত সাহিত্যের গতিও আজ রুদ্ধপ্রায়—একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্ভব নয়। সাহিত্যের দিক দিয়া সেই গতিপথের আরম্ভস্থলটি এখন একবার খুঁজিযা দেখিতে হইবে। এজন্য যেখানে "মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত কবি শ্রীমধুস্দনে"র ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যাইতেছে—"তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধিস্থলে, জন্ম যদি তব বঙ্গে"—আজ সেইদিকে একবার চাহিয়া, কবির শুধু নামধাম নয়—মৃতজনের পরিচয় নয়—তাঁহার অমর আত্মার অমৃতবাণী কাণ পাতিয়া প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাব্য ও কবি ; জীবন-কথা, কবিচরিত্র ও যুগ-প্রভাব , কাব্য-প্রেরণার মূলে কবি-প্রাণের গভীরতর আকৃতি।

কাব্য বুঝিবার পক্ষে কবিকে বুঝিবার প্রয়োজন আছে, আধুনিক কাব্য-সমালোচনার ইহা একটি সর্ব্ববাদিসম্মত নীতি। আবার আধুনিক কবিতায় কবির ব্যক্তিত্ব বা আত্মভাবপ্রাধান্য এতই প্রবল যে, কবির সহিত সহমর্ম্মিতা ব্যতিরেকে কাব্যের রসাস্বাদন সম্ভবপর নহে। ইহা সত্য হইলেও, সর্ব্বত্র এই নীতির প্রয়োগ সহজ নহে ; কারণ, আধুনিক কবিতায় কবির আত্মপ্রকাশ যতটা সহজ ও স্বাভাবিক, এবং সেই কারণে কবির জীবনকাহিনী কাব্য বুঝিবার পক্ষে যতটা সাহায্য করে, সেকালে কাব্যের যে আদর্শ ছিল—কাব্যরচনার যে রীতি ছিল—তাহাতে কবির আত্মপ্রকাশের ততটা সুযোগ ছিল না। মধুসূদনের জীবন ও কাব্য মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায়, এই দুইয়ের যোগ খুব সুস্পষ্ট নহে। তথাপি যোগ যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ, না থাকিয়া পারে না। মধুসূদনের কাব্য ও মধুসূদনের জীবন দুই-ই ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সেই আলোচনায় কবি ও কাব্যকে পৃথক করা হইয়াছে ; কাব্যবিচারে অলঙ্কারশাস্ত্রকেই প্রামাণ্য করা হইয়াছে, এবং কবিজীবন ও কবিচরিত্রের সহিত কাব্যের যেটুকু সম্পর্ক স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাও কাব্যের তথাসম্মত ত্রুটিবিচ্যুতির কারণ-নির্ণয়ের জন্য। মধুসূদনের চরিতকার ও সমালোচক স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু এইভাবে কবি ও কাব্যকে দেখিয়াছেন। ইহার জন্য কতকটা দায়ী সেকালের সমালোচনা-পদ্ধতি, এবং কতকটা কবি নিজে। 'মেঘনাদবধ-কাব্য' ক্লাসিক আদর্শে রচিত হইলেও উহার মূল প্রবৃত্তি রোমান্টিক—এই দুই ভাবের সমন্বয় করিতে না পারিলে সমালোচকের ভুল হওয়া বিচিত্র নহে। মহাকাব্য-জাতীয় কবিতায় কবির ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তি প্রশ্রয় পাইলে তাহাতে যে দোষ ঘটে, এ কাব্যে সে দোষ ঘটিয়াছে ; কবি যদি একটি বিশেষ আদর্শে কাব্যরচনা করিতে বসিয়া সেই আদর্শ রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে যাহারা সেইরূপ বহির্গত আদর্শের পক্ষপাতী বলিয়া সেই-জাতীয় কাব্যরস প্রত্যাশা করে, তাহারা কবিকে

ক্ষমা করিবে না। অতএব কবি নিজেই যেন একটা বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, ‘মেঘনাদবধ-কাব্য’ ‘বৃত্রসংহার’ নহে—এ কাব্যের বাহ্যিক লক্ষণ যেমনই হউক, ইহার রচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কবির সজ্ঞান অভিপ্রায় যেমনই হউক, মধুসূদন যে হেমচন্দ্রের মত একখানি রীতিমত মহাকাব্য রচনা করিতে পারেন নাই, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য; কারণ, তাহা হইলে আমরা একটি নকল মহাকাব্য—একটি চূড়ান্ত বীররসের পদ্যময় গদ্য-গদা মাত্র লাভ করিতাম, এমন একখানি কাব্য পাইতাম না। ‘মেঘনাদবধ-কাব্যে’র কবিত্ব এই হিসাবে আরও খাঁটি যে, এই কাব্য সেই যুগেরই অবশ্যম্ভাবী ফল; ইহার অন্তরালে যে কবিমানস রহিয়াছে, তাহা সেই যুগেরই আবহাওয়ায় উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। অতএব, সেই যুগ, কবির চরিত্র ও কবির জীবন—এই তিনের যুগপৎ পরিচয় ব্যতিরেকে, কবিকেও যেমন—কাব্যকেও তেমনই, সম্যক্ বুঝিবার উপায় নাই। ইহাই বর্ত্তমান প্রসঙ্গের আলোচ্য বিষয়।

প্রথমেই, মধুসূদনের জীবনকাহিনীর যে কয়টি কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক, এখানে সংক্ষেপে তাহাই বলিব। বালক ও যুবক মধুসূদনের দেহমনের স্বাস্থ্য ছিল অটুট, এবং সেই সঙ্গে ছিল অসীম আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা; পারিপার্শ্বিক শান্ত স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞা, স্নেহ ও শুশ্রূষার সুখশয্যার প্রতি অনাসক্তি—এক কথায়, একটা অতিশয় অশান্ত প্রকৃতি তখন হইতেই আমরা লক্ষ্য করি। ইহার ফলে ১৭।১৮ বৎসর বয়সেই —ধনীগৃহের একমাত্র দুলাল, পিতামাতার নয়নমণি—মধুসূদন, সকল স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া বন্ধুহীন সহায়সম্পত্তিহীন অজানা একক জীবনের পথে নির্ভয়ে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। দ্বিতীয় একটি কথা সেই সময়ের কাহিনী হইতেই স্মরণীয় হইয়া উঠে, তাহা এই যে, সেই অশান্ত বালকের একটি বিষয়ে মনের ভাব স্থির ছিল—সে একজন বড় কবি হইবে। পরে বালক যুবক হইল, বয়স বাড়িয়া ত্রিশ পার হইয়া চল্লিশের দিকে চলিল, তথাপি বাল্যের সে সংকল্প সে বিস্মৃত হয় নাই। বিদেশে বিজাতীয় সমাজে বাসকালে জীবন-সংগ্রামে কাতর মধুসূদন ইংরেজি কাব্যরচনা করিয়া প্রাণের সেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে বিমূঢ়ের মত দিনগত-পাপক্ষয় করাই ছিল তাঁহার একমাত্র কাজ। তথাপি সেই উঞ্ছবৃত্তির মধ্যেও মানসিক তপশ্চর্য্যার বিরাম ছিল না, তখনও

তিনি কবি হইবার জন্য সাধনা করিতেছিলেন—হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন, ও সেই সকল ভাষার মহাকবিগণের কাব্যের সহিত পরিচয়-সাধন করিতেছিলেন। এই কঠিন তপশ্চর্য্যা বা সারস্বত সাধনার ঐকান্তিক আগ্রহ মধুসূদনের অসংযত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের একমাত্র বন্ধন ছিল, ইহাই একপ্রকার ধর্ম্ম বা চরিত্র-শক্তিরূপে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। বালক ও ছাত্র মধুসূদনের পরে আমরা একেবারে বাংলা সাহিত্যের আসরে কবি মধুসূদনকে অবতীর্ণ হইতে দেখি। ইহার মধ্যবর্ত্তীকালের ইতিহাস একপ্রকার অজ্ঞাত-বাসেরই মত। মধুসূদন তখন দেশীয় খ্রীষ্টানসমাজভুক্ত; পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া মাদ্রাজ হইতে দেশে ফিরিয়াছেন, পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারলাভ তখনও ঘটে নাই। পরে সেই সম্পত্তিলাভ ঘটিয়াছিল, এবং তাহার ফলে তিনি তাঁহার বহুকালের অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য বিলাত যাত্রা করিলেন। এই সম্পত্তিলাভই তাঁহার কাল হইল, তিনি সাহিত্য-জীবন একরূপ ত্যাগ করিয়া, চরিত্রের একমাত্র সংযমস্থলটি হারাইয়া, বিলাস-ব্যসনের স্বপ্নে নূতন পথে যাত্রা করিলেন, এবং বিদেশে ও দেশে নানা দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া শেষে একপ্রকার আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার জীবনের সেই শোচনীয় কাহিনীর সঙ্গে এই আলোচনার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তাহার বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সেই অজ্ঞাতবাস হইতে দেশে ফিরিয়া, মাত্র ৫।৬ বৎসরকাল বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যে সাধনা তিনি করিয়াছিলেন—একরূপ ঘটনাচক্রে চালিত হইয়াই, প্রথমে নাটক ও শেষে কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যেভাবে তিনি বাংলা কাব্যের গতি ফিরাইয়া দিলেন—'the man and the moment'-এর মত তাঁহার যে আকস্মিক আবির্ভাব এবং তাঁহার কবিপ্রতিভার যে দ্রুত উন্মেষ ও ত্বরিত পরিণতি লক্ষ্য করা যায়, তাহার মত বিস্ময়কর ঘটনা অন্ততঃ আমাদের সাহিত্যে আর নাই। ইংরেজীতে যাহাকে 'man of destiny' বলে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদনকে তাহাই বলিয়া মনে হয়। এই কবি ও তাঁহার কাব্য যিনি আলোচনা করিবেন, তিনি যদি কবির জীবনকে তাঁহার কাব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন, তবে কবির পরিচয় ও কাব্য-পরিচয় দুই-ই অসম্পূর্ণ হইবে।

কবিজীবনের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা হইতে কাব্যরচনার সময়ে কবিচিত্তের অবস্থা কিঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারি। মধুসূদন

বাল্যে গ্রাম্য পাঠশালায় পড়াশুনা করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার মেধা ও স্মৃতিশক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল, এজন্য সেই কালেই বাংলা ভাষা ও বাঙালী-জীবনের কতকগুলি মূল সংস্কার তাঁহার অন্তরে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পরে আর কখনও মাতৃভাষা বা স্বজাতীয় সমাজের সহিত এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। কলিকাতায় ছাত্রজীবনে, বারো হইতে আঠারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, তিনি যে সমাজে বাস করিয়াছিলেন তাহা প্রাচীন ও নব্য আদর্শের একটা অস্বাভাবিক মিশ্রণে প্রায় বীভৎস হইয়া উঠিতেছিল—'ইয়ং বেঙ্গলে'র স্বেচ্ছাচার এবং তৎপ্রতি প্রবীণগণের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মনোভাব, এমন কি তাহাকে প্রশ্রয়দান—মধুসূদনের মত যুবকের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হয় নাই। গ্রামে বাসকালে বাঙালী জীবনের যে সারল্য ও বাংলার জলমাটির যে স্নিগ্ধ মাধুরী তাঁহার বালক-হৃদয় পুষ্ট করিয়াছিল তাহাও ক্রমশ যেন মুছিয়া গেল। তারপর হিন্দু-কালেজের সেই ভাবপ্রবণ, আত্মাভিমানী দুরাকাঙ্ক্ষ বালক-ছাত্র বিদেশী সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিদেশী ভাব-জীবনকে আত্মসাৎ করিয়াছিল; বাংলাভাষা ও বাঙালী-জীবনকে জীর্ণ মলিন বস্ত্রখণ্ডের মত পরিত্যাগ করিয়াছিল, এবং পরিশেষে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া সে গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে আপনাকে স্বজাতি-সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত করিয়াছিল। তারও পরে, বহুকাল বিদেশে বাস করায় মাতৃভাষার অভ্যাসও আর ছিল না। অতএব কবি যখন বাংলা কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাকে নূতন করিয়া প্রাণে-মনে বাঙালী হইতে হইল, না হইলে বাংলা কাব্যরচনা সম্ভব হইত না। বহু বৎসরের বহু বিরুদ্ধ ভাবচিন্তা, নানা বিজাতীয় সংস্কারের উপরি-সঞ্চিত স্তর ভেদ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার জীবনের সেই নিম্নতলের ভাব-স্তরে পৌঁছিতে হইয়াছিল। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা আবার যখন তাঁহার প্রাণ-কর্ণে কথা কহিল তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়া কবির অন্তররাত্মা বোধ হয় গাহিয়া উঠিয়াছিল।—

> তব কণ্ঠস্বর
> যেন পূর্ব্বজন্ম হ'তে পশি' কর্ণ 'পর
> জাগাইছে অপূর্ব্ব বেদনা।

কবিচিত্তের তদানীন্তন অবস্থার এই গেল এক দিক, অপর দিকে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই 'মেঘনাদবধ'-কাব্যের কবির পক্ষে প্রধান সঙ্কট। তাঁহার সেই আবেগ-প্রবণ উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রে সেই যুগের যুগ-প্রবৃত্তি যেন অজ্ঞাতসারে বাসা বাঁধিয়াছিল,

এবং তাহাই তাঁহার প্রতিভা-উন্মেষের প্রধান হেতু। এক্ষণে উনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধির প্রবল প্রভাবের একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে যুগের বাঙালী সমাজে প্রাণের জড়তা ও বিমূঢ়তা যেমন চরমে পৌঁছিয়াছিল, তেমনি শহরের নবশিক্ষিত সমাজে একটা নৈতিক সমস্যা-সঙ্কট, ও অল্পশিক্ষিত ধনীসমাজে একটা বিসদৃশ আদর্শ-বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছিল। মধুসূদন চিন্তাশীলতা বা বিচারবুদ্ধির ধার ধারিতেন না ; হিন্দু-কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের মারফতে যে মুক্ত স্বাধীন বলিষ্ঠ জীবনযাত্রা ও আত্ম-প্রত্যয়শালী মানব-সমাজের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া, তখন হইতেই মনে মনে দেশীয় সমাজের পরিবেষ্টনী হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছিলেন ; এই সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্যই তিনি শেষে খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন। এইরূপ মনোভাবের পক্ষে তাঁহার পিতার চরিত্র ও পারিবারিক আবহাওয়াও যথেষ্ট অনুকূল হইয়াছিল। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত অতিশয় ঢিলা প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি পর পর তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় ও বুদ্ধি দুই-ই প্রশস্ত হইলেও, নীতিজ্ঞান খুব প্রখর ছিল না, কোনও সমস্যাই তাঁহাকে পীড়িত করিত না। পুত্রের চরিত্র ও মতিগতি সম্বন্ধে তাঁহার কোনও উদ্বেগ ছিল না। মধুসূদনের পিতা ও পিতৃ-পরিবারের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা ও পারিবারিক আদর্শের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, মধুসূদনের জীবনে যে বিপ্লব সম্ভব হইয়াছিল, সেই একই শিক্ষা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে তাহা সম্ভব ছিল না—মধুসূদনের সহিত চরিত্রগত পার্থক্য না থাকিলেও, তাহা ঘটিত কিনা সন্দেহ। নবশিক্ষায় শিক্ষিত মধুসূদন এক দিকে যেমন পাশ্চাত্য আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তেমনই সেই প্রভাব দমন করিবার মত কোনও উৎকৃষ্ট আদর্শ তৎকালীন হিন্দুসমাজে বা পরিবারে তিনি চাক্ষুষ করেন নাই। স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে যে মনোভাব তাঁহার পত্রাবলীতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, তিনি হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে কখনও কোনরূপ জ্ঞানলাভ করেন নাই।

এইবার সেই যুগ-প্রবৃত্তির কথা বলিব। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ভিতর দিয়া যে নবযুগ বাংলা দেশে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহার বাহ্যিক লক্ষণ ছিল—ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে প্রাচীনের প্রতি সন্দেহ, এবং অন্ধবিশ্বাসের উপরে ব্যক্তিগত বিবেক বা যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা। সকলেই যে সমানভাবে ইংরেজী বিদ্যার

দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন এমন নহে, কিন্তু ইংরেজের চরিত্র ও ইংরেজশাসনের নীতি, এবং তদ্‌সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার প্রভাবে দেশীয় সমাজের আবহাওয়া ভিতরে ভিতরে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। যাঁহারা মনীষী ও চিন্তাশীল, ভাবুক ও হৃদয়বান, তাঁহারা নানাদিকে নানা ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন—একই সমস্যা নানা রূপ ধরিয়া ভাবে চিন্তায় ও কর্ম্মে প্রকাশ পাইতেছিল। কেহ সমাজের মধ্যে থাকিয়াই, কেহ বা সমাজ ত্যাগ করিয়া, ব্যাকুলতা ও অধীরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তখনও কর্ম্মক্ষেত্রে এই নবভাবকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারেন নাই। সে যুগের সেই বীরপুরুষগণের কীর্ত্তি ইতিহাসগত হইয়া আছে। সেই প্রবৃত্তির গূঢ়তম প্রেরণাই একজন কবির আত্মাকে স্পর্শ করিয়াছিল। মধুস্দনের জীবনে দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহের যত কারণ ঘটিয়াছিল, তাহা চিন্তা বা ভাবনা-প্রসূত নয়—তিনি কোনও ধর্ম্ম বা নীতিঘটিত তত্ত্বজিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হন নাই। সকল খণ্ড-সমস্যাকে নিরস্ত করিয়া একটি বিদেশীয় কাল্‌চার সাহিত্যিক ভাবগ্রহিতার দ্বারাই তাঁহার চিত্তে সংক্রামিত হইয়াছিল; সেই কাল্‌চারগত ভাবসৌন্দর্য্যকে পরম সত্যরূপে বরণ করিবার মত বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি তাঁহার ছিল, এবং তাহারই মূল উৎস-বারি তিনি আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবসাধনা সে যুগে দুরূহ হইলেও অসম্ভব ছিল না। শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে এই যুগে যে উৎকণ্ঠা জাগিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল দুই বিপরীত সংস্কৃতির মর্ম্মগত বিরোধ। যে ভাবচিন্তার আঘাতে সেকালের বাঙালী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ইংরেজ-চরিত্র ও ইংরেজের শাসননীতিগত আদর্শ—একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; কিন্তু ইংরেজী বিদ্যার মূলে যেমন, তেমনই ইহারও মূলে ছিল সেই গ্রীক-রোমক সংস্কৃতি—যাহা শেমিটিকে বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মনীতিকেও অভিভূত করিয়া আত্মার উপরে দেহ ও দেহাধিষ্ঠিত প্রাণমনকে স্থান দিয়াছিল, অতীন্দ্রিয়ের উপরে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বা যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সেই সংস্কৃতিই সেকালের বাঙালী-মনকে—যে মন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় মধ্যযুগের সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই মনকে আঘাত করিয়াছিল; তাহার সেই পারলৌকিকতা ও mysticism-কে এই নূতন দেহাত্মবাদ বা স্বভাবধর্ম্মবাদ নিরতিশয় বিচলিত করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের নবভাবরাজিও তখন পরোক্ষভাবে ইংরেজ পণ্ডিত ও শিক্ষাগুরুর মারফতে নব্য বাঙালীর চিত্তে সংক্রামিত হইতেছিল; অতএব, যে সংস্কৃতি একদা য়ুরোপে নবজাগরণ আনিয়াছিল, যাহার ফলে 'humanities' বা মানব-বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার

উপরে স্থান পাইয়াছিল ; এবং মনুষ্যজীবনগত পরম রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা 'humanism'-ই মানুষকে এক নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল—আমাদের পক্ষেও তাহা সঞ্জীবন-মন্ত্রের মত কাজ করিয়াছিল, সেই মানবতা বা মর্ত্ত্যপ্রীতির প্রেরণাই আমাদিগকে চঞ্চল করিয়াছিল।

এই যুগ-প্রভাব বা যুগ-প্রবৃত্তিই মধুসূদনের জীবন ও তাঁহার কবি-প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াছিল। প্রথম যৌবনে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্য—বিশেষ করিয়া বায়রনের কবিপ্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, অর্থাৎ, কাব্যে আত্মাভিমানপ্রসূত হৃদয়াবেগের উপাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে যুগের কবিগণের সেই আত্ম-সচেতন বিদ্রোহ তাঁহাকে বেশি দিন মুগ্ধ করে নাই। শীঘ্রই তিনি সেই মানস-উৎকণ্ঠামূলক আদর্শবাদ ত্যাগ করিয়া য়ুরোপের রেনেসান্স-যুগে উত্তীর্ণ হইলেন। শেক্‌স্‌পীয়ার ও মিল্‌টন সেকালের সকল ছাত্রেরই উপাস্য কবি ছিলেন। আমরা জানি, তিনি হিন্দু-কালেজে কাপ্তেন রিচার্ডসনের সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়ার ও মিল্‌টনের সহিত তাঁহার পরিচয় এই কালেই হইয়াছিল,—এমন অধ্যাপনা নাকি আর কখনও বাঙালী ছাত্রের ভাগ্যে ঘটে নাই। পরে খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের পর বিশপ্‌স কলেজে অধ্যয়ন কালে, ১৮।১৯ বৎসর বয়সেই, হোমারের মূল কাব্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল। এই তিন কবির কাব্যই তাঁহার কবি-প্রাণ পুষ্ট করিয়াছিল। মধুসূদন শেক্‌স্‌পীয়ারের রোমাণ্টিক নাটকের অনুকরণে নাটক লিখিতে গিয়া শেষে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন ; তাহার স্পষ্ট কারণ দুইটি বলিয়া মনে হইতে পাবে—প্রথম, তদানীন্তন নাট্যশালার অবস্থা ; দ্বিতীয়, নাটকের উপযোগী কাব্যচ্ছন্দের অভাব। কিন্তু আসলে এই দুই কারণও গৌণ, নাটকীয় প্রেরণা তাঁহার কবিপ্রকৃতির অনুকূল ছিল না। তিনি যে শীঘ্রই নাটক লিখিবার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং এপিক বা heroic poetry-র প্রেরণাই অবশেষে তাঁহার সুপ্ত কবিপ্রতিভা এমনভাবে উদ্দীপিত করিয়াছিল—ইহাতেই সেই যুগ ও তাঁহার জীবন, এই দুইয়ের গূঢ়তর প্রবৃত্তির পরিচয় রহিয়াছে। কবির জীবন ও কবিচরিত্রের কথা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে কিছু বলিয়াছি। সেই যুগের সর্ব্ববিধ উৎকণ্ঠার মূলে যে দুই বিপরীত সংস্কৃতির সংঘর্ষ ছিল, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি, এবং তাহার ফলে বাঙালীর ভাবজীবনে যে রেনেসান্স ঘটিয়াছিল তাহার আদর্শ ছিল humanism—ইহাও বলিয়াছি। রামমোহন রায় যাহাকে মনীষার দ্বারা সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মধুসূদন তাহাকেই প্রাণের মধ্যে লাভ

করিয়াছিলেন—সে অনুভূতি যেমন সরল তেমনই স্বতঃস্ফূর্ত্ত। তাই তিনি য়ুরোপের উনবিংশ শতাব্দীকে, এমন কি শেক্‌স্‌পীয়ার ও মিল্‌টনকেও অতিক্রম করিয়া, আরও আদি ও অকৃত্রিম উৎস-বারিতে তাঁহার প্রাণপাত্র পূর্ণ করিয়াছিলেন। কাব্যনির্ম্মাণ-কৌশল, রসাত্মক বাক্যযোজনা, বিচিত্র কল্পনাবস্তু প্রভৃতির জন্য তিনি ভার্জিল দান্তে টাসো মিল্‌টন হইতে বায়রন মূর পর্য্যন্ত, এবং বাল্মীকি কালিদাস হইতে কৃত্তিবাস কাশীদাস পর্য্যন্ত, সকলেরই দ্বারস্থ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজস্ব কল্পনা ও কবিপ্রকৃতি হোমারকে যে ভাবে অনুসরণ করিয়াছিল, এমন আর কাহাকেও নহে। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি হোমারকে ভুলিতে পারেন নাই,—বাংলা গদ্যে হোমারের মূল মহাকাব্যের অসমাপ্ত অনুবাদই তাঁহার শেষ সাহিত্যকর্ম্ম। যুনানী কবির সেই আদি কাব্যপ্রেরণার মধ্যেই তিনি আপন প্রাণের প্রতিধ্বনি পাইয়াছিলেন,—তাহার সেই সুস্থ সবল মানবতা এবং নির্দ্বন্দ্ব ও নিশ্চিন্ত জীবনধর্ম্মের অনুধ্যানে তিনি নিজের অশান্ত প্রাণকে শান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি সে যুগের সেই সংস্কৃতিগত সংঘর্ষকে অস্বীকার করিয়া এমন একটা কিছুকে আশ্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহা মানবপ্রকৃতির আদি ধর্ম্ম; যাহা শাস্ত্রবিধি অপেক্ষাও সত্য ও বলবান, পৃথিবীর মতই যাহা নিত্যনূতন ও চিরপুরাতন; যাহা ফুলের মত আপন স্বভাবধর্ম্মেই সুন্দর, পার্থিবতাই যাহার স্বাস্থ্য, বীর্য্যে ও জীবনাবেগে যাহা মহিমময়, এবং পরিপূর্ণ বিকাশের পরে কালের নির্ম্মম কুঠারঘাতে যাহা করুণ। 'মেঘনাদ-বধে'র কাহিনী ইহারই একটি রূপক—কবি মানবজীবন ও মানব-ভাগ্যের সেই পার্থিবতাকেই পরম শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়াছেন। ইহাই 'মেঘনাদধ-কাব্যে'র কবির humanism.

এইবার 'মেঘনাদবধ-কাব্য' সম্বন্ধে কবির সজ্ঞান অভিপ্রায়ের পরিচয় লইব। কবি কাব্যারম্ভে বলিয়াছেন, তিনি একখানি বীররসপ্রধান মহাকাব্য রচনা করিবেন, এবং কল্পনাকে নানা 'কবিচিত্ত-ফুলবনে' মধু আহরণে নিযুক্ত করিবেন। এই দ্বিতীয় উক্তিটি অতিশয় সত্য; প্রথম উক্তির সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। তিনি দেশী ও বিদেশী প্রায় কোনও কবিকে বাদ দেন নাই, গ্রন্থমধ্যে তিনি দেশীয় কবিগণের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, করেন নাই কেবল বিদেশী কবিগণের—করিবার উপায় ছিল না বলিয়া। কিন্তু এই কাব্যরচনায় তাঁহার সজ্ঞান অভিপ্রায় ও মনোভাব সম্বন্ধে অন্যত্র যে দুইটি কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহা অতিশয় মূল্যবান। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার কাব্যখানি "three-fourths

Greek" ; এবং আরও বলিয়াছেন, "I despise Ram and his rabble ; but the idea of Ravan elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow"। ইহার প্রথমটিতে তাঁহার কবিপ্রকৃতির পরিচয় আছে, দ্বিতীয়টি তাঁহার ব্যক্তিগত রুচির নিদর্শন ; কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে মূলে বিরোধ নাই, পরে তাহা দেখাইতেছি। তাঁহার কাব্য যে "three-fourths Greek"—কবির এই স্বীকারোক্তি বড়ই অর্থপূর্ণ। তিনি বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ভাষার কাব্য হইতে যথেচ্ছ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সে গুলিকে আশ্চর্য্য নৈপুণ্যসহকারে স্বকীয় কাব্যে যোজনা করিয়াছেন। কিন্তু যে কয়জন কবির নিকটে তিনি বিশেষ ঋণী, তাঁহাদের মধ্যে দুইজন বিদেশী ও একজন দেশী। ইংরেজ কবি মিল্‌টন ছন্দ-সঙ্গীতে তাঁহার গুরু, সে কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন ; এবং যদিও মিল্‌টনের প্রতি তাঁহার ভক্তি অত্যধিক ছিল, তথাপি মিল্‌টনের কাব্য হইতে তাঁহার কাব্যের প্রকৃতি এতই স্বতন্ত্র যে, তিনি তদ্দ্বারা আর কোনও বিষয়ে প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বাঙালী কবি কৃত্তিবাস কাব্যের কাহিনী-অংশে তাঁহার প্রধান ঋণদাতা; কিন্তু গ্রীক কবি হোমারই তাঁহার কবিচিত্ত-কমলের রবি। মিল্‌টনের কবি-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার সগোত্রতা ছিল না, মিল্‌টনের উদাত্ত-কঠোর হিব্রু মনোভাব তাঁহাকে ততটা আকৃষ্ট করে নাই, যতটা করিয়াছিল সেই মনোভাবপ্রসূত উদাত্ত-গভীর ছন্দধ্বনি। দান্তে বা টাসোর মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান আদর্শও তাঁহার কল্পনার অনুকূল ছিল না, তাই তাঁহার কাব্যে দান্তের নরক-বর্ণনার অনুকরণ নিতান্তই প্রাণহীন হইয়াছে। কিন্তু গ্রীক-কবির সহজ সৌন্দর্য্যপ্রীতি, সরল তত্ত্বচিন্তাহীন মানবতার আদর্শ তাঁহার কবিচিত্ত জয় করিয়াছিল। তাই, পাপ্যপুণ্যে সমান উদাসীন, প্রেমে ও প্রতিহিংসায়—সুখে ও শোকে সমান অধীর, অতীত-ভবিষ্যতের ভাবনাহীন, এবং দেবতাদের প্রতিও সরলবিশ্বাসী যে রাবণ, সেই তাঁহার কাব্যের নায়ক—"the idea of Ravan elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow"। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র প্রথম সর্গের শেষে, বন্দিগণ ইন্দ্রজিতের যে জয়গান করিতেছে, সেই গানের লিরিক-উচ্ছ্বাস যে কবিরই নিজপ্রাণের উচ্ছ্বাস তাহাতে সন্দেহ নাই—

নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;

ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতনমুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি!
রক্ষঃকুলরবি অই উদয়-অচলে,
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী!
উঠ, রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্তধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতিত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম!
গুণিগণশ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্রকেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃপতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশদুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃকুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।

ইহার মধ্যে কবির নিজেরই সেই উক্তি শোনা যাইতেছে—"I despise Ram and his rabble"! সমগ্র কাব্যখানিতে রাক্ষসের নামে মানুষেরই বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য, তাহার প্রাণের প্রাবল্য ও বীরোচিত অহঙ্কার উদাত্ত গীতচ্ছন্দে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি মানুষের জন্য কোনও নৈতিক মহত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা দাবি করেন নাই। রাবণ ও মেঘনাদ—মানবজীবন-পুষ্পেরই দুই রূপ—একটি ফুটিয়া-উঠা ও অপরটি ঝরিয়া-পড়ার। হোমারের মহাকাব্য হইতে তিনি সেই আদিম মানবতার রসপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন; বাঙালী কবি কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কাব্য হইতে তিনি সেই মানবতার অতি সরল ও সহজ রূপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; বাঙালীর সংসার ও বাঙালীর ভাবজীবনে সেই মানবতা যে একটি স্নিগ্ধ-কোমল সরস-শ্যামল শোভায় বিকশিত হইয়াছে, মধুসূদনের কাব্যে তাহার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব আছে, যুদ্ধ বা বীরত্বের বীররস তাহাতে অধিক প্রশ্রয় পায় নাই। এ কাব্যের নায়ক, সুস্থ সবল মানবধর্ম্মের যে নীতি, তাহাই পালন করে। রাবণ যে কি পাপ করিয়াছে তাহা সে জানে না; পুত্র মেঘনাদও আপন যৌবনধর্ম্ম ও পুরুষধর্ম্মই পালন করে—প্রেম স্নেহ ভক্তি ও পৌরুষ, এই সকল

হৃদয়বৃত্তির অতি সুস্থ ও সবল প্ররোচনা ভিন্ন আর কোনও ধর্ম্ম তাহার নাই; পিতার ধর্ম্মাধর্ম্মসম্বন্ধেও তাহার মনে কোনও প্রশ্নই জাগে না। এ কাব্যের নায়ক রাবণই, মেঘনাদ নয়; মেঘনাদ রাবণেরই একটা বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র, রাবণ-চরিত্রের পরিপূরক। কবির কল্পনা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রাবণের ভাগ্য লইয়া ব্যাপৃত আছে, মেঘনাদ ট্রাজেডিকে বিশেষভাবে পুষ্ট করিয়াছে; এবং এই ট্রাজেডির দিকটায় জোর দিবার জন্যই মেঘনাদের মৃত্যুই এ কাব্যের প্রধান ঘটনা, কিন্তু সমগ্র কাব্য সেই ঘটনা হইতে বড়। মেঘনাদ-চরিত্র রাবণ-চরিত্রে যুক্ত না হইলে কবিকল্পিত মানবজীবন ও মানবভাগ্যের চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

এক দিকে এই আদর্শ স্থাপন করিয়া, তাহাকেই উজ্জ্বলতর করিবার জন্য কবি, অপর দিকে, রাম ও বিভীষণ-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দুই চরিত্রে কবি মানবধর্ম্ম ও পৌরুষের সাতিশয় খর্ব্বতা ও বিকৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন। দেবতার কৃপাপ্রার্থী দেবযাজী রাম ধর্ম্মভয়ে ভীত, পাপপুণ্যের ফলাফল-চিন্তায় নিত্য দ্বিধাগ্রস্ত, এবং দেবভক্তির আতিশয্যে আত্মপ্রত্যয়হীন কাপুরুষ। দেবতারা তাহাকে নীতিপুস্তকের নীতিবাক্যের মত উপদেশ দিয়া আশ্বস্ত করে, রাম অতিশয় ভাল ছেলের মত তাহাই পালন করে; তাহার মনেও মুক্তি নাই, বক্ষেও সাহস নাই; তাহার যাহা কিছু সৌভাগ্য তাহা দেবানুগ্রহেই ঘটিয়া থাকে, এবং সেই অনুগ্রহলাভে তাহার আত্মপ্রসাদের অন্ত নাই। অপর প্রধান চরিত্র বিভীষণ, এই ধর্ম্মপ্রাণতার বশেই, মানুষের স্বভাবধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, ধর্ম্মের ভয়ে সে আপন মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে—ইহাও কবির সেই মানবতার আদর্শকেই উজ্জ্বল করিয়াছে। পাপপুণ্যের ফলাফল-চিন্তা নয়, আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক ইষ্টসাধনও নয়—মানুষের স্বভাবধর্ম্মের যে মনুষ্যত্ব—তাহা অপেক্ষা মূল্যবান আর কিছুই নাই; সেই মনুষ্যত্বের স্ফুরণে যদি কোনওরূপ ধর্ম্মবিধি বা দেব-আরাধনা বাধা হইয়া দাঁড়ায়, এবং তজ্জন্য বিনাশপ্রাপ্ত হইতেও হয়, তথাপি তাহাও শ্রেয়ঃ; সুখদুঃখ, পাপপুণ্য ও জয়পরাজয়ের অপূর্ব্ব উল্লাস ও অপূর্ব্ব বেদনা—ইহাই মানবতার নিদান। "To be weak is miserable doing or suffering"—মধুসূদনের প্রিয় কবি মিল্‌টনের এই মহাবাক্যই তাঁহার 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র অন্তর্নিহিত বাণী, মিল্‌টনের মহাকাব্য হইতে তিনি বোধ হয় এই মন্ত্রটিই লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর মধুসূদনের মহাকাব্য-রচনার অভিপ্রায় কতদূর সফল হইয়াছে

তাহার আলোচনা করিব, এই বিষয়টির আলোচনা অত্যাবশ্যক, ইহাতে কবি-প্রাণের—কবির অতিশয় ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির—পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রথমে, তাঁহার সেই সজ্ঞান অভিপ্রায়ের কারণ, ও সেই অভিপ্রায়-সিদ্ধির পক্ষে বাধার কথা বলিব। মহাকাব্যের প্রতিই বরাবর তাঁহার আকৃষ্ট হওয়ার কারণ পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি; এইরূপ কাব্যপ্রেরণার পক্ষে তাঁহার সাহিত্যিক রুচি ও মানসিক প্রবণতাই যথেষ্ট কারণ বলিয়া মনে হইলেও, মহাকাব্য-রচনায় তাঁহার এই উৎসাহ আরও একটা কারণে ঘটিয়া থাকিতে পারে। তাঁহার আত্মাভিমান ও উচ্চাভিলাষের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অতএব শুধুই কবি নয়, মহাকবি হইবার বাসনা প্রবল হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তদানীন্তন কাব্যশাস্ত্রে মহাকাব্যের আসনই সর্ব্বোচ্চ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; মধুসূদন সেই শাস্ত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে একস্থানে Blair-এর গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়া, বাংলাভাষায় প্রাচীনকাল হইতে সেদিন পর্য্যন্ত এ-জাতীয় কাব্য রচিত হয় নাই; সে কাব্য চিরদিনই গীতিপ্রাণ। এদিক দিয়াও একটা নূতন কিছু করিবার আকাঙ্ক্ষা যে তাঁহার হইয়াছিল, ইহা খুবই সম্ভব। অতঃপর নাটকের জন্য নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিতে গিয়া তিনি সহসা সেই ছন্দে আপনার সেই অভিপ্রায়-সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিলেন; শুধু তাহাই নয়, এই ছন্দের ভিতরেই তিনি যেন নিজের বিশিষ্ট প্রতিভার সন্ধান পাইলেন, আপনাকে আপনি আবিষ্কার করিলেন। এই ছন্দই তাঁহার হৃদয়াবেগের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি; ইহাতেই তাঁহার কাব্যের ভাষা ও ভাব, তাঁহার সমগ্র কল্পনাভঙ্গি, বীজরূপে নিহিত ছিল। যে বিদ্রোহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বকে সজ্ঞানে মনে স্থান না দিলেও যাহা ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতেছিল—তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে, অবচেতনার মধ্যে, নিগূঢ় বেদনারূপে যাহা বিরাজ করিতেছিল, তাহাই আজ গান হইয়া উঠিল, কারারুদ্ধ বিদ্রোহী আজ যেন শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া মুক্তির আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। এই ছন্দই তাঁহার কবিপ্রাণের স্টাইল, ইহাই তাঁহার কাব্যের প্রেরণারূপিণী সরস্বতী—আগে ছন্দ, পরে বাণী, তাহারও পরে বাগর্থের সুপরিস্ফুট প্রতিমা! এই ছন্দ কেবল কাব্যকলার একটি কৌশলমাত্র নয়, ইহাই মধুসূদনের সমগ্র কবিপ্রতিভাকে ধারণ করিয়া আছে।

এই ছন্দের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের কাব্যকল্পনাও সুপরিস্ফুট আকার লাভ করিয়াছে; অতঃপর এই কল্পনাকে রূপ দিবার জন্য কবি উপায় ও উপকরণ

অন্বেষণ করিলেন। এপক্ষে যে গুরুতর বাধা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাকে তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার যে ভাবকল্পনার কথা পূর্ব্বে সবিস্তারে বলিয়াছি, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে সেই মানবীয় আদর্শের প্রশ্রয় কোথায়ও নাই; দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতির চরিত্রে তাহার ইঙ্গিতমাত্র ছিল, কুত্রাপি তাহা কবির শ্রদ্ধালাভ করে নাই। অতি-পরিচিত পুরাণ-কাহিনীই মহাকাব্যের বিষয়বস্তুর পক্ষে প্রশস্ত, কিন্তু প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাসে তাঁহার সেই বিজাতীয় আদর্শের দৃষ্টান্ত কোথায়ও নাই—সে সাহিত্যে যুনানী, তথা য়ুরোপীয় আদর্শের পৌরুষ-বীর্য্য কোথায়ও কীর্ত্তিত হয় নাই। যে কাহিনী মধুস্থদনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও পরিচিত ছিল, তিনি তাহা হইতেই আপন কাব্যের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিলেন, বাল্মীকির কাব্যের রাক্ষস-চরিত্র শোধন করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখিলেন না। বাঙালী কবি কৃত্তিবাসও রাক্ষস-পরিবারের কোনও কোনও চরিত্র কোমল মানবীয় ভাবে মণ্ডিত করিয়াছেন। মধুস্থদনের কল্পনা-চক্ষে রাবণ ও ইন্দ্রজিতের চরিত্র সমধিক উপযোগী বলিয়া মনে হইল—রাবণের ঐশ্বর্য্য ও দুষ্প্রধর্ষ আত্মনির্ভরতা এবং মেঘনাদের শৌর্য্য তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল। তিনি বাল্মীকির মূল কাব্যও পাঠ করিয়াছিলেন, হয় তো তাহা হইতে মেঘনাদের একটি উক্তি তাঁহার কল্পনাকে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিল। আর্ষ রামায়ণের একস্থানে মেঘনাদ বলিতেছে, "আর সকলে দেবগণকে স্তবস্তুতির দ্বারা তুষ্ট করিয়া ঈপ্সিত বর মাগিয়া লয়, আমি তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আমার কাম্য বস্তু আদায় করিয়া থাকি। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কবিও এই পুরুষকে মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন।

তথাপি রামায়ণের কাহিনীকেই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবের বাহন করিয়া কবি দুঃসাহসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন; যে দুঃসাহস তাঁহার নূতন ছন্দসৃষ্টিকে সম্ভব করিয়াছিল, সেই দুঃসাহসেই তিনি এতবড় বাধা অতিক্রম করিলেন—তিনি নিজের কবিশক্তি ও সার্ব্বভৌমিক কাব্যরসের উপরেই নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। অতএব, 'মেঘনাদবধ-কাব্য' পাঠ করিবার কালে বাল্মীকি, কালিদাস, কৃত্তিবাসকে ভুলিতে হইবে, ইহার কাব্যরসাস্বাদনে যত কিছু প্রাচীন সংস্কার হইতে মনকে মুক্ত রাখিতে হইবে। এ কাব্যের আখ্যানবস্তু পুরাতন বটে, কিন্তু কবির কথা সম্পূর্ণ নূতন—মনে রাখিতে হইবে, উপায়ান্তর ছিল না বলিয়াই কবি ঐ কাহিনী অবলম্বন করিয়াছেন। এ রাবণ বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের রাবণ নয়, এ রাম

হিন্দুর ভগবান নহেন—কবিমানসপ্রসূত সম্পূর্ণ নূতন চরিত্র। এই নূতন চরিত্রগুলিকে মহাকাব্যের কল্পনাকাশে উপযুক্ত দূরত্ব ও ব্যবধানে সংস্থিত করিবার জন্যই কবিকে বাধ্য হইয়া ঐ নাম ও ঐ কাহিনীর আশ্রয় লইতে হইয়াছে। যে-কোনও বড় কবির পক্ষে রামায়ণের কাহিনী হইতে প্রেরণা লাভ করা গৌরবের কথা বটে; ভারতীয় বহু কবি রাম লক্ষ্মণ সীতার চরিত্রে নবতন মহিমা ও মাধুর্য্য সন্নিবেশ করিয়া অমর হইয়াছেন, মধুসূদন কেন তাহাই করিলেন না? তাঁহার কল্পনার পক্ষে এই সকল চরিত্রের মহিমা কি এতই অপর্য্যাপ্ত? এইরূপ অনুযোগ প্রায় সকলেই করিয়া থাকেন; কিন্তু মধুসূদনের কবিপ্রেরণার মূলই যে রামায়ণ নহে, তাহা যে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির ভাবজগৎ হইতে সঞ্চারিত হইয়াছিল, এবং রামায়ণের কাহিনী যে তাহার গৌণ সহায় মাত্র, মুখ্য বিষয় নহে, একথা আমরা ভুলিয়া যাই বলিয়াই এই অভিযোগ সঙ্গত বলিয়া মনে করি। অপর আপত্তি এই যে, যদি তাঁহার অভিপ্রায় এমনই ছিল, তবে তিনি ঋষি-কবির সেই লোকবিশ্রুত আদর্শ চরিত্রগুলিকে বর্জ্জন করিয়া অন্যত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না কেন? তাঁহার কারণও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও কবির সেই মহাকাব্য-রচনার সংকল্প, তাঁহার সেই সজ্ঞান অভিপ্রায় কতখানি সিদ্ধ হইয়াছে? এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কবিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে চিনিয়া লইতে পারিব। কবি যে কাব্যারম্ভে সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

(গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত,)

—কাব্যরচনায় অগ্রসর হইয়া তিনি সে সংকল্প রক্ষা করিতে পারেন নাই, 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। মহাকাব্যের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত ও তাহার কারণ পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি, এবং সেই দ্বন্দ্ব-সংশয় হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্যই—অর্থাৎ বিপরীত-মুখে সেই সঙ্কটকে জয় করিবার জন্যই, মধুসূদনের কবি-প্রকৃতি যে এইরূপ ভাবকল্পনার বশীভূত হইয়াছিল, তাহাও বলিয়াছি। এই হিসাবে মধুসূদন যেমন সেই যুগেরই মানসপুত্র, তেমনই, ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর কবির পক্ষে, বিশেষত বাঙালী কবির পক্ষে, মহাকাব্যের প্রেরণা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। মহাকাব্যের কবির পক্ষে যে শান্ত সংযত রসাবেশ—দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও সংশয়হীন চিত্ত-

স্ফূর্ত্তির প্রয়োজন, তাহাই মধুসূদনের সজ্ঞান কামনা হইলেও, তিনি তাঁহার ব্যক্তিচেতনার অন্তস্তলে তাহা অনুভব করেন নাই। মহাকাব্যের কবির অতি সরল ও সহজ বীররসপ্রীতিই থাকে—দেশ, জাতি, বা ধর্ম্মের গৌরবগান তাঁহার কাব্যস্ফূর্ত্তির কারণ; এবং বিরাট, বিপুল ও গম্ভীর বস্তুসকলের বর্ণনায় বিশেষ আসক্তি প্রকাশ পায়; তাহাতে কবিব্যক্তির নিজস্ব ভাব-অভাবের সুর তেমন বাজিয়া উঠিবার অবকাশ পায় না; সে কল্পনা একান্তই বহির্বস্তুগত, আত্মভাবপ্রধান নয়। মধুসূদনের কাব্যে ইহার কয়েকটি লক্ষণ আছে সন্দেহ নাই—তাঁহার ছন্দের উদাত্ত-গভীর মূর্চ্ছনায়, কল্পনার বিষয়-বিস্তারে এবং বিপুল ও বিচিত্র বস্তু-সন্নিবেশে —তিনি যাহাকে 'sacred song' নামে অভিহিত করিয়াছেন—সেইরূপ গম্ভীর-ভাবোদ্দীপক কাব্যগুণ প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি সমগ্র কাব্যখানি বীররসের পরিবর্ত্তে করুণরসের আধার হইয়া আছে। মধুসূদনও যে এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না তাহা নহে, তাঁহার কাব্যের ছাঁচ বা আদর্শ যেমনই হউক, তিনি যে প্রকৃতপক্ষে মহাকাব্য লিখিতেছেন না—কোনও বিধিবিধান মানিয়া চলা যে তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অতএব প্রাণে যেমন আসে তেমনই লিখিয়া চলিবেন—ইহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। ইহা মধুসূদনের চরিত্রেরই উপযুক্ত। নাটক রচনা করিতেও তিনি কোন শাস্ত্রশাসন মানিবেন না—"I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will"। 'মেঘনাদবধ-কাব্য' মহাকাব্য হইবে এবং তাহা বীররসপ্রধান হইবে, ইহাই প্রকাশ্য সংকল্প বটে, কিন্তু কবি তাঁহার বন্ধুকে লিখিতেছেন—

"You must not, my dear fellow, judge of the work as a regular "Heroic Poem". I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told".

"Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with *vira ras* (বীররস)"।

এ সকল হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কবির চিত্তে একটা বড় দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব ছিল—কবির মন যাহা চাহিয়াছিল, প্রাণ তাহা স্বীকার করে নাই। তাই এপিক-আকারের তলে তলে অন্তঃসলিলা হইয়া লিরিকের ফল্গুস্রোত বহিয়াছে। এই লিরিক-সুর কবির সুপ্ত আত্মারই ক্রন্দনধ্বনি, ইহাকে নিবারণ করা কবির পক্ষে অসাধ্য ছিল। নিজ জীবনের যে নিষ্ফলতা ও নৈরাশ্য তিনি জাগ্রত চৈতন্য হইতে দূরে রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন, তাহারই রুদ্ধ

কাতর ক্রন্দন মহাকাব্যের গীতোচ্ছ্বাসকেও প্রতিহত করিয়াছে। যে কামনা সফল হইবার আশা ছিল না, যে আদর্শকে সারা প্রাণ দিয়া বরণ করিয়াও জীবনে জয়ী করিতে পারেন নাই, তাহাই তাঁহার প্রাণের নিভৃত কোণে অশ্রুর উৎসরূপে বিরাজ করিতেছিল। রাম লক্ষ্মণ ও বিভীষণরূপী সমাজই জয়ী হইবে, এ যেন তাঁহার নিজ জীবনেরই আক্ষেপ—তাহাদের জয়ী হওয়া উচিত নয়, তবুও হইবে! তাই, তাহাদের প্রতি কবির আক্রোশের অন্ত নাই। মেঘনাদ যখন মরিবেই, তখন তাহাকে অন্যায় যুদ্ধে হত হইতে হইবে, এবং লক্ষ্মণকেই সেই হত্যার কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতে না পারিলে কবির আত্মা শান্তি মানিবে না। এইজন্যই 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' বীররস প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, এবং এইজন্যই তাহা একখানি নকল মহাকাব্য না হইয়া খাঁটি বাংলা কাব্য হইতে পারিয়াছে।

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র অন্তর্গত এই লিরিক-প্রবৃত্তি যেমন কবির অন্তর্জ্জীবনের পরিচয় বহন করিতেছে, তেমনই আর এক দিক দিয়া ইহাতে সেই যুগের বাঙালী-চিত্তের প্রতিচ্ছবি রহিয়াছে। বাংলার উনবিংশ শতাব্দী যেমন একটা বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের যুগ, তেমনই সে যুগ জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগও বটে; বিদেশী শিক্ষার প্রভাবও যেমন প্রবল, তেমনই প্রাচীন দেশীয় আদর্শের প্রতি মমতা এবং তাহা রক্ষা করিবার আগ্রহও প্রবল। মধুসূদনের কাব্যে এই দুই প্রবৃত্তির লুকাচুরি খেলা আছে। য়ুরোপীয় আদর্শকেই তিনি নিঃসংশয়ে বরণ ও ঘোষণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি বাঙালী-জীবন ও বাঙালী-সংস্কারের মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সীতা-চরিত্রের প্রেরণামূলে হিন্দু-সংস্কার জয়ী হইয়াছে; বীরাঙ্গনা প্রমীলাও, বাঙালী গৃহস্থবধূর স্নিগ্ধ শোভায়, তাহার সেই উগ্র নারীমহিমার ভাস্বরচ্ছটা সম্বরণ করিয়াছে। ইহারই ফলে, 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র বীর চরিত্রগুলিও উন্নত পর্ব্বতচূড়ার মত কঠোর অটলতা লাভ করে নাই। রাবণের সকল দুঃখ, সকল পরাজয়ের মূল তাহার স্নেহশীলতা; রামের তো কথাই নাই—সে চরিত্র ভ্রাতৃস্নেহের অত্যধিক প্রাবল্যে পৌরুষের শেষ লক্ষণ-টুকুও হারাইয়াছে; এমন কি, রাজ্যলোভী গৃহশত্রু বিভীষণ—যে একই উপায়ে স্বার্থ ও পরমার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে নিজের মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে, যাহার চক্রান্তে ও সহায়তায় মেঘনাদ হত হইল—সেও মৃত্যুশয্যাশায়ী ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখপানে চাহিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠে; ধর্ম্মবিশ্বাস ও স্বার্থনিষ্ঠা—কিছুই তাহাকে কঠোর

করিতে পারে নাই। এইজন্যই হোমার মিল্‌টন হইতে গিয়াও মধুস্থদন বাঙালীর কবি হইয়াই রহিলেন।

মধুস্থদনের জীবনে যে দ্বন্দ্ব, ও সেই দ্বন্দ্বের ফলে যে শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল, কাব্যে তিনি সেই দ্বন্দ্বকে উত্তীর্ণ হইতে চাহিয়াছিলেন—কাব্যরসাবেশের অচেতন উল্লাসে। তাঁহার কল্পনা আত্ম-সচেতন ছিল না, কোনও চিন্তা বা সংশয় তাঁহাকে পীড়িত করে নাই ; অতি দুর্দ্ধর্ষ সংকল্প ও আত্মপ্রত্যয় তাঁহার কাব্যের প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট হইয়া আছে। এক দিক দিয়া 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের লক্ষণ-যুক্তই বটে—ভাবের জটিলতা বা রূপরসের সূক্ষ্মতা তাহার কোথায়ও নাই ; অশ্রু-হাসি, জয়-পরাজয়, কোমল-কঠোর এবং রুদ্র-বিরাটের অতি সরল ভাবাবেগে তাহা প্রবাহিত হইয়াছে—রৌদ্রালোকিত স্থবিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে করভ-শিশুর মত কবিপ্রাণ যথেচ্ছ সন্তরণ করিয়াছে ; সে জলরাশির তলদেশে কি আছে তাহা ভাবিবার অবকাশ তাহার নাই, তটপ্রান্তের বনশোভা ও আকাশের ছায়ালোক তাহাকে আশ্বস্ত করিয়াছে। কাব্যপাঠকালে ইহাই মনে হয় ; কিন্তু একটু স্থিরদৃষ্টিতে দেখিলে, সেই উচ্ছল হাসি ও স্বচ্ছন্দ অশ্রুর অন্তরালে একটা স্থগভীর বেদনা ও নৈরাশ্যের ছায়া রহিয়াছে দেখা যায়। কবি যেন নিজের অজ্ঞাতসারে একটা বৃহত্তর শক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন ; বাহিরের দিকে কাব্যকলা-কুতূহলে মাতিয়া উঠিলেও, এ কাব্যের অন্তর্নিহিত কবিপ্রবৃত্তির যে পরিচয় পাই, তাহাতে মনে হয়—কবির কবিস্বপ্ন তাঁহার সজ্ঞান অভিপ্রায়ের যেন বিপরীত। 'মেঘনাদবধে'র মত কাব্যের কবিমানস-বিশ্লেষণে সাইকো-এনালিসিস বিজ্ঞান বিশেষ কাজে লাগিতে পারে—এইরূপ কাব্যসৃষ্টির দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল। মধুস্থদন সজ্ঞানে যাহা করিয়াছিলেন তাহার পূর্ণ তাৎপর্য্য তাঁহারও অগোচর ছিল ; আজ আমরা যখন দূর হইতে তাঁহার সেই কীর্ত্তিকে পর্য্যবেক্ষণ করি, তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারি, এই কাব্যরচনায় সেই যুগপ্রবৃত্তিই যেমন তাঁহাকে প্রেরিত করিয়াছে, তেমনই তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের গূঢ়তম অনুভূতিই তাঁহার কবিকল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। যুগ-দেবতার সেই প্রবল প্ররোচনা যেমন একদিকে তাঁহার হৃদয় বিস্ফারিত করিয়াছিল—তিনি নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন, তেমনই জাতি ও সমাজের অতি প্রাচীন দৃঢ়মূল সংস্কার—যাহার বিরুদ্ধে তিনি সারাজীবন বিদ্রোহ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে বিড়ম্বিত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন—তাহার প্রভাবও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল। একদিকে

নবযুগের নববাণীর বিপুল আশ্বাস, অপরদিকে এক অতিশয় জরাজীর্ণ অথচ অতিশয় করুণ-মধুর জীবনযাত্রার মমতাময় আহ্বান তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল। 'মেঘনাদবধ-কাব্য' সেই যুগের সেই বাণী এবং তৎসহ এক কবিহৃদয়ের সমগ্র উৎকণ্ঠারূপকের আকারে ঘোষণা করিতেছে।

আমি সংক্ষেপে ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। 'মেঘনাদবধ-কাব্য'কে এইদিক দিয়া দেখিতে না পারিলে সে কাব্যের কাব্যগুণ-বিচারও নিষ্ফল হইবে; কেননা, তাহা হইলে 'মেঘনাদবধ' খাঁটি মহাকাব্য হইয়াছে কিনা, এই কাব্যের রাম-রাবণ-চরিত্র কোন্‌দিকে কতখানি আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছে—ইত্যাকার বহু অবান্তর প্রশ্ন উত্থিত হইবে; সকল মৌলিক কাব্যসৃষ্টির মত এ কাব্যের আকৃতি-প্রকৃতি যে ইহারই অনুরূপ, ইহার রস যে একটি বিশিষ্ট রস, এবং রাম রাবণ প্রভৃতি চরিত্র যে কোনও বহির্গত আদর্শে কল্পিত হয় নাই, উহা কবিরই স্বকীয় কল্পনার প্রয়োজনে যেমনটি হইবার তাহাই হইয়াছে—এক কথায়, উহা যে নবযুগের নব্যতন্ত্রের কাব্য—সমালোচনাকালে তাহা মনে থাকিবে না; কবি ও কাব্য উভয়ের প্রতিই অবিচার করা হইবে। এজন্য এই কাব্যের পশ্চাতে সেইকালের যে পটভূমিকা এবং কবিজীবনের যে ইতিহাস রহিয়াছে, আমি এ প্রসঙ্গে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

মধুসূদন হইতে যে যুগ আমাদের সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত হইল সেই যুগ বঙ্কিমচন্দ্রে পূর্ণপ্রকটিত হইয়া রবীন্দ্রনাথে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। মধুসূদন পাশ্চাত্য প্রভাবকে—সেই যুগের প্রাণগত উৎকণ্ঠাকে রস-রূপে আত্মসাৎ করিয়া কাব্যের নব আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই পাশ্চাত্য প্রভাবকে, শুধুই সাহিত্যিক ভাবজীবনে নয়—ভাবে, চিন্তায় ও কর্ম্মে—জীবনের সকল ক্ষেত্রে, যাচাই করিয়া লইয়া প্রাচীনের সহিত এই নবীনের সমন্বয়-সাধনে তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন—ভারতীয় আদর্শ ও য়ুরোপীয় বাস্তব, এই উভয়কে তিনি সমান মর্য্যাদা দিয়াছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রই এযুগের পূর্ণ অবতার, বাঙালীর নবসংস্কৃতির গুরু। রবীন্দ্রনাথে এই যুগের মানস-উৎকণ্ঠাই অতি প্রবল ও প্রখর রূপ ধারণ করিয়াছে। মধুসূদনে যাহার দক্ষিণাবর্ত্ত, রবীন্দ্রনাথে তাহারই বামাবর্ত্ত। মধুসূদনের কল্পনা মানুষের দেহ-মনের আদিম স্বাস্থ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছে, এবং তজ্জন্য প্রাচীন য়ুরোপীয় আদর্শের আরাধনা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অতিশয় আত্ম-সচেতন—আধুনিক চিন্তাব্যাধি

বা আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠাই সে প্রতিভার প্রধান প্রেরণা ; সেই প্রেরণার বশে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ভাবের সাধক হইয়াছেন, এবং পরিশেষে জাতি ও যুগকে অতিক্রম করিয়া শাশ্বত ও সার্ব্বভৌমিক আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মধুসূদন যে স্রোত মুক্ত করিয়াছিলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে শতধারায় গভীর ও বেগবান করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে অকূল তটচিহ্নহীন ভাবসাগরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে, মধুসূদন সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। জার্মান কবি হাইনের (Heine) সম্বন্ধে ম্যাথু আর্নল্ড যাহা বলিয়াছিলেন, মধুসূদনের সম্বন্ধে সেই কথাই একটু অর্থান্তর করিয়া বলা যাইতে পারে—"He is not an adequate interpreter of the modern world. He is only a brilliant soldier in the war of liberation of humanity"। মধুসূদনও সে যুগের সেই মানসিক উৎকণ্ঠাকে তাঁহার কাব্যে সম্যক প্রতিফলিত করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর ভাবজীবনের জাড্য মোচন করিয়াছিলেন—কবিমানসের মুক্তিসাধনে তিনিই প্রথম বিজয়ী বীর। মধুসূদনের চরিত্রে যে আত্মপ্রত্যয় ও অসমসাহসিকতা ছিল, তাহারই বলে তিনি বাংলা কাব্যে অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন ; তাঁহার কাব্যের রাবণ যেমন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, জীবনে তিনিও তেমনই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু রাবণের চেয়েও তিনি বড়, তাই তাঁহার কাব্য-সন্ততি মেঘনাদ মরে নাই, যত দিন বাংলা ভাষা থাকিবে ততদিন এ কাব্যের মেঘনির্ঘোষ বাঙালীকে মুগ্ধ ও সচকিত করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

'মেঘনাদবধ-কাব্য'-পাঠের ভূমিকা

ইতিপূর্ব্বে মধুস্থদনের কবিকীর্ত্তি ও কবিচরিতের প্রসঙ্গে কিছু বলিয়াছি, আরও কিছু বলিয়া 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র রসনিবেদন আরম্ভ করিব। মধুস্থদনের কাব্য-কীর্ত্তির সম্যক আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই বলিয়াই মনে করি; গত যুগের সমালোচকেরা সে সম্বন্ধে যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই এখনও অনেকের মনে অভ্যস্ত ধারণার মত দৃঢ়মূল হইয়া আছে—এই ধারণাগুলির অধিকাংশই যথার্থ নহে। আমরা এখনও শুনিতে পাই, মধুস্থদন বাংলা চতুর্দ্দশপদী কবিতার শুধুই জনক নহেন, ঐ কবিতাগুলি নাকি এখনও পর্য্যন্ত বাংলার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সনেট হইয়া রহিয়াছে। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সম্বন্ধেও এমনই উচ্চ প্রশংসা এখনও বাঙালী কাব্য-রসিক ও পণ্ডিত সমালোচকের মুখে প্রায়ই শোনা যায়—এমন খাঁটি বৈষ্ণব-কবিতা এ যুগে নাকি আর কেহ লিখিতে পারেন নাই। এই সকল উক্তির দ্বারা বাংলা কাব্য-সমালোচনার যে অবস্থা সূচিত হয়, তাহা যেমন লজ্জাকর, তেমনই ইহাও প্রমাণিত হয় যে, মধুস্থদনের কবিপ্রতিভার যথার্থ পরিচয় আমাদের সাহিত্য-সমাজে এখনও অনিশ্চিত হইয়া আছে। যে যুগে মধুস্থদনের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে যুগে কাব্য-সমালোচনার অবকাশ ছিল না, কাব্যের আদর্শ নানা কারণে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। মধুস্থদন যে অর্থে আমাদের দেশের প্রথম আধুনিক কবি, সে অর্থে আধুনিকভাবাপন্ন পাঠক আমাদের সমাজে ঐ যুগের শেষেও দেখা দেয় নাই। এবং যেহেতু পরবর্ত্তী যুগের রুচি ও আদর্শ ও বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেজন্য মধুস্থদনের কবিপ্রতিভার সম্যক আলোচনা পরেও আর হয় নাই। এ কারণ, সে-কালের রসিক-সমাজের নানা অগভীর উক্তিই আজও মধুস্থদনের প্রতিভা ও কবি-কীর্ত্তির সম্বন্ধে গতানুগতিক সমালোচনার উপজীব্য হইয়া আছে। কৃষ্ণ ও রাধার নামে যাহারা মূর্চ্ছা যায়, তাহারা 'ব্রজাঙ্গনা' লইয়া মাতিয়া উঠিবে, ইহা আশ্চর্য্য নয়। সনেট কাহাকে বলে, সে জ্ঞান আজও অনেকের নাই; সনেট কেবল চতুর্দ্দশপদী কবিতাই নয়—একটি সহজ সরল ভাব বা চিন্তাকে, উপমা-অলঙ্কার-সাহায্যে কয়েকটি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পদে আবেগমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেই তাহা উৎকৃষ্ট সনেট হয় না; ছন্দোবন্ধের দুরূহ কারিগরির মধ্যে এবং

স্বল্পপরিসর বাগ্‌বন্ধের গাঢ়তায়, ভাব অতিশয় আবেগ-গভীর হইয়া উঠে বলিয়াই সনেট নামক কবিতা এত মহার্ঘ হইয়াছে। এ সকল ধারণা যাহাদের নাই, তাহারাই মধুসূদন মহাকবি বলিয়া, তাঁহার সর্ব্ববিধ কাব্যচর্চ্চাকে সমান মূল্য ও মর্য্যাদা দিয়া থাকে। মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী সেকালেও বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। 'বীরাঙ্গনা' অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল; এবং 'ব্রজাঙ্গনা' এখনও এক শ্রেণীর রসিক সমাজের প্রিয় হইয়া আছে। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা'র সঙ্গে বাংলার বৈষ্ণবপদাবলীর দূরতম সগোত্রতাও নাই—মধুসূদনের কবিপ্রকৃতিই ছিল সেইরূপ তত্ত্বরস-প্রধান সাধক-মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কাব্যে মধুসূদন কয়েকটি প্রকৃতিপ্রেম-মূলক লিরিকের এক্সপেরিমেণ্ট করিয়াছিলেন; রাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক প্রসঙ্গতাকে (বৈষ্ণব ভাবসাধনাকে নয়) কাজে লাগাইয়াছিলেন; তাহাতে ভাবকে রূপ দিবার সুবিধা হইয়াছে; কৃষ্ণ-রাধার নামঘটিত রস সেই ভাবকে আরও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছে। এই কবিতাগুলিতে আছে একটি নিছক কাব্যরসপ্রেরণা, সে প্রেরণাও কৃত্রিমতাদোষদুষ্ট—অতিমাত্রায় আলঙ্কারিক। বৈষ্ণবকবিতা নয়—মধুসূদন প্রাচীন য়ুরোপীয় কবিতার রস-কল্পনা দেশীয় কাব্যকলায় যুক্ত করিয়া, সেকালের বাংলা কাব্যে একটা নূতনতর লিরিক-ভঙ্গির আমদানি করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগের লিরিক-কাব্যের আসরে—রবীন্দ্রনাথের যুগে—এই ধরণের কবিতা বহুদিন অচল হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বাংলার মহাজন-পদাবলী অচল হয় নাই, কখনও হইবে না। মধুসূদনের এই এক্সপেরিমেণ্ট সেকালের পক্ষে বৃথা হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া এইগুলিকে লইয়া এখনও মাতামাতি করিলে কবির প্রতি অবিচার করাই হইবে, কারণ এগুলি তাঁহার কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয়।

মধুসূদনের প্রতিভা ও কাব্যসাধনার সম্পর্কে একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—তাহা এই যে, মধুসূদন তাঁহার প্রতিভার অনুরূপ কাব্যকীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিভার প্রকাশ যেমন আকস্মিক, তেমনই অসম্পূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী। তাঁহার লক্ষ্য স্থিরবদ্ধ ছিল না, দুঃসাহসের উত্তেজনায় তাঁহার প্রতিভার ক্ষণিক বিস্ফুরণমাত্র হইয়াছিল। সেই আতসবাজির অধীর অগ্ন্যুৎসবে কয়েকটি রঙিন আলোকচ্ছটা আভাসমাত্রেই মিলাইয়াছে; কেবল যে দুই একটি স্ফুলিঙ্গ অতি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যেটি বৃহত্তম, সেইটিই অনির্ব্বাণ হইয়া কাব্যের নক্ষত্রলোকে স্থান পাইয়াছে। আমি কেবল 'মেঘনাদবধ-কাব্য'কেই মধুসূদনের একমাত্র অমর কাব্যকীর্ত্তি বলিয়া মনে করি—মধুসূদনের

কবিপ্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এই একখানি কাব্যেই পাওয়া যায়, অন্যত্র তাঁহার রচনাবলীর মুখ্য অভিপ্রায় ছিল কাব্যকলার উন্নতিসাধন, বাংলা কাব্যে নূতন আদর্শ ও নবতন রুচির প্রতিষ্ঠা, তাহাতে স্রষ্টার স্বাধীন আত্মস্ফূর্ত্তি অপেক্ষা সংস্কারকের উদ্যম ও উৎসাহই ছিল অধিক। এই কার্য্যে মধুসূদন যে অসাধ্যসাধনের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বাংলার কাব্য-তরণী যেন বালুচরে ঠেকিয়াছিল, তাহাকে স্রোতে ভাসাইবার ক্ষমতা কাহারই ছিল না। বরং দিন দিন সে আশা ক্ষীণ হইতেছিল—এই অবস্থায় সম্পূর্ণ ঘটনাক্রমে, প্রায় অনাহূত ভাবেই, তিনি তদানীন্তন সাহিত্য-সমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; যে-ভাষার অনুশীলন পূর্ব্বে কখনও করেন নাই, তাহার দুর্দ্দশামোচনের ভার লইয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন যে, বাংলা কাব্যের সম্বন্ধে নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই ; শক্তি ও সঙ্কল্প থাকিলে এই ভাষাতেই উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা সম্ভব। এইটুকু প্রমাণ করিয়াই তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। অনন্যব্রত হইয়া সরস্বতীর সাধনা করা তাঁহার পক্ষে আর হইয়া উঠে নাই। ইহা মনে রাখিলে, মধুসূদনের নাটক, চতুর্দ্দশপদী, 'ব্রজাঙ্গনা' প্রভৃতির জন্য উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না। কবিপ্রাণ ও কাব্যসৃষ্টির সম্বন্ধে একটা এই অতি সহজ নিয়ম মনে রাখিলেই হইবে যে, কাব্যসৃষ্টির মূলে কোনরূপ অসাধ্যসাধনের আকাঙ্ক্ষা, অথবা কোন বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনসাধনের অভিপ্রায় না থাকাই শ্রেয়ঃ ; কারণ, তাহাতে কবির স্বকীয় কবিপ্রবৃত্তি বাধাগ্রস্ত হয়, এবং সেরূপ হইলে, কাব্যহিসাবে সে রচনা উৎকৃষ্ট না হইবারই কথা। কেবলমাত্র শক্তি নয়, কবিমানসের স্বাধীন স্ফূর্ত্তিও চাই, নতুবা যে কাব্যে অসাধ্য-সাধনের কৃতিত্ব যতটা প্রকাশ পায়, কাব্যগুণে তাহা ততটাই উৎকর্ষলাভ করে না। এইজন্যই কবিকর্ম্মকে "নিয়তিকৃতনিয়মরহিত" বলা হইয়া থাকে। মধুসূদনের দুর্ভাগ্যই এই যে, এত বড় কবিশক্তির অধিকারী হইয়াও তিনি বাংলার কাব্যসাহিত্যে কেবল খাত-খনন, সেতু-নির্ম্মাণ ও সোপান-রচনাই করিয়া গিয়াছেন—এক দুঃসাহসিক অভিযানের পথিকৃৎ হিসাবেই তিনি এ যুগের ইতিহাসে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন ; যত বড় প্রতিভা তত বড় সৃষ্টির নিদর্শন রাখিয়া যান নাই। তথাপি সেই বালুকাপ্রোথিত তরণীটিকে স্রোতে ভাসাইবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প ও অধীর উত্তেজনার মধ্যেই একবার তাঁহার অন্তর-কক্ষের দ্বার খুলিয়া গিয়াছিল, তাহারই ফলে যে একখানি কাব্য আমরা লাভ করিয়াছি, তাহাতেই মধুসূদনের প্রতিভার পরিমাপ করিতে পারি। এই কাব্যরচনার যে কাহিনী আমরা অবগত আছি,

তাহাতে দেখা যায়, কবি যেন ঝড়ের মুখে ছুটিয়াছেন, স্থির হইয়া গুছাইয়া বসিবার সময় নাই; উপকরণ আয়োজন সম্ভ গড়িয়া উঠিতেছে, কাব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহা খণ্ডশ প্রকাশিত হইতেছে, এবং তাহারও ফাঁকে ফাঁকে অন্য কাব্য-রচনা চলিতেছে; শেষে মুদ্রণ-ব্যয়ের হিসাব করিয়া কাব্যের কলেবর সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে। এক কথায়, মনের যে অবকাশ এবং বাহিরের যে অনুকূল অবস্থা না থাকিলে কবির কাব্যসৃষ্টি সুসম্পন্ন হইতে পারে না, মধুসূদন তাঁহার প্রতিভার এই শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি-নির্ম্মাণকালে তাহাও লাভ করেন নাই। তথাপি 'মেঘনাদবধ' যে কেমন করিয়া এত বড় কাব্য হইতে পারিল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র প্রেরণামূলে কবি-চরিত ও কবিজীবনের যে নিয়তি রহিয়াছে, তাহার আলোচনা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি; এক্ষণে, সেই সকল কথা মনে রাখিয়াই এ কাব্যের কবিত্ব ও কবিকর্ম্মের নৈপুণ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা করিব। এ আলোচনায় কাব্যের সাধারণ সহজলভ্য পরিচয় অথবা তাহার বস্তুঘটিত বিবরণ থাকিবে না। এ কাব্যের সাক্ষাৎ প্রেরণা, তাহার বাণীভঙ্গি বা স্টাইল, এবং কাব্যনির্ম্মাণকার্য্যে নানা ভাব ও কল্পনাবস্তুর সংযোজন ও সে সকলের পাক-নৈপুণ্য—এই কয়টির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমি এই কাব্যের রসনিবেদন করিব। ছন্দ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন হইবে।

'মেঘনাদবধ' যে একটি রীতিমত মহাকাব্য নয়, সে আলোচনা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। অন্যান্য কাব্যের মত, এখানেও মধুসূদন একটি বিশেষ আদর্শের অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্যরচনাকালে তাঁহার স্বকীয় কবিধর্ম্ম সেই সজ্ঞান সঙ্কল্পের উপরে জয়ী হইল; এতদিন ভিতরে যাহা চাপা ছিল, তাহাই প্রবলবেগে উৎসারিত হইল; মহাকাব্য-রচনার ভানে তিনি একপ্রকার মুক্ত-কল্পনা ও দীর্ঘচ্ছন্দের কথা-কাব্য রচনা করিলেন; তাহাতে শাস্ত্রশাসন অপেক্ষা কবির আপন রুচি ও আত্মভাব প্রশ্রয় পাইয়াছে—আকারে-প্রকারে যেটুকু মহাকাব্যের লক্ষণ আছে, তাহা অবাধ কল্পনার শৃঙ্খলরূপে বড়ই কার্য্যকরী হইয়াছে। 'মেঘনাদবধে'র ঘটনাবস্তু জটিল বা বিস্তৃত নহে; চরিত্রসৃষ্টিতে অথবা নায়কের কীর্ত্তিকুশলতায় মহাকাব্যোচিত মহিমা ইহার নাই—এমন একটি চরিত্রও নাই, যাহাকে দুর্দ্ধর্ষ পুরুষবীর বা মানুষরূপী দেবতা বলা যাইতে পারে। নায়ক

মেঘনাদের হত্যা এবং যে-ভাবে সেই হত্যা সাধিত হইয়াছে, লঙ্কার সর্ব্বনাশ ও রাবণের শোক—এ সকলের কোনটিতেই মহাকাব্যোচিত বিষয়-গৌরব নাই। এতদ্‌ব্যতীত আরও অনেক লক্ষণ ইহাতে আছে, যাহা মহাকাব্যের শাস্ত্রসম্মত আদর্শের উপযোগী নয়। এজন্য বালক রবীন্দ্রনাথ হইতে প্রৌঢ় সমালোচক যোগীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এই কাব্যের বহু ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। ত্রুটি যে নাই তাহা নহে, কিন্তু সেই ত্রুটির বিচারে কোন বহির্গত আদর্শ প্রয়োগ করা চলিবে না—কেন, তাহাও ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে বলিয়াছি। কাব্যের দোষগুণ বিচার করিতে হইলে সকল শাস্ত্রসংস্কারমুক্ত হইয়া, সেই কাব্যেরই অন্তর্গত প্রেরণা লক্ষ্য করিতে হইবে, নতুবা কবির কাব্যরচনা আমাদের পক্ষেই নিষ্ফল হইবে।

অতএব 'মেঘনাদবধ-কাব্য' কোন্ জাতীয় কাব্য—সে বিচারে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; ঐ কাব্যে কবির কল্পনা ও ভাবাবেগ কোন্ ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, কবিমানসের পক্ষপাত ও কবিপ্রাণের স্ফূর্ত্তি কি ভাবে ও কি ভঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে, এবং তাহা রসসৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে কি না, ইহাই দেখিতে হইবে; তাহাতেই এ কাব্যের স্বরূপ প্রকাশ পাইবে। প্রত্যেক কাব্যে রসের পাক স্বতন্ত্র; তাহাই অনুভব করিয়া রসিকের চিত্ত নূতনতর স্বাদের আনন্দে পুলকিত হয়। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কবিকে পাইয়া বসিয়াছিল মুখ্যত দুইটি বস্তুর নেশা, এক—উদার উদাত্ত ছন্দের স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ, এবং দুই—সেই ছন্দের প্রবাহে সাগরস্রোতে পোতমালার মত বস্তুপুঞ্জের বর্ণনীয় শোভা। কবির মনের পূর্ব্বসঞ্চিত ও নব-উদ্ভাবিত যত কিছু স্মরণীয় ভাব ও প্রেক্ষণীয় সৌন্দর্য্য, স্থির চিত্র ও গতিশীল দৃশ্য—সমস্তই বিপুল সমারোহে এই কাব্যের তরঙ্গায়িত ছন্দঃস্রোতে শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে। যে কাব্যরসিক পাঠক 'মেঘনাদবধ-কাব্য' পাঠ করিয়াছেন বা করিবেন, এই দুয়েরই মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব রস তাঁহাকে সম্মোহিত করিবে; কাহিনী যেমনই হউক, কবিশক্তির আর যত নিদর্শনই থাকুক—সর্ব্বাগ্রে এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, এই সঙ্গীতস্রোতোবাহিত বস্তু-পুঞ্জের দৃশ্য ও শ্রব্য রূপ তাঁহাকে চমৎকৃত করিবেই; যদি না করে, তবে বুঝিতে হইবে, এ কাব্যরসের আস্বাদনে তাঁহার অধিকার নাই। এ কাব্যে কবিচিত্তের মূল প্রেরণা এই সঙ্গীত; এই সঙ্গীত শুধু ঐ কাব্যের নয়—নব্য বাংলা কবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে, বাংলা কাব্যে ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। 'মেঘনাদবধ-কাব্য' যেন এই সঙ্গীতেরই সুর-লয়ে ধাপে ধাপে গড়িয়া উঠিয়াছে—কাব্যের যাবতীয়

লঘু ও গুরুভার বস্তুপিণ্ড এই সঙ্গীতের যাদুমন্ত্রে সুসজ্জিত ও সুসম্বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন য়ুরোপীয় কাব্যে একটা কবিপ্রসিদ্ধি আছে—ট্রয়-নগরীর বহিঃপ্রাকার নাকি রবি-দেবতা 'আপলো'র বংশীরবে স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই সঙ্গীতেরই মায়াবলে প্রস্তররাশি আপনা হইতে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ইংরেজী কাব্যে এই প্রসঙ্গের যত উল্লেখ আছে, তাহার একটি এ স্থানে উদ্ধৃত করিয়া, আমি মধুসূদনের কাব্যনির্ম্মাণেও কবিপ্রেরণার এই আশ্চর্য্য গুণ কবির ভাষাতেই বর্ণনা করিব। যথা—

Anon out of the earth a fabric huge
Rose like an exhalation, with the sound
Of dulcet symphonies and voices sweet.

—'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র মূলে ছন্দ-সঙ্গীতের এই প্রেরণাই যে প্রধান রস-প্রেরণা হইয়া আছে, তাহা ভাবিলে, এইরূপ কবিপ্রসিদ্ধির কারণ সত্য বলিয়াই মনে হয়।

ছন্দ ও বর্ণনাসক্তির এই যে আবেগ মধুসূদনের কাব্যে লক্ষ্য করা যায়—ইহাই কবিচিত্তশতদলের সাক্ষাৎ বিকাশ-হেতু, যদিও তাহাই কবিকল্পনার সর্ব্বস্ব নহে। কাব্যের কাহিনী-অংশ ও তাহার উদ্ভাবনায় যে অন্যবিধ বৃত্তি সক্রিয় হইয়াছে, তাহা যেন এই আদি চিত্তস্ফূর্ত্তির পরবর্ত্তী ঘটনা। 'মেঘনাদবধে'র ছন্দ কেবল একটা নূতন ছন্দমাত্রই নহে,—তোটক, পঞ্ঝটিকা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতির মত ছন্দশিল্পের কসরৎ ইহা নহে। মধুসূদনের সমগ্র কবি-সত্তা যে পরিপূর্ণ প্রকাশবেদনায় অধীর হইয়াছিল, তাহাই শান্তিলাভ করিয়াছে সরস্বতীর এই নবসঙ্গীতময়ী মূর্ত্তিরচনায়। সরস্বতীর সঙ্গীতময়ী মূর্ত্তি বলিলাম এইজন্য যে, এই ছন্দ কাব্যের ভূষণমাত্র নহে, ইহা বাণীরই এক নূতন রসরূপ। এইজন্য মধুসূদনের এই কাব্য ও তাহার ছন্দ পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের মত নিত্যসম্পৃক্ত হইয়া আছে, এ কাব্যের বাহিরে আর কোথাও এ সঙ্গীত ধরা দেয় নাই। তথাপি, আর এক দিকে এই ছন্দ বাংলা কাব্যের যে উপকারসাধন করিয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ তেমন করিয়া লক্ষ্য করেন নাই—কেবলমাত্র ছন্দহিসাবে সেই কাজই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ। যে ছন্দকে বাংলা কাব্যের স্বভাবসিদ্ধ আদি ছন্দ বলা যাইতে পারে—ভাষার মজ্জাগত দুই বিভিন্ন ধাতুর—প্রাকৃত ও কথ্য, উভয় রীতির—মিশ্রণে যে ধ্বনিপ্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই যে ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে পয়ার নাম দিয়াছেন—

সেই ছন্দের স্রোতোহীন বদ্ধ জলাশয়কে মধুসূদন তটপ্লাবিনী বেগবতী স্রোতস্বিনীতে পরিণত করিয়াছেন ; এক দিকে তাহাকে সানুনাসিক সুরের কবল হইতে মুক্ত করিয়াছেন, অপর দিকে তাহাকে খাঁটি কাব্যচ্ছন্দের স্বাধীন গতিলীলায় প্রাণবন্ত করিয়াছেন। মধুসূদনের পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যের পয়ার-ত্রিপদী, ও তাঁহার পরবর্ত্তী কাব্যের ঐ জাতীয় ছন্দ পাঠ করিলে উভয়ের পার্থক্য সহজেই প্রতীয়মান হইবে ; নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন, স্তবকের আকারে এবং মিত্রাক্ষর ছন্দেও সেই পয়ারের গতি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পয়ার ছন্দে রচিত আধুনিক সকল কবিতায় মধুসূদনের প্রভাব সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার তানে-লয়ে মধুসূদনের যতি ও মাত্রার সুদূর অথচ সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি সহজেই অনুভূত হইবে। তাহার কারণ মধুসূদন একটি বিশেষ ছন্দের উদ্ভাবনাই করেন নাই ; তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলা পয়ারের মূলে নাড়া দিয়াছে, তাহার সেই আদিপ্রকৃতিকে যেন এক প্রচণ্ড তাড়িত-শক্তির আঘাতে বিশ্লিষ্ট করিয়া নূতন সংযোগ-বিয়োগের দ্বারা, চিরকালের জন্য নূতন পদার্থে পরিণত করিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে করিব।

এইবার এ কাব্যের কবিপ্রেরণা যে এক অপূর্ব্ব কাব্যসঙ্গীতে সর্ব্বপ্রথমে ধরা দিয়াছে, তাহার ভাবরূপ কি, তাহাই নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। এই কাব্যের কাহিনীসূত্রে যে সকল বর্ণনা ও যে ধরণের চিত্রাবলী গ্রথিত হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বত্র যেগুলির মধ্যে কবিপ্রাণের উল্লাস বাগ্‌বন্ধে ও ছন্দহিল্লোলে উদ্বেল হইয়াছে দেখা যায়, কবিকল্পনার বিশিষ্ট প্রকৃতি তাহা দ্বারাই নির্দ্ধারণ করা যাইবে। মানব-ভাগ্য বা মনুষ্য-জীবনের রহস্য কবিকে একটি সহজ সরল সংবেদনায় আবিষ্ট করিয়াছে, কোন গভীরতর আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠায় উদ্বিগ্ন করে নাই। ছন্দের মধ্যে যেমন একটি উদাত্ত-গম্ভীর, সরল-মধুর গীতোচ্ছ্বাস ও নির্ভীক-নিরঙ্কুশ আত্মপ্রত্যয়ের আবেগ আছে, কাব্যের ভাববস্তুতেও তেমনই জীবনের অতি সহজ সরল অনুভূতি ও সংশয়হীন ভাবনা-কামনার লক্ষণ রহিয়াছে ; বহির্জ্জগতের যে রূপমোহ কবিকে অভিভূত করিয়াছে, তাহারও বিশিষ্ট লক্ষণ একপ্রকার সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিরচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব কোনরূপ বিধিবদ্ধ প্রণালীতে রচিত না হইলেও মহাকাব্যের কতক লক্ষণ ইহাতে আছে ; কাব্য-শাস্ত্রের কোন্ বিধি কবিচিত্তকে বাধ্য না করিলেও, এ কাব্যে কোনও বিশেষ নীতিজ্ঞান, তত্ত্বচিন্তা, অথবা মানব-ভাগ্যের নূতনতর ব্যাখ্যা প্রভৃতির অভিমান নাই ; কেবল একটি

সবল স্বচ্ছন্দ ভাবস্রোত সুপ্রসর কল্পনাপথে প্রবাহিত হইয়াছে; তাহাতে আত্মভাবপ্রাধান্যের বহু নিদর্শন থাকিলেও জগৎ ও জীবনকে দেখিবার যে ভঙ্গি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আদিম কবি-মনোভাবের মতই সুস্থ ও সবল। এজন্য ক্লাসিক রচনাভঙ্গি ও রোমান্টিক মনোবৃত্তি, মহাকাব্যীয় কল্পনা ও গীতিকাব্যীয় ভাবোচ্ছ্বাস, বিরাট ও বৃহতের প্রতি পক্ষপাত এবং সেই সঙ্গে দুর্ব্বল মানবপ্রকৃতির প্রতি সহানুভূতি—করুণ ও মধুরের বশ্যতা, এ সকলই এ কাব্যের রসপুষ্টি করিয়াছে। বেশ মনে হয়, কাব্যরচনাকালে, ভাবাচ্ছন্ন অবস্থায়, কবিকে যাহা চালিত করিয়াছে, তাহা কোনও একটি সুনির্দ্দিষ্ট ভাবচিন্তা বা সুপরিকল্পিত জীবনালেখ্য নয়—কবিহৃদয় যেন স্বচ্ছন্দপ্রবাহিনী কলকল্লোলময়ী জীবন-জাহ্নবীতে মহাকুতূহলে ঝাঁপ দিয়াছে; তাহার তলদেশের গভীরতা অথবা স্রোতোধারার আদি-অন্ত নির্ণয়ে কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। কেবল তরঙ্গচূড়ায় প্রতিফলিত নব নব রশ্মিরাগ, কলধ্বনির ছন্দহিল্লোল ও সন্তরণমথিত জলরাশির আলিঙ্গন-সুখ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, কবির কাব্যসৃষ্টির উৎসাহ রক্ষা করিয়াছে। এ যেন ভাব-চিন্তার আবেগ নয়—কবিচিত্তের দুর্দ্দমনীয় আনন্দ, তাহারই অধীর উচ্ছ্বাস কাব্যের আকার ধারণ করিয়াছে; এ যেন বাংলাভাষার কঠিন নিশ্চল পাষাণ-ভিত্তি ভেদ করিয়া সহসা উৎক্ষিপ্ত এক প্রচণ্ড উৎসধারা—যেন গ্রীক পুরাণোল্লিখিত 'জেউস'-দেবতার ললাট হইতে অকস্মাৎ সর্ব্বাভরণভূষিতা 'পালাস'-দেবীর আবির্ভাব; আমাদেরই এক কবির ভাষায়—

যেন ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া ওম্-শব্দে নিঃসরিয়া
উরিলা ব্রহ্মার কন্যা দেবী বাগীশ্বরী!

এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, 'মেঘনাদবধে'র কাব্যরস উপভোগ করিতে হইলে কাব্যের অন্তর্গত এই কবিপ্রেরণাকে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, কবিহৃদয়ের সহিত আমাদের হৃদয় যুক্ত করিতে হইবে—সবিস্ময়ে অনুভব করিতে হইবে, কেমন করিয়া সহসা সেইকালের সেই অবস্থায় এক অসাধারণ কবিপ্রতিভার উন্মেষ হইতেছে, কবিকল্পনার কোন্ আদি প্রবৃত্তি আমাদের কাব্যে নবজীবন সঞ্চার করিতেছে; কোন্ প্রেরণার বলে, ভাষায় ও ছন্দে কাব্যকলাকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের সন্ধান নয়, স্বপ্নসম্ভব অবাস্তবের গীতমূর্চ্ছনা নয়, বাক্য-অর্থের অগোচর অসীম আকুতির ব্যঞ্জনাও নয়—এ কাব্যের মহিমা অন্যবিধ। ইহার কবি-শরীর সবল ও সুস্থ যৌবনধনে ধনী; ইহার চক্ষু

বিস্ফারিত, নাসা গর্ব্বস্ফুরিত, ললাটের কেশকলাপ ঘনবিন্যস্ত, অংসবিলম্বিত ; ইহার ঈষৎ-বিযুক্ত ওষ্ঠাধরে যে গীতধারা পূর্ণকণ্ঠে উৎসারিত হইতেছে, তাহাতে চিন্তা নাই, ভয়-সংশয় নাই, কেবল অকপট আত্মঘোষণা আছে ;—দেশ-বিদেশের কাব্য ছানিয়া, যথা-তথা হইতে যত কিছু উপাদান সবলে সংগ্রহ করিয়া, তাহাই আপন হৃদয়াবেগের রসায়নে রসায়িত করিয়া সেগুলিকে একটি অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীত-ধারায় সুবিন্যস্ত করিয়া, যেন এক যুবাবয়সী শিশু আপন কবিপ্রাণের অসহ্য পুলক নিবেদন করিতেছে। তাই 'মেঘনাদবধ-কাব্য' বাংলার প্রাচীন মঙ্গলকাব্য অথবা আধুনিক কাহিনীকাব্য নয় ; 'সারদামঙ্গল'-কাব্যের মত সরস্বতী-বন্দনাও ইহা নহে। ইহা কবিরই আত্ম-জাগরণের জয়-ঘোষণা। এই কাব্যের রস—ছন্দ ও ভাষার কলনিনাদসম্ভূত সরল ভাবাবেগ ও সুস্পষ্ট চিত্র-সৌন্দর্য্যের রস। এ কাব্য—ব্যাখ্যা নয়, বিশ্লেষণ নয়, কেবলই পাঠ করিতে হইবে ; এবং পাঠ করিবার কালে ইহার ছন্দোময় বাগ্‌বিভূতির উদ্দীপনমন্ত্রে কাব্যবর্ণিত কাহিনী, ঘটনা ও চিত্রাবলীর রস আস্বাদন করিতে হইবে, কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই কাব্যসৌধের যত কিছু কারুকার্য্য—ইহার ভিত্তি, স্তম্ভ ও শীর্ষক-চূড়ার যত কিছু গরিমা ও মহিমা—এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

মেঘনাদবধ কাব্য-পাঠ ; এ কাব্যের মুখ্যগৌরব ; কাব্যবস ও রস-সঙ্গীতের অভিন্নতা।

এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, এইবার তাহার প্রমাণস্বরূপ কাব্য হইতে কিছু কিছু পাঠ করিয়া শুনাইব। জানি, আমি যাহাকে পাঠ করা বলিতেছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে উদ্ধৃত করা ছাড়া আর কিছুই নহে ; তাই আশঙ্কা হয়, আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে না ; যেমন করিয়াই ব্যাখ্যা করি না কেন, তাহাতে পাঠকের শ্রুতিমূলে কাব্য জীবন্ত হইয়া উঠিবে না, যে রসের কথা বারবার উল্লেখ করিয়াছি, সে রসের উদ্রেক হইবে না। ভাবনার বিশেষ কারণ এই যে, মধুসূদনের মহাকাব্য এখন আর কেহ পড়ে না, পড়ার অভ্যাস গিয়াছে। এই লিরিক-প্রধান কাব্যের যুগে ভাষা ও ছন্দ এমনই তরল ও চপল-চটুল হইয়া উঠিয়াছে যে, সেই সুরে অভ্যস্ত কান অমিত্রাক্ষরের এই মৃদঙ্গ-নির্ঘোষ সহসা ধরিতেই পারিবে না ; যে যতি-বিন্যাসে ইহার তাল ও লয়, এবং যে অক্ষরধ্বনিতে ইহার রিদ্‌ম (rythm) বা ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হইয়াছে, আধুনিক কাব্যচ্ছন্দে তাহার আভাসমাত্র নাই—রবীন্দ্রনাথের পয়ারেও তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে। তথাপি আশা করি, আমি এখানে যে ক্ষুদ্র বৃহৎ পংক্তিপর্ব্ব উদ্ধৃত করিব, দৃষ্টান্তহিসাবে তাহা একেবারে ব্যর্থ হইবে না ; কাব্যসঙ্গীতের কান বা ছন্দজ্ঞান যাঁহার কিছুমাত্র আছে, সেরূপ পাঠক একটু যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে চেষ্টা করিলে, কাব্যের এই রস-আস্বাদনে বঞ্চিত হইবেন না।

প্রথম সর্গে রাবণের সভা, লঙ্কাপুরী প্রভৃতির আবশ্যকমত বর্ণনার পরে, কবি রাবণকে প্রাসাদশিখরে উঠাইয়া, প্রথমে সুবিস্তীর্ণ রণস্থল ও পরে সহসা সেতুশৃঙ্খলিত সমুদ্রের রূপ দেখাইয়াছেন, সে বর্ণনা এইরূপ—

এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুইপাশে তরঙ্গনিচয়
ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণীবর,
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে।

অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু ; রাজপথ-সম
প্রশস্ত ; বহিছে জনস্রোত কলরবে,
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে।

অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমাবে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকব? কোন্ গুণে কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশবথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জন বৈবী তুমি ; প্রভঞ্জন সম
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে,
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতীপুবী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভরতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি তার প্রতি?
উঠ, বলি, বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূব কর অপবাদ, জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।

বাক্যচ্ছন্দের এই অবারিত কলকল্লোলের মধ্যে, ভাব-অর্থের মৌলিকতা অপেক্ষা যে বস্তু অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ঐ দৃশ্যের বর্ণনীয় অংশ নয়—সমুদ্রের মহত্ত্ব, গাম্ভীর্য্য ও বিপুলতার একটি সঙ্গীতাত্মক ব্যঞ্জনা। সঙ্গীতের এই তরঙ্গপরম্পরার মধ্যেও দুই একটি শব্দতরঙ্গ লক্ষ্যণীয় ; যাঁহাদের কান আছে তাঁহারাই বুঝিবেন, এ শুধু ছন্দের কলাকৌশল নয়—বাগ্‌দেবতার নৃত্যচপল লাস্য-লীলার অসীম ছলনাকে কতখানি আয়ত্ত করিতে পারিলে, ভাষায় ভাব-অর্থের সহিত সঙ্গীতের এমন সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে ; যথা—

ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়।

—এখানে প্রথমে, আগে ও পিছে ঈষৎ যতির দ্বারা 'সাগর' শব্দটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, পরে 'মকরালয়' শব্দ এবং পূর্ণ-যতির প্রয়োগ হইয়াছে ; তাহাতে দ্বিতীয়

পংক্তির ঐ দুই শব্দের কি অপূর্ব্ব ধ্বনিগৌরব ঘটিয়াছে। সাগরের বিস্তৃত বর্ণনার পূর্ব্বেই দুইটিমাত্র কথায়, কবি পাঠকের চিত্তে, ভাবধ্বনির সাহায্যে সে দৃশ্যের পূর্ণ উদ্বোধন করিয়াছেন। তারপর—

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ!

—এই পংক্তিটির মধ্যে প্রবহমান ধ্বনিস্রোত অবশেষে 'প্রচেতঃ' এই শব্দটিতে আসিয়া যে ভাবে ধাক্কা খাইয়া তাল রাখিয়াছে, তাহাতে এবং ঐ একটি মাত্র শব্দের প্রয়োগে, পাঠকের চিত্তে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা অর্থ অপেক্ষা ফলপ্রদ—বিপুল-বিশালের সম্মুখীন, তেমনই বিশালবক্ষ ও দুর্দ্ধর্ষচেতা এক পুরুষ-বীরের উন্নত শির নিমেষে আমাদের নয়নগোচর হয়। অথবা—

এই যে লঙ্কা, হৈমবতীপুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভরতন যথা মাধবের বুকে,

—এ যেন "large accents of the earlier gods"। ভাষার এ ঐশ্বর্য্য কাব্য-সঙ্গীতের এমন উদার উদাত্ত ধ্বনি বাংলা কাব্যকে একটি সুদুর্লভ ও সুচির সম্মান দান করিয়াছে। বাণীবিগ্রহ-নির্ম্মাণে এমন বিশালভিত্তি উন্নতশিখর, অথচ ঋজুভঙ্গিম স্থাপত্যরীতি বাংলা ভাষার কোথায়ও নাই।

ইহার পর, আমি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কয়েকটি পংক্তি-পর্ব্ব উদ্ধৃত করিব; তাহাতে ভাব, অর্থ, বিষয়বস্তু প্রভৃতি এই সঙ্গীতরসে ও বাক্যযোজনার কৌশলে কিরূপ কাব্য হইয়া উঠিয়াছে, শব্দের ধ্বনিমন্ত্রগুণে বাক্য কিরূপ রসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করিতে বলি।

দ্বিরদরদনির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা!

এই পংক্তিগুলির মধ্যে ছন্দের যে যাদুশক্তি অনুভব করা যায় তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই—মধুসূদনের কানে এই নূতন ছন্দ কি ভঙ্গিতে ধরা দিয়াছিল, এখানে তাহার স্পষ্ট সঙ্কেত আছে।

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারীদেশে; দেবদত্ত শঙ্খনাদে রুষি,
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিলা কৌতুকে;—

উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে ; ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী ,
মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব উর্দ্ধকর্ণে শুনি
নূপুরের ঝন্‌ঝনি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী ।
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে ! রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে কাননে কন্দরে
নিদ্রা তাজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি ;—
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে ।

এই অংশটি একটি সম্পূর্ণ verse paragraph—তাললয়সমন্বিত একটি অখণ্ড ছন্দসঙ্গীত। পড়িবার সময়ে, সাবধানে যতিগুলিকে যথাযথ রক্ষা করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ছন্দস্রোতকে অব্যাহত রাখিতে পারিলে—কখন দ্রুত কখন বিলম্বিত, কখন উচ্চ কখন নিম্ন উচ্চারণে, এবং অর্থানুসারে যতির অবকাশ কখন স্বল্প কখন দীর্ঘ করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিলে, এই বাক্যযোজনার অপূর্ব্বত্ব বুঝা যাইবে। এখানে কোন্ প্রকার রসাবেশ কবিকে আবিষ্ট করিয়াছে ? কিসের আবেগে তিনি এমন স্বচ্ছন্দে এতগুলি অক্ষরকে একটা সাধারণ ভাব-অর্থের গণ্ডির মধ্যে টানিয়া রণসজ্জার কোলাহলকে এমন জীবন্ত অথচ শ্রুতিসুখকর করিতে পারিয়াছেন ? এই কবিতাংশটির বিষয় বা অর্থবস্তু বড় নয় ; ইহার কাব্যধ্বনিই সেই অর্থকে বৃহৎ করিয়াছে ; কবির আনন্দ তাহাতেই ;—তিনি আমাদিগকে বিশেষ করিয়া সেই আনন্দের অংশভাগী করিতে চান। সে আনন্দ কি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি—তাহা জীবনজলাশয়ে জলকেলির আনন্দ ; জলতলে বিচ্ছুরিত বিচিত্র রশ্মিছটা, ও উচ্ছল-তরল-তরঙ্গের শতস্বরময় কলধ্বনিকে বাণীর বীণাঝঙ্কারে প্রতিফলিত করার আনন্দ। এইরূপ আর একটি উদাহরণ দিব, যথা—

কতক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একেবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ
স্ত্রীবৃন্দ ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে , কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী , রথে রথী , তুরঙ্গমে

সাদীবর ; সিংহাসনে রাজা ; অবরোধে
কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ;
পর্ব্বত-গহ্বরে সিংহ ; বনহস্তী বনে ;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত ।

এখানে কথাবস্তু অতি সামান্য, ভাব-অর্থ নাই বলিলেই হয়, ছন্দই যেন একাধিপত্য করিতেছে। কিন্তু ঘটনাহিসাবে কবি ইহাকে বিশেষ গৌরবদান করিবার জন্য—নারীসৈন্যের বীরদর্প আমাদের মনে মুদ্রিত করিবার জন্য—কতকগুলি কথার মালা গাঁথিয়াছেন। সেই কথাগুলির অর্থ একই ; তথাপি 'সমস্ত প্রাণীকুল কাঁপিয়া উঠিল' না বলিয়া তিনি রূপকথার ভঙ্গিতে প্রত্যেক প্রাণীর পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যবিশেষে এইরূপ কথা-বিস্তারের একটা রসঘটিত প্রয়োজন থাকিতে পারে, এখানে সে প্রয়োজন নাই ; কিন্তু তদপেক্ষা বড় প্রয়োজন ছিল। কবি সেই ঘটনাটিকে ভাব-গৌরব দান করিবার জন্য একটি বৃহৎ বাক্য-সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছেন ; সেই সঙ্গীতকে পূর্ণ অবকাশ দিবার জন্য যে সময়টুকু চাই, সেই সময়-পূরণের জন্যই এখানে এতগুলি কথা সাজাইতে হইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইবে, এই কাব্যে কোন্ বস্তু কবিকর্ম্মের প্রধান উপকরণ হইয়াছে ; কবির রসকল্পনার মূল আবেগ ইহার দ্বারাই নিরূপণ করা যায়। এই আবেগের বশেই নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে উৎকৃষ্ট কাব্য-সৃষ্টি হইয়াছে,—

যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে
অগ্নিময় দশদিশ—দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভারাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদপুঞ্জে ! শুনিলা চমকি
কোদণ্ডঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া-দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্‌ঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী !
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা,
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজিরাজী,
বোলিছে ঘুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু-ঘুনু-বোলে।

এখানে শুধুই ছন্দসঙ্গীতের নেশা নয়, গূঢ়তর কবিপ্রেরণার লক্ষণ রহিয়াছে—এ বাক্যঝঙ্কার কবির গভীরতর রসচেতনা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। তৃতীয় সর্গ—'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র একটি উৎকৃষ্ট সর্গ ; এই সর্গের পরিকল্পনায় ও বাণীনির্ম্মাণে মধুসূদনের কবিহৃদয় পূর্ণভাবে সাড়া দিয়াছে। পুরুষের সুস্থ পৌরুষের মধ্যেই যে

দুই বিভিন্ন বৃত্তির বিকাশ দেখা যায়—তাহার যৌন-স্বভাবের অনুকূল সেই দুই বৃত্তি—এক দিকে কঠোর কঠিন, দুরূহ-দুর্গম, ভীষণ-গম্ভীরের প্রতি আকর্ষণ; অপর দিকে মধুর-কোমল, দুর্ব্বল-সুন্দরের প্রতি মোহ—এই দুইয়ের মিলিত ভাবরস এই সর্গের প্রেরণা যোগাইয়াছে; তাই কবির সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে প্রমীলার চরিত্র এমন মৌলিক ও জীবন্ত হইয়াছে। এই সর্গে বর্ণিত বীরাঙ্গনার যুদ্ধযাত্রা ও তাহার আনুষঙ্গিক বর্ণনায় রসাভাব ঘটিবার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের শান্তি মল-পায়ে ঘোড়া ছুটাইয়াছে, তাহাতে রসাভাস হইয়াছে কিনা সহসা বলা যায় না—কিন্তু এখানে যে তাহা হয় নাই—তাহা নিশ্চিত; এখানে বীররসের সহিত আদিরস অতি সুন্দর মিলিয়াছে, না মিলিলে—

> মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজিরাজী,
> বোলিছে ঘুঙ্ঘুবাবলী ঘুনু-ঘুনু-বোলে।

এমন অপূর্ব্ব বাজনা বাজিয়া উঠিত না।

আর একটি পংক্তিপর্ব্ব উদ্ধৃত করিব, তাহাতেও ছন্দসঙ্গীতের দ্বারাই কাব্যরস-সৃষ্টির একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।—

> উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
> শুনিনু ভৈরব রব, দেখিনু সম্মুখে
> সাগর নীলোর্ম্মিময়। বহিছে কল্লোলে,
> অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি।
> ঝাঁপ দিয়া জলে সখি, চাহিনু ডুবিতে,
> নিবারিল দুষ্ট মোরে! ডাকিনু বারীশে,
> জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
> অবহেলি অভাগীরে। অনম্বর-পথে
> চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে কি গুণে এমন সঙ্গীতরসের আধার হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র কাব্যখণ্ডের মধ্যে তাহার প্রচুর নিদর্শন আছে—ছন্দকৌশলের সে রহস্য আমি এখানে ভেদ করিবার চেষ্টা করিব না। আমি কেবল পাঠককে এই পংক্তি কয়টি বার বার পড়িতে বলি—ছন্দ বুঝিবার জন্য নয়, ইহার সঙ্গীতরস আস্বাদন করিবার জন্য। এখানেও সহসা সমুদ্র দেখা দিয়াছে—সমুদ্রের উপরে আকাশ এবং আকাশপথে দ্রুত-ধাবমান রথে রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা সীতার বিলাপ—এই সকলের দৃশ্যগত চিত্র, গতি ও ধ্বনি, কবি এই সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলীর দ্বারাই পাঠকের

চিত্তগোচর করিয়াছেন; কিন্তু সেই গোচর করার প্রধান উপায় হইয়াছে শব্দার্থ অপেক্ষা সেই শব্দের সঙ্গীতাত্মক ভাব বা ধ্বনিব্যঞ্জনা। শব্দের ধ্বনিব্যঞ্জনা যে কাব্যরসের কত বড় আশ্রয়, তাহার প্রমাণ সকল শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যভাষায় পাওয়া যায়—রসজ্ঞ সমালোচকেরাও খাঁটি কাব্যরসের লক্ষণনির্দ্দেশে এই বস্তুকে বার বার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদের সাহিত্যে, আধুনিক কাব্যশিল্পে, মধুস্থদনই সর্ব্বপ্রথম এই শক্তির পরিচয় দিয়াছেন; বস্তুত তাঁহার সমসাময়িক বা ঈষৎপরবর্ত্তী আর কোন কবির কাব্যে—হেমচন্দ্র বা নবীন সেনের রচনাতেও—ভাষার এই উৎকৃষ্ট কাব্যগুণ তেমন লক্ষিত হয় না। এই একটি মাত্র লক্ষণেই মধুস্থদনের কবিপ্রতিভার কৌলীন্য নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

অতিশয় conventional বা মামুলি ধরনের কাব্যবস্তুও মধুস্থদনের এই কবিশক্তির গুণে তাহাদের সেই মামুলিয়ানা সত্ত্বেও কিরূপ চিত্ত-চমৎকারের স্থষ্টি করিয়াছে, তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব।—

(১) শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব-পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা বাণী কভু এ জগতে!

(২) প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে—হায় রে যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য-কথা,—কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি)—"ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখীকুল! মেল' প্রিয়ে! কমল-লোচন,
উঠ, চিরানন্দ মোর!

... ...

উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুস্থম!" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর স্থরবে!

(৩) হাসি দেখা দিল উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে
দুঃখতমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে; গুঞ্জরি অলি ধাইল চৌদিকে

মধুজীবী ; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী
তারাদল লয়ে সঙ্গে ; উষার ললাটে
শোভিল একটি তারা শত তারা তেজে !
ফুটিল কুন্তলে ফুল নবতারাবলী !

পড়িয়া মনে হয়, নিজহৃদয়ের আনন্দচ্ছন্দে কবি সকল বস্তুকেই মনোহর করিয়া তুলিয়াছেন ; কৃত্রিম ও স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক ও কাল্পনিক, সহজ ও আলঙ্কারিক——সকল প্রকার সৌন্দর্য্য, উচ্চ-তুচ্ছ নির্ব্বিশেষে, তাঁহার এই আনন্দের উপকরণ যোগাইয়াছে। আনন্দাবেগ-প্রসূত এই ছন্দসঙ্গীতের রসায়নে, এমন বস্তু নাই যাহা আমাদের রসচেতনায় একরূপ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া না উঠে। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে কয়েকটি অলঙ্কারের তালিকামাত্র আছে, কিন্তু তাহাও কেমন রসসম্পৃক্ত হইয়া উঠিয়াছে !—

খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁতি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী ,

'বীরাঙ্গনা কাব্যে' এই বস্তুই আর একবার দেখা দিয়াছে—

চাহিনু কাঁদি বনদেবীপদে
দুকূল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটীদেশে।

অন্যত্র

যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি,—লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে।
গজরাজ-তেজ ভুজে ; অশ্বগতি পদে ;
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া ; অঞ্চল পতাকা
রত্নময় , ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গার,
পট্টিশ, নারাচ কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে।

এই বিশিষ্ট কাব্যগুণের আর একটি মাত্র উদাহরণ দিয়া আমি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র এ পরিচয় শেষ করিব। এ প্রসঙ্গে আমি বিশেষ করিয়া কাব্যের সেই সকল স্থানে উদ্ধৃত করিলাম, যাহাতে কবিপ্রতিভার একটি বড় লক্ষণ ফুটিয়া

উঠিয়াছে—বাংলা কাব্যে যে নূতন বাণীসৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার মূল রহস্য দীপ্যমান হইয়া আছে।

কতক্ষণে উতরিয়া উদ্যান দুয়ারে
ভীমবাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি! জটাজূট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেনলেখা, শারদ নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন!

চণ্ডীর দেউলে প্রবেশ করিবার পথে লক্ষ্মণ সহসা দ্বারদেশে প্রহরীরূপে যে মূর্ত্তির দেখা পাইল, তাহার বর্ণনায় কবি নূতন কিছু যোগ করেন নাই, প্রাচীন কাব্য হইতেই সব-কিছু আহরণ করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মণের বিস্ময় ও সেই মূর্ত্তির গাম্ভীর্য্য তিনি যে উপায়ে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাই তাঁহার নিজস্ব কবিকীর্ত্তি—শব্দচয়ন ও বাক্যের ধ্বনিগুণে সেই বর্ণনীয় বস্তু অতিপরিচয়ের তুচ্ছতা পরিহার করিয়াছে; পড়িবার কালে পাঠকের মনে বাক্যার্থের অতীত একটি ভারতরঙ্গ জাগে, বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই বস্তুর অধিক একটি সত্তা আমাদিগকে রসবিহ্বল করে। ইহাই এ কাব্যের হৃদয়গ্রাহিতার প্রধান কারণ।

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র রসাস্বাদন বা রসনিবেদনে এই দিকটির আলোচনাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক কেন, আশা করি সে কৈফিয়ৎ আর দিতে হইবে না। তথাপি এই প্রসঙ্গে আরও দুই একটি কথা বলিব। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কবিত্ব, ঘটনা, কাহিনী এবং ভাবৈশ্বর্য্য যতই উচ্চাঙ্গের হউক, তাহাতেই মধুসূদনের কবিশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যাইবে না, তাঁহার প্রতিভার অনন্যসাধারণ মহিমা স্বীকৃত হইবে না। আজিকার দিনে আমরা কাব্য হইতে ভাষা ও ছন্দকে অনাবশ্যকবোধে ত্যাগ করিয়াছি—আধুনিক কবিগণের মতে ছন্দ একটা ছেলেমানুষী, এবং poetic diction বা কবিতার ভাষা বলিয়া কোনও পৃথক ভাষা স্বীকার করা একটা কুসংস্কারমাত্র। কাজেই, মধুসূদনের কাব্যে যদি সেই বস্তুর গৌরবই প্রধান গৌরব হয়, তবে আধুনিক রসিক-সমাজে তিনি যে কিরূপ সম্মান পাইবেন তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু সেকালের রসিক-সমাজ এই কাব্যের যথেষ্ট আদর করিলেও, উহার সেই গুণ তেমন করিয়া উপলব্ধি করেন নাই—যে-গুণ কাব্য-মাত্রেরই শ্রেষ্ঠ গুণ, মৌলিক কবিপ্রতিভার অভ্রান্ত লক্ষণ। সেই রসবোধ যদি

তাঁহাদের থাকিত, তবে এই দুইটি কথা আমরা আজও পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতাম না যে, হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' শুধুই উৎকৃষ্ট কাব্য নয়, তাহা মধুসূদনের কাব্যকেও অতিক্রম করিয়াছে; এবং গিরিশঘোষের নাটকের সেই তথাকথিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ মধুসূদনের এই ছন্দেরই সগোত্র—তাহারই সহজ ও স্বচ্ছন্দ সংস্করণ! কাব্যসৃষ্টি যে আসলে বাণীসৃষ্টি; এবং বাণী যদি সম্পূর্ণ ও সুডৌল না হয়, তবে যেমন ছন্দের কথা আসিতেই পারে না, তেমনই আগে সুর না জাগিলে ভাবেরও আবির্ভাব হয় না, বাক্য রসোজ্জ্বল এবং সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইতে পারে না—কাব্যরসজ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রেই এই যে তত্ত্ব অবগত আছেন, তাহা আমাদের দেশে বর্ত্তমান সাহিত্যে কেহ এ পর্য্যন্ত তেমন উপলব্ধি করেন নাই; তাই কাব্যের রসবিচারে এমন বিভ্রাট ঘটে। কাব্যের আত্মা যে কি, সে জিজ্ঞাসা এখনও চলিয়াছে; আধুনিক সাহিত্যাচার্য্যগণ সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাক্য-অর্থের ক্যামেরা-যন্ত্রে তাহার ছবি সকলের কাছে সমান উঠিতেছে না। তথাপি এই বাণীরচনাই যে কবিশক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং বাণীর যাদুশক্তি যে, বাগ্‌বন্ধের এক অত্যদ্ভুত সঙ্গীতব্যঞ্জনায় নিহিত থাকে, তাহা রসজ্ঞ সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুত, সত্যকার সৃষ্টিপ্রেরণা বা কবিপ্রেরণা কোন কাব্যের মূলে আছে কি না, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় যেমন তাহার সর্ব্বাঙ্গের অখণ্ড সুষমায়, তেমনই তাহার ভাষার এই সুনিপুণ বাণীভঙ্গিতে। 'বৃত্রসংহারে'র ভাষায় এই বাণীসুষমা নাই; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করা যাইবে যে, ঐ কাব্যের সর্ব্বাঙ্গীণ সুষমাও নাই। তাহার ছন্দও ছন্দমাত্র, তাহাতে ভাবের সেই সূক্ষ্ম সঙ্গীতধ্বনি নাই—আওয়াজ আছে, রস নাই; বক্তৃতা আছে, কবিতা নাই। গিরিশঘোষের ছন্দ যে প্রকৃত কাব্যরসের উপযোগী নয় কেন (ঐ জাতীয় নাটকের সম্পূর্ণ উপযোগী বটে), তাহার অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই; ভাষার দিকে দৃষ্টি করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝা যাইবে। সে ভাষা নিছক ভাষা ছাড়া আর কিছুই নয়—তাহার ছন্দ তাহারই উপযুক্ত; তাহাকে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের বংশধর বলিয়া সম্মান করিলে স্বয়ং সরস্বতী মূর্চ্ছা যাইবেন।

পরিশেষে আর একটি কথা বলিয়া আমি এ আলোচনা শেষ করিব। আমি এ প্রবন্ধে 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ভাষার আলোচনা করি নাই, কেবল তাহার বাক্য-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ইহাতে এ ধারণা যেন কাহারও না হয় যে, আমি 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ছন্দকেই তাহার চরম কবিত্ব বলিয়া স্বীকার

করিয়াছি। কিন্তু আশা করি, এ আশঙ্কার কারণ নাই; কারণ, আমি যে দিক দিয়া ও যে অর্থে এই সঙ্গীতকে উচ্চস্থান দিয়াছি এবং উদ্ধৃত কাব্যাংশগুলির যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতে এ ভুল কাহারও হইবে না। আমি এই ছন্দ-সঙ্গীতকেই এ কাব্যের মূল কবিপ্রেরণা বলিয়াছি; আমি দেখাইয়াছি, এই সঙ্গীত শুধুই শ্রুতি-সুখকর ধ্বনিমাধুর্য্য নয়, এই সঙ্গীতেরই আকর্ষণে ভাবের অনুরূপ শব্দ আপনা হইতে আসিয়া ধরা দিয়াছে—ভাবের ধ্বনিরূপ ও চিত্ররূপ, উভয় রূপই তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর দৃশ্য; বস্তুসকলের সহজগ্রাহ্য রূপ,—তাহাদের সমষ্টিগত বিপুলতা অথবা শব্দায়মান গতিস্রোত; এবং মানবহৃদয়ের সহজ স্বাভাবিক অনুভূতি—ভয়, বিস্ময়, গর্ব্ব, দম্ভ, রাগ-বিরাগ, ঘৃণা ও কারুণ্য—এই সকলকে যথাযথ বাণীরূপ দিবার পক্ষে, বাক্যযোজনা ও ছন্দসঙ্গীত পরস্পর কিরূপ মিলিয়াছে, উদ্ধৃত কাব্যখণ্ডগুলি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। 'মেঘনাদবধ-কাব্য'-পাঠের এক অধ্যায় শেষ করিলাম; পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এ কাব্যের ভাষা, কল্পনাগৌরব ও কাব্য-নির্ম্মাণকৌশল সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পঞ্চম অধ্যায়

কল্পনা ও কবি-মানস ; রাবণ-চরিত্রই কাব্যের মূল-গ্রন্থি , সেই চরিত্রই কবির মানব-জীবনাদর্শের প্রতীক , তাঁহার বাঙালী-প্রাণ , কাব্যে এই অবাধ ও অকপট আত্মস্ফূর্ত্তির জন্যই এই কাব্য কবির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ; রাবণ-চরিত্র, তুলনায় রাম ও বিভীষণ।

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ছন্দ-নিহিত যে কবিত্ব, তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। সে প্রসঙ্গে বলিয়াছি, এই ছন্দ শুধুই কবিত্বের অঙ্গ নয়—কল্পনারই একটা রূপ ; ঐ ছন্দ কেবল শিল্পসৃষ্টিই নয়, কাব্যসৃষ্টির মতই একটা সৃষ্টি—কবির কাব্যসৃষ্টির যে প্রতিভা, তাহাই এই ছন্দকেও সৃষ্টি করিয়াছে। এই ছন্দই সর্গের পর সর্গে যে ভাবে যে গতিতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে যেন কাব্যের ভাব ও ঘটনাবস্তু আকার ও আয়তন লাভ করিয়াছে। এক্ষণে 'মেঘনাদ-বধ-কাব্যে'র কল্পনা ও কবিশক্তির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এ কাব্যের মূল প্রেরণা কি, সে কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই প্রেরণা হইতে যে কল্পনার উদ্ভব হইয়াছে—যে কবিস্বপ্ন কাব্যের আকারে প্রকাশ পাইয়াছে—এইবার তাহারই পরিচয় করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ একবার প্রসঙ্গক্রমে—সেই একটিবার মাত্র এ কাব্যের কবিকল্পনার অভিনবত্ব স্বীকার করিয়া—যাহা বলিয়াছিলেন, প্রথমে তাহাই উদ্ধৃত করিব ; সে কথাগুলি এই—

> মেঘনাদবধ-কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই।···তিনি [মধুসূদন] স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন।···এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য্য ; ইহার হর্ম্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে ; ইহার রথ-রথি-অশ্বে-গজে পৃথিবী কম্পমান , যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে।···যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না—কবি সেই ধর্ম্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্দ্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

এ কাব্যের মূল প্রেরণা ছিল ইহাই—রাম লক্ষ্মণ অপেক্ষা রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতি পক্ষপাত এই কারণেই ঘটিয়াছে। কিন্তু কাব্যসৃষ্টির কল্পনামুখে এই প্রেরণা দ্বিধাযুক্ত হইয়াছে, কবির আত্ম-ভাব সৃষ্টির রস-প্রেরণায় রূপান্তরিত হইয়াছে। কবি যখন প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত মানব-পুত্তলের অবস্থা ও পরিণাম চিত্রিত করিতে খাঁটি

সৃষ্টি-কল্পনার বশীভূত হইলেন, বস্তুনিরপেক্ষ ভাবগীতিময় কাব্য নয়—মানুষেরই কাহিনী-রচনায় অগ্রসর হইলেন, তখন সেই শক্তির দম্ভ ও মহিমার প্রতি তাঁহার যতই আন্তরিক আনুগত্য থাকুক, অপর এক বিরুদ্ধ শক্তির অমোঘ শাসনে সেই মহিমার মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে ম্লান ও নিস্তেজ হইয়া গেল—সেই দুর্ব্বার স্বতঃস্ফূর্ত্ত কামনা-শক্তির জয়গান করিতে গিয়া, কবি তাহার নিষ্ফল পরিণামকেই প্রত্যক্ষ করিলেন। একদিকে আত্মস্ফূর্ত্তির দুর্জ্জয় কামনা, অপর দিকে আত্মক্ষয়কারী স্নেহ-প্রীতির পারবশ্য—মানুষের প্রকৃতিগত এই দ্বন্দ্ব ও দুরবস্থার নামই মনুষ্যত্ব। কবি-মানুষের প্রাণে স্বাধীনতার আবেগ যতই প্রবল হউক, যখন সেই আবেগ সৃষ্টি-কল্পনার অধীন হয়, তখন তাহাকে এই নিয়তির অনুবর্ত্তন করিতে হয়; মানুষের মূর্ত্তি মৃত্তিকার দ্বারাই গড়িতে হয়। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কবিকেও তাহা করিতে হইয়াছে; মানুষের সুরাসুরবিদ্রোহী বাসনাকে মহাকাব্যের ছন্দে বাঁধিতে গিয়া নিয়তির নিদারুণ পরিহাসকেই চূড়ান্ত করিয়া তুলিতে হইয়াছে। অতএব কাব্যের বহিরঙ্গে যাহাই থাকুক, একটু ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে, এই অটল শক্তির দম্ভকেই কবি আরতি করিতে পারেন নাই; বরং তাহার অন্তরালে, তাহার সেই পরাজয়ের মধ্যেই, মানবতার যে নিয়তি রহিয়াছে, তাহার মহিমাকেই কবি অন্তরের সহিত বরণ করিয়াছেন। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ছন্দ যে আবেগ হইতে জন্মিয়াছে—সেই ছন্দ, সেই আবেগ কবির কল্পনাসহযোগে যখন মানুষের জীবন-লীলার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল তখন সে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে ছুটাছুটি করিয়াও মানুষের জন্য এমন কোন উত্তুঙ্গ প্রতিষ্ঠা-শিখর আবিষ্কার করিতে পারিল না, যেখান হইতে তাহার সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত দুর্ব্বার কামনা প্রপাতের রূপ ধরিয়া এক নূতন গঙ্গোত্তরীর সৃষ্টি করিতে পারে। মানুষের যে মহিমা-গান তিনি করিলেন তাহা বীররসের নয়, কারুণ্যের; প্রবৃত্তির নাগপাশ ও দৈবশক্তির ষড়যন্ত্রে, মানুষের ঐশ্বর্য্য ও বলবীর্য্যের যে পরাজয়—আত্মবিশ্বাসী, অপ্রতিহত-শক্তি, দিগ্বিজয়ী বীরের নিয়তি-নিহত মূর্ত্তির যে আরক্তিম দীপ্তি—মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাগরোর্ম্মিদল মানব-জীবনের অন্ধকারময় সৈকতে আছাড়িয়া পড়িয়া তাহারই নৈশ-সঙ্গীতে উদ্বেলিত হইয়াছে।

এই জীবনের প্রতীক হইল রাবণ। কবি কাব্যরচনার যত-কিছু সরঞ্জাম সকলই ঠিক করিয়া—নানা রসের আয়োজন, এবং দেশী ও বিদেশী কাব্যশাস্ত্রের অনুশাসন যতদূর সম্ভব পালন করিয়া, তাঁহার কাব্যকল্পনায় এই একটি মনোগত ভাবের দ্বারা অবশে পরিচালিত হইয়াছেন; মানব-জীবনের সেই দুর্ব্বোধ্য নিয়তি এ কাব্যের

সকল কবিত্ব, ঘটনাকাহিনী ও ঐশ্বর্য্যবর্ণনার অন্তরালে একটি বিরাট শূন্য গহ্বরের মত মুখব্যাদান করিয়া আছে। কাব্যের পটভূমিতে যে নদী-নির্ঝর-অরণ্য-উপবন-শোভিত গিরিভূমি দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহাতে প্রকৃতির যে রক্ত-শ্যামল-হরিৎ-পাটল বর্ণচ্ছটা বিলসিত হয়, তাহা যে উদ্ধত উন্নত পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া তাহারই শোভা ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে—সেই গিরিশিখররূপী রাবণ আপনার অভ্যন্তরে সর্ব্বনাশের অগ্নি বহন করিতেছে; যাহার শৌর্য্যবীর্য্য এবং মানবসুলভ নানা গুণে ঐ সুখৈশ্বর্য্যের অমরাপুরী গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই পাপে সে সকল ধ্বংস হইবে। 'মেঘনাদবধে'র রাবণ দুরাচারী দুর্ম্মদ রাক্ষস মাত্র নহে; কবি তাহার চরিত্রকে সর্ব্ববিধ মর্য্যাদায় মণ্ডিত করিয়াছেন—রাজা, পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, যোদ্ধা ও সরল-স্বভাব ভক্ত রূপে তিনি তাহার যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার কোথাও নীচতা বা কপটতা নাই। সমগ্র রাক্ষস-পরিবার (এক বিভীষণ ছাড়া) তাহার অনুরক্ত ও বশীভূত। কিন্তু সেই রাবণ পাপ করিয়াছে, ধর্ম্মে ও সমাজে সে পতিত; ন্যায় ও নীতির বিচারে, কর্ম্মফলের অমোঘ নিয়মে, তাহাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কবি সে পাপকে মানিয়াছেন, পাপের শাস্তিকেও স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু সে পাপের দায়িত্ব কাহার, সে বিষয়ে একটি প্রকাণ্ড প্রশ্ন যেন রাবণের কাহিনীতে ইঙ্গিতরূপে উদ্যত রাখিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, রাবণের এই অধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে ধর্ম্মভীরু মানুষ ও দেবতার দলকে প্রতিপক্ষরূপে খাড়া করিয়াছেন, তাহাদের সেই ধর্ম্মাচরণের মূলে চিত্তের দৈন্য, স্বার্থপরতা অথবা কাপুরুষতাকে প্রচ্ছন্ন পরিহাসে ধিক্কৃত করিয়াছেন। রাবণ যে পাপ করিয়াছে, তাহা যেন এমন ধর্ম্মাচরণের চেয়ে শতগুণে শ্রেয়ঃ। যে-পুরুষ প্রাণবান ও শক্তিমান, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তিমত্তায় সে কোন বাধা মানে না; সেই প্রবল প্রবাহবেগে সে কোথাও গড়ে, কোথাও ভাঙে—কোন হিসাব-জ্ঞান তাহার থাকে না; সকল বাধাকে উন্মূলিত করিয়া নিজশক্তির অপ্রমেয়তা আস্বাদন করিয়া সে চরিতার্থ হইতে চায়। ইহা যদি পাপ হয়, তবে তাহার জন্য সৃষ্টির নিয়মই দায়ী; ইহার পরিণাম যদি ভয়াবহ হয়, তবে সৃষ্টিই আত্মদ্রোহী। এ রহস্য দুরবগাহ; কোন ধর্ম্মনীতির উদ্ভাবনায় এ প্রশ্নের সমাধান বা নিরসন হয় না। তাই কবি তাঁহার কাব্যের প্রতি রন্ধ্রে, এক দুর্ব্বোধ্য অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশে দীর্ঘশ্বাস ভরিয়া দিয়াছেন। প্রথমে তাহার কথাই বলিব।

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কাহিনী রাবণের প্রায়শ্চিত্তের কাহিনীই বটে।

তথাপি সে যে পাপ করিয়াছে, সে বোধ তাহার আছে বলিয়া মনে হয় না। স্বপ্নসঞ্চরণরোগী রাত্রিকালে যাহা করে, সকালে তাহা স্মরণ থাকে না। কাব্যের আরম্ভেই, রাবণের প্রথম পরিচয়ে, কবি যেন ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বীরবাহু মরিয়াছে তাহারই পাপে—এই কথা বলিয়া বীরবাহু-জননী রাবণ-মহিষী চিত্রাঙ্গদা শোকে-দুঃখে তাহাকে কঠিন ভর্ৎসনা করিয়া গেল—

> হায়, নাথ, নিজ কর্ম্মফলে
> মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।

—শুনিয়া রাবণ বিচলিত হয় মাত্র, পুত্রশোকের মধ্যে তাহার দারুণ অভিমান হয়, রোষে ক্ষোভে সে অধীর হইয়া উঠে। কাব্যের মধ্যে এই একবারমাত্র আমরা রাবণকে সাক্ষাৎভাবে অভিযুক্ত হইতে শুনি; কিন্তু কোথাও নিজ দুষ্কৃতির জন্য স্বগতভাবেও তাহাকে অনুশোচনা করিতে দেখি না। বরং, কবি তাহার মুখে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি কথা দিয়াছেন—সেকথা অর্থপূর্ণ, সে যেন কবির নিজেরই প্রাণগত আক্ষেপোক্তি। রাবণের কোন ভয় নাই, সংশয় নাই—স্বাভাবিক বাহুবল ও হৃদয়বলের দ্বারাই সে সুরক্ষিত; নিজশক্তির উপরে তাহার অটল বিশ্বাস। কিন্তু এতদিনে সেই বিশ্বাস যেন টলিয়াছে—কোন অদৃশ্য শক্তির মায়াবলে তাহার সেই শক্তি নিষ্ফল হইতেছে। এ যেন এক অপ্রাকৃতিক ব্যাপার—রাবণকে একেবারে বিমূঢ় করিয়া দেয়। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে বিস্ময়বিমূঢ় রাবণ বলিয়া উঠে—

> অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
> কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
> বধিল সম্মুখ-রণে? ফুলদল দিয়া
> কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

অন্যত্র সে পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বলিতেছে—

> হায়, বিধি বাম মম প্রতি,
> কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
> কে কবে শুনেছে লোক মরি পুনঃ বাঁচে?

বাহিরের যে দুর্জ্জেয় অদৃশ্য শক্তিকে রাবণ বারবার "বিধি" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে—সেই বিধির সহিত তাহার নিজ জীবনের, অর্থাৎ অন্তরের যোগ কোথায়, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি—সেকথা পরে বলিব। এই বিধি দেবতাদিগেরও মান্য, তাঁহারাও ইহার অন্যথাচরণ করিতে পারেন না। রাবণ যেমন তাহার

সর্ব্বনাশের জন্য এই বিধিকেই দায়ী করে, তেমনই কাব্যের নানাস্থানে অপর পাত্র-পাত্রীর মুখেও আমরা এই বিধির কথাই শুনি। সরমাও সীতাকে বলিতেছে—

বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা!

এই বিধির আর এক নাম—প্রাক্তন। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের পূর্ব্বকর্ম্ম-সমষ্টি নয়; এ প্রাক্তন সৃষ্টিগত—নিখিলের কর্ম্মধারায় ইহা অনুস্যূত; এই প্রাক্তনের ফলদাতাই বিধি। স্বয়ং মহাদেবকে বলিতে শুনি—

হায়, দেবি, দেবে কি মানবে
(কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?)

কিন্তু রাবণ এই প্রাক্তন সম্বন্ধেও অজ্ঞান; যদিও কপালে করাঘাত করিয়া সেও এমন কথা বলে—

কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?

তথাপি আসলে এই পাপের সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণাই নাই। কেবল যখনই তাহার শক্তির গতিরোধ হয়, কামনার পরাজয় ঘটে, তখনই সে যেন এক দুর্ব্বোধ্য দুর্নিবার শক্তির সম্মুখীন হইয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া থাকে। ইহাকেই সে "বিধি" নাম দিয়াছে। ইহা যেন সকল নিয়মের অতীত; ইহার নিকটে ভাল নাই, মন্দ নাই—শক্তি-অশক্তি, উচ্চ-নীচ সকলই সমান। তাহার মতে এই বিধিই সকল ব্যাপারের জন্য দায়ী—

শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।

তথাপি রাবণের ভয় নাই, বিস্ময়বিমূঢ়তাই আছে। যেন দেব-দৈত্য-নর প্রভৃতির মত—এই "বিধি"র সঙ্গে সাক্ষাৎ যুদ্ধ করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিলে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। কিন্তু তাহার উপায় নাই বলিয়াই সে বিকল হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদেও সে ভয় পায় নাই; তখনও তাহার মুখে সেই এক কথা—

জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশ-খ্যাতি সম? কিন্তু দেব-নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বাম মম প্রতি; তেঁই শুকাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে!

তখনও ভয় নয়, বরং বলিতে শুনি—

সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী ;
বৃথা যদি যত্ন আজি আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে ! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি !

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র মূল কাহিনীতে কবি রাবণের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে পাপ বা দুরাচারের উল্লেখ নাই ; রাবণের ব্যবহারে—আচারে ও কার্য্যে নায়কোচিত গুণের অসদ্ভাব কোথাও নাই। কেবল, "অশোক কানন" নামক সর্গে, সীতা-সরমা-সংবাদে, পূর্ব্বাপর ঘটনা বিবৃত করিবার প্রয়োজনে, মূল রামায়ণের অনুসরণ করিয়া কবিকে রাবণের দুষ্কৃতির উল্লেখ করিতে হইয়াছে। তথাপি সেই সীতাহরণ-কাহিনীর—রাবণের সর্ব্বাধিক পাপের—বিবৃতির মধ্যেও কবি রাবণ-চরিত্রের মূল তত্ত্বটি যেভাবে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট কবি-শক্তির নিদর্শন। রাবণ সীতাকে লইয়া পুষ্পকরথে আকাশে চলিয়াছে। পথে এক পর্ব্বতশৃঙ্গে জটায়ু তাহার গতিরোধ করিল। রাবণকে দেখিয়া—

'চিনি তোরে' কহিলা গম্ভীরে
বীরবর—'চোর তুই লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুলবধূ আজ হবিলি দুর্ম্মতি ?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ ? এই তোর নিত্য-কর্ম্ম জানি।
অস্ত্রিদল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে। আয় মূঢ়মতি !
ধিক্ তোরে, রক্ষোরাজ ! নির্লজ্জ পামর
আছে কিরে তোর সম এ ব্রহ্মমণ্ডলে ?'

এই গর্জ্জন শুনিয়া সীতা মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ; মূর্চ্ছান্তে দেখিলেন, তাঁহাকে ভূতলে রাখিয়া—

গগনমার্গে রথে রক্ষোরথী
যুঝিছে সে বীর সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে।

তারপর সীতার আবার মূর্চ্ছা হইল—মূর্চ্ছার মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে সীতা এবার যাহা দেখিলেন, সরমাকে তাহাই বলিতেছেন—

মিলি' আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে, ভূতলে, হায়, সে বীরকেশরী,
তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে !

কহিলা রাঘবরিপু,—'ইন্দীবর-আঁখি
উন্মীলি দেখলো চেয়ে, ইন্দুনিভাননে,
রাবণের পরাক্রম ! জগৎ বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজবলে !
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন,
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে ?'

এই কাহিনীটুকু হইতেই—এ কাব্যের বাহিরে, অর্থাৎ 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ট্র্যাজেডির পূর্ব্বে—আমরা রাবণের স্বরূপের পরিচয় পাই, এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারি, এ চরিত্রে পাপপুণ্যের ভাবনা, লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ কিছুই নাই। জটায়ু যে কারণে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, রাবণের নিকটে তাহা অর্থহীন ; তাহার সেই গালাগালি ও ধিক্কারে রাবণ ক্রোধ পর্য্যন্ত করে না—সে যেন মূর্খের প্রলাপোক্তি মাত্র। রাবণের পরাক্রমকে তুচ্ছ করিয়াছে, ইহাই জটায়ুর একমাত্র অপরাধ ; সেই স্পর্দ্ধার শাস্তি দিতে পারিয়াছে বলিয়া রাবণ উল্লসিত ; সুন্দরী রমণীর নিকটে সে আপন পৌরুষের প্রমাণ দিয়াই যেন সকল পাপ প্রক্ষালিত করিয়াছে। কিন্তু মুমূর্ষু প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিও তাহার অনুকম্পা হয়—সেটুকুও তাহার প্রকৃতিগত মনুষ্যত্ব, তাহাই তাহার মহত্ত্ব। সে "জগৎ-বিখ্যাত গরুড়-নন্দন"কে জানে, তাহার বীরত্বের প্রশংসা করে ; কিন্তু সে তাহার ধর্ম্মজ্ঞানের প্রশংসা করে না, কারণ তাহার মর্ম্ম সে বোঝে না। সেই জটায়ুকে এমনভাবে মরিতে দেখিয়া, সে নিজ জয়গৌরবের মধ্যেও একটু দুঃখ অনুভব করে,—জটায়ুর সেই ঘৃণা ও কটূক্তি আর মনে থাকে না, তাহাকে মারিয়া ফেলার জন্য যেন একটু অনুতাপ হয়, তাই যেন নিজেকেই বুঝাইবার জন্য বলিয়া উঠে—

নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন,
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে ?

ইহাই রাবণ-চরিত্রের একটি প্রধান দিক। রাবণ কেবল নিজেকেই জানে, আর কাহাকেও জানে না ; সে নিজেই নিজের ধর্ম্ম, আর কোন ধর্ম্ম মানে না। সে যেন বলে—আমি আমিই ; আমার শক্তিতে আমি যাহা করি, তাহার বিরুদ্ধেও শক্তিকেই মানি, আর কিছুকে নয়। পরের মধ্যেও আমি শক্তিকেই বিশ্বাস করি ; দেব, দৈত্য, নর, যেই হউক, এই শক্তি ভিন্ন আর কিছু দ্বারা আমাকে কেহ দণ্ডিত করিতে পারিবে না। কিন্তু এক্ষণে রাবণের এ ভুল ভাঙিতে

আরম্ভ হইয়াছে—মানুষ যত বড় শক্তিমান হউক, নিয়তির হাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই ; সে-নিয়তি তাহার নিজের মধ্যেই লুক্কায়িত হইয়া অবস্থান করিতেছে, তাই সে পরাজয় এত মর্ম্মভেদী।

এই শক্তির মহিমায় কবিহৃদয় যে আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই, তেমনই, মানুষের যে দুর্ব্বলতা তাহার মনুষ্যত্বের নিদান তাহাও তাঁহাকে সমধিক ব্যাকুল করিয়াছে ; এমন কি, ইহাই যেন এ কাব্যের মূল গীতিসুর। লঙ্কার ঐশ্বর্য্য, রাবণের রাজসম্পদ এখনও অটুট আছে—সে মহিমার বর্ণনায় কবির কোথাও কার্পণ্য নাই, সে বর্ণনার বর্ণবাহুল্য শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের চিত্তে অম্লান হইয়া থাকে। রাবণের শাস্তি অন্যরূপ, ক্রমাগত তাহার কুলক্ষয় হইতেছে—এবং তাহাতে বলক্ষয় অপেক্ষা তাহার অন্তরের আশ্রয়স্থলই ধসিয়া যাইতেছে। স্বর্ণ-লঙ্কার ঐশ্বর্য্য যেমন রাবণেরই এক রূপ, তেমনই সেই পুরীর অভ্যন্তরে জ্ঞাতি, বন্ধু, পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূর যে সংসার, তাহাও রাবণের জীবন-বৃক্ষে পুষ্পমঞ্জরীর মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ কাব্যে রাবণের ঐশ্বর্য্যের অভ্রভেদী চূড়া নয়—তাহার অন্তরের সেই লতাপুষ্পের কুঞ্জবিতান ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। রাবণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে যাতনা ভোগ করিতেছে, সে অনুশোচনার জ্বালা নয়, পরাজয়-জ্বালাও নয়—আত্মীয়-বিয়োগের জ্বালা। রাক্ষসপুরীর অধীশ্বর গোষ্ঠীপতি রাবণ সর্ব্বপরিজনহীন নিঃসঙ্গতার ভয়াবহ অবস্থা কল্পনা করিয়া নিরতিশয় মুহ্যমান হইয়াছে।—

> কুসুমদামসজ্জিত দীপাবলী-তেজে
> উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
> এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
> শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি ;
> নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী,
> তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
> কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?

—কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণের এই যে হাহাকার—ইহাই চরম হইয়া উঠিয়াছে শেষ সর্গে ; সেখানে কবি, সিন্ধুকূলের শ্মশানে, রাবণের অন্তর-পুরীর অসীম রিক্ততাকে—তাহার হৃদয়ের শ্মশানকেই—উন্মুক্ত করিয়া, সেই জীবননাট্যের যবনিকাপাত করিয়াছেন। সেই মহাশ্মশানে—

> বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুল-রাজা
> রাবণ, বিশদ বস্ত্র বিশদ উত্তরী,

ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে ,—
চারিদিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ—আবালবনিতা-
বৃদ্ধ—শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে।
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে।

তারপর যখন পুত্র-পুত্রবধূর চিতা জ্বলিয়া উঠিল, তখন—

অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ,—
"ছিল আশা মেঘনাদ মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ,
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।...
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনা ছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র, পুত্রবধূ আমার?' শুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী, 'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে রক্ষঃকুলপতি?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে, হায় রে কি কয়ে?

এই শ্মশানদৃশ্যই এ কাব্যের যথার্থ পরিণাম ও সমাপ্তি ; ইহারই জন্য মেঘনাদবধের আয়োজন ও মেঘনাদবধ। এই পরিণামকেই লক্ষ্য করিয়া কবির কল্পনা নয়টি সর্গের নানা বেশভূষায় শোভাযাত্রা করিয়াছে।

অতএব রাবণের পরাজয় বাহিরে নয়, ভিতরে। তাহার বলবীর্য্য ঐশ্বর্য্যের পরিণাম যতই শোকাবহ হউক, তাহা অপেক্ষাও ঘোরতর দুর্ঘটনা ঘটিতেছে তাহার হৃদয়-রাজ্যে। তাই এ কাব্যে যুদ্ধের এত আয়োজন সত্ত্বেও যুদ্ধ নাই ; কেবল একটি মাত্র সর্গে যুদ্ধবর্ণনা আছে। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য রাবণই সেই একবার যুদ্ধ করিয়াছে। মেঘনাদও যুদ্ধ করিতে পারে নাই। "অলজ্ঘ্য

সাগরসম রাঘবীয় চমূ” লঙ্কার পুর-প্রাচীরের বাহিরে—এ কাব্যের নিতান্ত বহিরঙ্গরূপেই বিরাজ করিতেছে; কাব্যের যত কিছু মর্ম্মস্পন্দন, রাবণের সংসারে তাহারই প্রিয়-পরিজনের মধ্যে ঘটিতেছে; সে সকল ঘটনা রাক্ষসরাজের রাজকীয় মহিমা নয়, তাহার পারিবারিক জীবনের সৌভাগ্য সূচনা করে। এত বড় বিপদের কালে, ভ্রাতা বিভীষণ ছাড়া তাহার আর কোন গৃহশত্রু নাই, এবং বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদা ছাড়া আর কেহ তাহাকে পাপের জন্য ভর্ৎসনা করে না। ভক্ত ভৃত্য, পতি-কুল-গরবিনী মূর্ত্তিমতী জয়শ্রীর মত পুত্রবধূ, ভক্তিমান বীর্য্যবান আদর্শ পুত্র, এবং সমদুঃখভাগিনী সাধ্বী পত্নী—এই সকলকে লইয়াই রাবণ; ইহারাই তাহার জীবন-মুকুটের রশ্মিচ্ছটা; ইহাদের যত কিছু দীপ্তি, তাহা রাবণকেই দীপ্তিমান করিয়াছে। রাজসভায় বন্দীদল মাঝে মাঝে এই সৌভাগ্যের গাথাই গান করিতেছে, কখনও লঙ্কাপুরীর বন্দনা করিয়া গাহিতেছে—

> গুণীগণ-শ্রেষ্ঠ গুণী বীরেন্দ্রকেশরী
> কামিনীবল্লভরূপে দেখ মেঘনাদে!
> ধন্য রাণী মন্দোদরী, ধন্য রক্ষঃপতি
> নৈকষেয়। ধন্য লঙ্কা বীরধাত্রী তুমি!

কোথাও বা মেঘনাদের উদ্দেশে বলিতেছে—

> তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে?
> কার বা এ হেন মাতা?

আবার রাণী মন্দোদরীর বন্দনা করিয়া গাহিতেছে—

> হে কৃত্তিকে হৈমবতি! শক্তিধর তব
> কার্ত্তিকেয়—আসি দেখ তোমার দুয়ারে,
> সঙ্গে সেনা সুলোচনা। দেখ আসি সুখে,
> রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ, পুত্র, যাঁর রূপে
> শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে! ভাগ্যবতী তুমি!
> ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিত বলী—
> ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী!

এই যে সংসার, ইহাও রাবণের; রাবণকেই মধ্যস্থলে রাখিয়া কবি এই যে গ্রহমণ্ডল রচনা করিয়াছেন, ইহারই আলোকে, রাবণের ভাগ্য, ও তথা 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কাব্যপ্রেরণা বুঝিয়া লইতে হইবে। এই জীবনের ট্র্যাজেডিই 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ট্র্যাজেডি। বাহিরের দিক দিয়া দেখিলে সে ট্র্যাজেডি অন্যরূপ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতেই হার

মানিতে চাহিতেছে না—কবি সেই ধর্ম্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন”।

এক দিকে কল্পনার এই মূল প্রবৃত্তি অপর দিকে একটি বিশেষ আদর্শ অনুযায়ী কাব্যনির্ম্মাণ—ও তাহার প্রসাধনে কবি-মানসের বিলাসকলাকুতূহল; শুধু তাহাই নয়, বাংলা কাব্যে নবজীবনসঞ্চারের আশা, যথা—

তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিতে পান সুধা নিরবধি।

কিম্বা—

গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফু ল—ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা;

ইহার ফলে কবিচিত্ত, শুধু কাব্যসৃষ্টি নয়—কাব্যের ভূষণ-প্রসাধনের মোহে বার বার বিচলিত হইয়াছে, উপলক্ষ্য অনেক স্থলে লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তাই যে ভাবপ্রতিমা এ কাব্যের আরাধ্য ইষ্টদেবতা—কাব্য-কলা-উৎসবের সাড়ম্বর শোভা-যাত্রায়, সেই প্রতিমা কখন কখন উহ্য হইয়া গেছে। কিন্তু তথাপি রাবণ-চরিত্র ও রাবণ-ভাগ্যই সেই অতি স্থূল কাব্য-কুসুমমাল্যের অন্তরালে তাহার ডোররূপে অবিচ্ছিন্ন হইয়া আছে।

এ কাব্যের আর সকল চরিত্র সর্ব্বজনগ্রাহ্য সুপরিচিত আদর্শের ছাঁচে ঢালা—কবি এ সকল চরিত্রের কিছু বৈচিত্র্য ও উজ্জ্বলতা বিধান করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু রাবণ এ সকল হইতে স্বতন্ত্র, এ চরিত্র সাধারণ সংস্কারের বিরোধী। প্রথমতঃ, অংশতঃ রামায়ণের সেই রাবণ হইয়াও সে অনেকাংশে তাহার বিপরীত; দ্বিতীয়তঃ কবি তাহার অমিত ঐশ্বর্য্য ও অসীম পরাক্রম ঘোষণা করিয়াও তাহার দুর্ব্বল অবসন্ন শোককাতর মূর্ত্তিই আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। তবে কি পাপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের শোচনীয় পরিণাম, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানহীন দেবদ্রোহী বলদৃপ্ত অহঙ্কারের অনিবার্য্য শাস্তিভোগ—এই লৌকিক নীতির সমর্থনই এ কাব্যের অভিপ্রায়? তাহা যে নয়, সে বিষয়ে পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি; সমগ্র কাব্যখানিই তাহা প্রমাণ করিতেছে। রাবণেরও একটা ধর্ম্ম আছে, কেবল সে-ধর্ম্ম রামের ধর্ম্ম হইতে পৃথক। রাবণেরও ইষ্টদেবতা আছে, সে রামের চেয়ে বড় ভক্ত। সে নিজে যেমন সরল—অবোধ ও

অবাধ প্রাণশক্তির আধার, তাহার ইষ্টদেবতা মহাদেবও তেমনই আত্মভোলা, আশুতোষ—ক্রোধে রুদ্র, স্নেহে অন্ধ। সে সেই দেবতার নিকটে কোন গোপন সাহায্য বা ষড়যন্ত্রের আশ্বাসে নিজের ভয় ও দুর্ব্বলতা দমন করিতে চায় না; দারুণ দুর্য্যোগের দিনেও তাহার প্রতি রাবণের বিশ্বাস অটল। এ ভক্তি বীরের ভক্তি, ইহার মধ্যে দীনতা বা কাঙালপনা নাই।

(ধর্ম্মের চক্ষে রাবণ পাপী, এ কাব্যে আমরা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তই দেখি, পাপ দেখি না; কবি যেন পাপ হইতে মানুষকে পৃথক করিয়া লইয়াছেন—দুঃখের অনলমধ্যে, মানুষের প্রাণের আয়স-ধাতুকে প্রদীপ্ত লোহিত মূর্ত্তিতে প্রকটিত করিয়াছেন; তাহাতে পাপের সে কৃষ্ণ-বর্ণ আর নাই, কেবল হৃৎপিণ্ডের কোমল উজ্জ্বল রূপই উদ্ভাসিত হইয়াছে।) অপর পক্ষে, রাম-বিভীষণ প্রভৃতির সমাজে—এই পাপ-বোধ, ধর্ম্মভীরুতা, ও দেব-সেবার যে ভাব কবি, ঘটনায় ও চরিত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্থানে স্থানে স্পষ্ট অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে। লক্ষ্মণ যখন, দেবতাদের সাহায্যে, হীন তস্করের মত, ইন্দ্রজিৎকে গুপ্ত-হত্যা করিয়া সগর্ব্বে রামের শিবিরে ফিরিয়া আসিল, তখন—

চুম্বি শির, আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে;—
"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!
সুমিত্রা জননী ধন্য!......
এ যশঃ তব ঘুষিবে জগতে
চিরকাল! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম, নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব, সুফল ফলে দেবের প্রসাদে!"

রামের মুখে এই বাক্যগুলি দিয়া কবি দেববলে-বলী মানুষের সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব নিঃসংশয় করিয়া তুলিয়াছেন। এ কাব্যের দেবতাগুলির চরিত্রও কবির ঐ একই মনোভাবের পরিচয় দেয়। রাক্ষসপুরীর রাজলক্ষ্মী যিনি, তিনি দেবী বলিয়াই বিভীষণ অপেক্ষাও বিশ্বাসহন্ত্রী ও হৃদয়হীন। অন্যান্য দেবদেবীরাও মানুষ অপেক্ষা ধর্ম্মহীন, যেমন ভয়বিহ্বল, তেমনই স্বার্থপর। হোমারের দেবদেবীরা, ঈর্ষা, আত্মাভিমান, দুর্নীতি ও মিথ্যাচার বিষয়ে ইহাদের অপেক্ষা হীন না হইলেও, তাহারা খুশি ও খেয়ালের শক্তিতে মানব-ভাগ্যের যতটা নিয়ামক, ইহারা তাহাও নয়; ইহারা অতিশয় ক্ষুদ্র ও হীনবীর্য্য, রাবণের মত পুরুষের ভয় বা ভক্তির সম্পূর্ণ

অযোগ্য। এ কাব্যে প্রধান ধার্ম্মিক চরিত্র দুইটি—রাম ও বিভীষণ; রাম ও বিভীষণ উভয়ই নিষ্পাপ। কিন্তু পৌরুষ ও সহজ মানবধর্ম্মের দিক দিয়া উভয়ই, রাবণ ও ইন্দ্রজিতের তুলনায় হীনরূপে চিত্রিত হইয়াছে। রাম ধার্ম্মিক হইলেও দুর্ব্বল, বিভীষণ ন্যায়নিষ্ঠ হইলেও মনুষ্যত্বহীন, তাহার আত্মীয়বাৎসল্য নাই, সে ধার্ম্মিকতার অভিমানে মানুষের সহজ ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়াছে। রাম-রাবণের যুদ্ধে তাহার যে অবস্থা, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে ভীষ্মেরও সেই অবস্থা; কিন্তু উভয়ের ধার্ম্মিকতায় কি প্রভেদ! ধর্ম্মহীন যে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্বহীন যে ধর্ম্ম—কবি এই উভয়ের মধ্যে একটি স্পষ্ট ভেদ-রেখা টানিয়াছেন, এবং মনুষ্যত্বকে, এমন কি, নীতি-জ্ঞানহীন সহজ মানব-ধর্ম্মকে আর সকল ধর্ম্মের উপরে স্থান দিয়াছেন। যে মানুষ সহজ মনুষ্যধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার ন্যায়নিষ্ঠাও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি নয়। এই মনুষ্যত্ববোধই শ্রেষ্ঠ আত্মমর্য্যাদাবোধ—ভীষ্মের তাহা ছিল বলিয়াই, তাঁহার ধার্ম্মিকতা এত বড়। বিভীষণের ধার্ম্মিকতা যে খাঁটি নয়, কবি তাহার নিজের কথাতেই তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। সে স্বপ্নে শুনিয়াছে, রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী তাহাকে বলিতেছেন—

> হায়! মত্ত মদে
> ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে
> কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
> আমি?···
> কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
> সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর; পাইবি
> শূন্য রাজসিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
> তুই! রক্ষঃকুল-নাথ-পদে আমি তোরে
> করি অভিষেক আজি, বিধির বিধানে···
> রে ভাবি কর্ব্বুররাজ!

এ যেন ম্যাকবেথের কানে ডাইনীদের পাপ-মন্ত্র! আবার যখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের অনুযোগের উত্তরে—

> মহামন্ত্রবলে যথা নম্রশির ফণী,
> মলিন-বদন লাজে, উত্তরিলা রথী
> রাবণ-অনুজ, লক্ষ্যি রাবণ-আত্মজে,—
> "নহি দোষী আমি, বৎস। বৃথা ভর্ৎস মোরে
> তুমি, নিজ কর্ম্মদোষে, হায় মজাইলা
> এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!

বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী , প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে।
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে ?"

—তখনও তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির কারণ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ক্ষোভে, ক্রোধে, লজ্জায় মেঘনাদ ইহার উত্তরে যাহা বলিল, তাহা যেন কবির নিজেরই কথা—

কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা।
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর ! কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা। হেন সহবাসে
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।

আবার যখন কোন দেবদূত রামকে উপদেশ দেয়—

শুন, রঘুমণি !
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা—দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি,
নিত্য সত্য-দেবী সেবা , চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র-আদি বলি যত—
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ। এ সার কথা কহিনু তোমারে।

—তখন তাহার মুখে এই হিতোপদেশ, এবং তাহাতে রামের বালকোচিত আত্ম-প্রসাদ ধর্ম্মকথাকেও কৌতুককর করিয়া তোলে। রামের ধর্ম্ম ও রাবণের অধর্ম্ম এই দুইয়ের মধ্যে কবি যে বৈষম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকেই তিনি যেন গৌণ করিয়া তুলিয়াছেন। এজন্য মনে হয়, মধুসূদনের কাব্যের আদি-প্রেরণা ছিল মিল্টনের মহাকাব্যের সেই অমর বাক্য—"To be weak is miserable doing or suffering" , কিন্তু, তাঁহার কল্পনা সে বাক্যের বশীভূত হয় নাই, তিনি সেই দম্ভকে রাবণের চরিত্রে জয়ী হইতে দেন নাই, এবং সেই বাক্যের মধ্যে যে হতাশ্বাস আছে, তাহাকেই তাঁহার কাব্যে সত্য করিয়া তুলিয়াছেন।

মধুসূদনের রাবণ মিল্‌টনের শয়তান নয়, শেক্‌স্পীয়ারের ম্যাক্‌বেথও নয়—গ্রীক কবির প্রোমিথিউস তো নয়ই। এ চরিত্র মধুসূদনের নিজ অন্তরের সৃষ্টি, এজন্য এই কাব্যই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি-কীর্ত্তি। এই কাব্যেই কবির যথার্থ আত্মস্ফূর্ত্তি ঘটিয়াছে; এবং আধুনিক কালের বাংলা কাব্যে সেই প্রথম একজন কবির জন্ম হইয়াছিল। মধুসূদন আর যাহা কিছু রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে—এমন কি সনেটগুলিতেও—তিনি ভাষা ও ছন্দের সহিত নানাবিধ কবি-ভাব বা 'কবিচিত্ত-ফুলবন-মধু'র যোগে বিচিত্র কাব্যরসসৃষ্টির সাধনা করিয়াছিলেন—নিজ কবিশক্তির পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একমাত্র 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'ই তিনি আপনার কবি-স্বপ্নের কাহিনী রচনা করিয়াছেন। এ কাব্যের কবি ইংরেজী-শিক্ষিত, য়ুরোপের মানবতা-মন্ত্রে দীক্ষিত উনবিংশ শতাব্দীর একজন বাঙালী। বাংলার জলবায়ু ও বাঙালী জাতির রক্তগত সংস্কারের প্রভাবে বাঙালীর জীবনে, প্রেম-স্নেহের যে অপূর্ব্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল—মানবতার যে একটি মধুর মোহময় আকুতি ও অনুভূতি একটি বিশেষ আদর্শকে জীবনে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল, এ কাব্যের প্রেরণায় তাহার প্রচুর প্রভাব আছে। যে ভোগ-স্পৃহা—প্রাণের অবাধ স্ফূর্ত্তির স্বপ্নময় আবেগ—পুরুষকারের অভাবে অতৃপ্তির দুঃখ ভোগ করে, সেই স্পৃহা ও তাহার দুঃখ বাঙালী-কবিকে, মহাকাব্যের কল্পনাতেও উৎকণ্ঠিত করিয়াছে। এই দুঃখকেই আর একরূপে, অতিসূক্ষ্ম মানস-বিরহের গীতমূর্চ্ছনায় অভিষিক্ত করিয়া একালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী-কবি আর এক সুরে গাহিয়াছেন—

> কে দিয়াছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
> কেন ঊর্দ্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ,
> কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?
> সশরীরে কোন্‌ নর গেছে সেইখানে,
> মানস-সরসীতীরে বিরহ-শয়ানে,
> রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে,
> জগতের নদী গিরি সকলের শেষে?

সেই দুঃখই মানুষের আদিম প্রকৃতির আদর্শস্বরূপ রাবণকে কেন্দ্র করিয়া এই কাব্যের রসসৃষ্টি করিয়াছে। রাবণের কামনা কোন সূক্ষ্ম আত্মসচেতন আধ্যাত্মিক অনুভূতি নয়, তাই রাবণের দেশ 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশ' নয়। তথাপি সে দেশ মানব-মানসের উত্তুঙ্গ বাসনা-শৈলে অবস্থিত, এবং মানুষ সেখানে সশরীরে বাস করে বলিয়াই পাপ, প্রাক্তন, কর্ম্মফল

প্রভৃতির বিধি-বিড়ম্বনায় সেখানে এমন বাস্তব সর্ব্বনাশের অগ্ন্যুৎপাত হয়; সে অভিশাপ কেবল অন্তরের ভাববিলাসের মধ্যেই নিঃশেষ হয় না।

কিন্তু রাবণের চরিত্র-সৃষ্টিতে, একত্র দুইটি ভিন্ন উপাদানের সদ্ভাব ঘটিয়াছে। এক দিকে, য়ুরোপীয় পুরুষকারের আদর্শ—প্রকৃতির সহিত সংগ্রামশীলতা, সর্ব্ববিধ নিয়তির উপরে ভ্রূক্ষেপহীন আত্মপ্রতিষ্ঠা; অপর দিকে, মানবতার আর এক আকুতি কবিকে তেমনই মুগ্ধ করিয়াছে। যে শক্তি কেবলমাত্র অহঙ্কার ও আত্মাভিমানের শক্তি, যাহা দুর্দ্দমনীয়তায় সর্ব্বদ্রোহী, এবং স্নেহ-প্রেমের বশ্যতাও স্বীকার করে না বলিয়া, পরাজয় সত্ত্বেও অপরাজেয়—সে-শক্তি বাঙালী-কবির বিস্ময় উদ্রেক করিলেও তাহাকে হৃদয়ে বরণ করা সম্ভব হয় নাই। তাই—'To be weak is miserable doing or suffering'—কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফল-ভোগ, দুই-ই শক্তির সহিত করিতে হইবে, অশক্তিই সকল দুঃখের নিদান—এই বাক্যের সত্যতা কবি যেমন স্বীকার করেন, তেমনই, দুঃখ যদি কোথাও, কোন কারণেই না থাকে, সেখানে মানুষ মানুষই নয়, অতএব তেমন চরিত্র কল্পনা করিতেও কবির বাধে। রাবণের চরিত্রে এমন বীরত্বের অবকাশও কবি রাখেন নাই; যাহা করিয়াছি তাহার জন্য শাস্তিভোগ করিতেও প্রস্তুত—রাবণের পক্ষে এমন মনোভাব অসম্ভব, কারণ তাহার কোন পাপ-বোধই নাই। কবির কল্পনা এমনই করিয়া, এক দিকে, সবল ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণধর্ম্মের—সেই আদিম পৌরুষের আদর্শ, এবং অপর দিকে, মানবজীবনের আর এক সম্পদ—যাহা আমাদের এই বাঙালীর সংসারে একটু বিশেষ সৌরভ ও শোভায় বিকশিত হইয়াছে—সেই স্নেহ-মমতার দুর্ব্বলতা, এই দুইকে রাবণের চরিত্রে মিলাইয়াছে। যাহার মমতা আছে, তাহার দুঃখ অনিবার্য্য—ইহা আমরা সকলেই জানি; একজন মহাজ্ঞানী বলিয়াছেন—"He who hath wife and children hath given hostages to fortune"—কিন্তু সে পুরুষ লঙ্কেশ্বর রাবণ হইলেও তাহার নিস্তার নাই। ইহার কারণ, কবি, যত বড় বীর হউক—মানুষের এই দুর্ব্বলতাকেই মানবতার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করেন; বিশেষতঃ, সে মানুষ যদি সহজ সুস্থ মানুষ হয়। মিল্‌টনের শয়তান মানুষ নয়, তাই তাহার আত্মাভিমানের দম্ভ এমন নভঃস্পর্শী হইয়াছে; ম্যাক্‌বেথ পাপের আগুনে নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া জীবনের ভস্মরাশির অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়াছে—চরম নৈরাশ্যের যে পরম আশ্বাস তাহার বলে মহাবিনাশের নিয়তিকে তুচ্ছ করিয়াছে। রাবণ-চরিত্রে

তাহারও অবকাশ নাই, কারণ রাবণ এপিক-কল্পনার আদিম সুস্থ মানুষ; তাহার বাসনায় ব্যাধি নাই, সে ম্যাক্‌বেথের মত আত্ম-সচেতন নয়। স্নেহমমতার এই মজ্জাগত দুর্ব্বলতাই 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র রাবণকে বিড়ম্বিত করিয়াছে; বাহিরের বিধির শক্তি যেমনই হউক, রাবণকে কাতর করিয়াছে এই অন্তরের বিধি—ইহাই তাহার অদৃষ্ট।

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কল্পনা-মূলে যে মানবতার আবেগ আছে, এইরূপ মমতার মোহই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া, এ কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়াছে—রাবণের সর্ব্বশেষ বিয়োগ-ব্যথার ঘটনা—পুত্র ইন্দ্রজিতের মৃত্যু। মানুষের পক্ষে এত বড় শোক আর নাই। এক পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু হইতেই কাব্য আরম্ভ হইয়াছে, আমরা প্রথম সর্গেই রাবণের মুখে শুনি—

> এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে!
> শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
> দিবানিশি!

রাবণের এই শোক-জর্জ্জরিত মূর্ত্তিই সর্ব্বক্ষণ আমাদের সমক্ষে বিরাজ করে। পরে, মেঘনাদের মত পুত্রের মৃত্যুতে পিতা রাবণের কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া স্বয়ং ধূর্জ্জটি কৈলাসে হৈমবতীকে বলিতেছেন—

> এই যে ত্রিশূল, সতি! হেরিছ এ করে,
> ইহার আঘাত হ'তে গুরুতর বাজে
> পুত্রশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
> সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে!

এইজন্যই রাবণ এ কাব্যের নায়ক। অতএব রাবণের চরিত্র রীতিমত বীরচরিত্র হইল না কেন, 'মেঘনাদবধ-কাব্য' শাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য হইতে পারে নাই, বলিয়া অভিযোগ করিলে, সমগ্র কাব্যখানিকেই অস্বীকার করিতে হয়। এ সকল অভিযোগের উত্তরে কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, এ কাব্যে কবির নিজস্ব একটা কবি-ভাব বা কবি-স্বপ্ন ছিল বলিয়াই, ইহা হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র মত জোর করিয়া মহাকাব্য হইবার চেষ্টা করে নাই; ইহা সত্যকার কাব্য হইয়াছে, ফরমায়েসী মহাকাব্য হয় নাই। খাঁটি মহাকাব্য হইতে পারিলে আমরা অবশ্যই খুশি হইতাম, কারণ বাংলায় একখানিও খাঁটি মহাকাব্য নাই; কিন্তু বাঙালীর ধাতুতে তাহা যে হইবার নয়, 'বৃত্রসংহার' তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। বীরত্বের যে আদর্শ, বীররসের যে ছড়াছড়ি আমরা 'বৃত্রসংহারে' দেখিতে পাই,

তাহাতে, সে-রসে বাঙালীর লোভ না হওয়াই ভাল। রাবণের ন্যায় চরিত্র ও তাহার সেই ভাগ্য সুগোচর করিবার জন্য যে-কল্পনা, রুদ্রপীড়ের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রজিৎ, ঐন্দ্রিলার পরিবর্ত্তে মন্দোদরী, এবং ইন্দুবালার পরিবর্ত্তে প্রমীলা বা সীতার মত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার কবিশক্তি যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ কি? সে কল্পনা যে কেমন, আশা করি এতক্ষণে তাহার একটা আভাসও দিতে পারিয়াছি।

এই রাবণকেই কেন্দ্র করিয়া সমগ্র কাব্যখানি যে গড়িয়া উঠিয়াছে, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রাবণের যে হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের কথা এক্ষণে বলিতেছিলাম, তাহারই সমর্থনে কবি তাহার সংসারে ভক্তি, প্রীতি, প্রেম ও স্নেহের বন্যা বহাইয়াছেন—সেই স্নেহ-প্রেমের নির্ঝরসলিলে রাবণ যেন শুচি-স্নান করিয়াছে। প্রমীলা ও মেঘনাদের যে দাম্পত্য প্রেম, তাহাও যে-রাবণের ঘরে শোভা পায়, সে-রাবণের সংসার যে কতবড় সুখের সংসার তাহাও আমরা কল্পনা করিতে পারি। রাবণের ভাগ্যবিড়ম্বনা যে কত বড়, তাহাও এই সকল চিত্র ও চরিত্রের সাহায্যে কবি আমাদের মানসে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিয়াছেন। কিন্তু এই দৌর্ব্বল্যের যে আর একদিক সেই একই কল্পনায় নিরন্তর উঁকি দিয়াছে—পৌরুষের বিঘ্ন নয়, পৌরুষের বিপরীত রূপে সেই দুর্ব্বলতার লজ্জাও যে কবি অনুভব করিয়াছেন, তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত এই কাব্যে আছে। এক দিকে রাবণ যেমন সরস সতেজ-বৃন্ত কুসুম হইয়াও এই হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের তাপে শুকাইয়া যাইতেছে, তেমনই, অপরদিকে, ইহাই নিছক দুর্ব্বলতার রূপে রামের চরিত্রকে কীটদষ্ট প্রসূনের মত শীর্ণ ও সঙ্কুচিত করিয়াছে। এ দুর্ব্বলতার চিত্র—রাবণেরই বিপরীত দিক; 'মেঘনাদবধ-কাব্য' পাঠকালে পাঠক যাহাতে ইহা সহজেই অনুভব করে, কবি সে বিষয়ে অনুষ্ঠানের ত্রুটি করেন নাই; শুধু কাহিনীর প্রয়োজনেই নয়, রাবণের চরিত্রকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই, অন্যান্য সকল উপকরণের মত, রামের চরিত্রও কল্পিত হইয়াছে। (রামের ভ্রাতৃস্নেহের আতিশয্য রামকেই শোভা পায়; এতখানি হৃদয়-দৌর্ব্বল্য রাবণের চরিত্রে অসম্ভব। এই দুর্ব্বলতার চিত্র আঁকিতে গিয়া কবির বাঙালী-প্রাণ স্থানে স্থানে আত্মসম্বরণ করিতে পারে নাই—রামের কাহিনীতে এ কাব্যের সেই সকল অংশই সর্ব্বাপেক্ষা কবিত্বময়, কবির হৃদয় যেন কারুণ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। যথা—(বিভীষণের প্রতি রাম)—

হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে

নির্দ্দয় ; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্য-রক্ষাহেতু ; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম বশে।
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা ; উচ্চ অবরোধে
কাঁদিলা উর্ম্মিলা বধূ ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব ?
না মানিল অনুরোধ , আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।

আবার, শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পাশে মূর্চ্ছিত হইয়া, অবশেষে—

চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে
লক্ষ্মণ, কুটিরদ্বারে, আইলে যামিনী
ধনুঃ করে হে সুধন্বি ! জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি , আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি
বিপদ-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু ! লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ?

—এমন কান্না রাবণ কখনও কাঁদিতে পারে না। শোক যতই হউক, রাবণ কখনও এত নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে না যে, তাহার মুখে এমন কথাও বাহির হইবে—

কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে ,
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।

ইহার পরের কথাগুলি অবশ্য রাবণের মুখেও শোভা পাইত, এ কবিত্বের সুযোগ কবি কোথাও ত্যাগ করেন নাই। যথা—

তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, শুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর ?' কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে ?

এ বস্তু কবির পক্ষে কাব্যরসসৃষ্টির সহায় হইলেও, ইহার নগ্ন দীন মূর্ত্তি তাঁহাকে সমধিক বিতৃষ্ণ করিয়াছে—রামের কাপুরুষতার চিত্র আঁকিতে কবিও বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে একরূপ বিনা যুদ্ধে বিনা ক্লেশে হত্যা করিবার সকল সুবিধা লাভ করিয়াছে—একালের রাজা-জমিদারেরা যেমন, অনেক ক্ষেত্রে, সর্ব্বপ্রকারে সুরক্ষিত হইয়া হস্তী-ব্যাঘ্র শিকারের আমোদ উপভোগ করিতে যান—লক্ষ্মণ তাহা অপেক্ষাও নির্ব্বিঘ্ন হইয়া মেঘনাদবধ করিতে চলিয়াছে; তথাপি রামের ভয় আর ঘোচে না, নারী অপেক্ষাও ভয়ভূতগ্রস্ত হইয়া রাম বলিতে থাকে—

হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্ত-দূতে দূরে হেরি উর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে; দেব নর ভস্ম যার বিষে—
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প-বিবরে
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে···
···কে আর আছে রে
আমার সংসারে ভাই, যার মুখ দেখি,
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে?
চল ফিরি পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ! কুক্ষণে ভুলি আশার ছলনে
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আসিনু আমরা।

—ইহাও কি বাঙালী-কবির আত্ম-লাঞ্ছনা? বাঙালী-চরিত্রের এই সাধারণ দুর্ব্বলতাকেই কবি রাবণ-চরিত্রের উপাদান করিয়া, তাহাকে এক নূতন মহিমা দান করিয়াছেন। সেখানে এই দুর্ব্বলতাই মানুষের মনুষ্যত্বের নিদান; ইহা তাহার পৌরুষকে ব্যর্থ করিলেও সেই পৌরুষের অন্তরায় নয়—'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র সপ্তম সর্গে কবি তাহাই দেখাইয়াছেন। মমতার সহিত পৌরুষের মিলনে বীরহৃদয়ের কি অপূর্ব্ব বিকাশ হয়, পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য যুদ্ধযাত্রাকালে, রাবণের কয়েকটি কথায়, কবি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন; ইহাও তাঁহার কবিশক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

রণমদে মত্ত সাজে রক্ষঃকুলপতি···
হেনকালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী···
···রাজপদে পড়িলা মহিষী।
যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে,

রক্ষোরাজ ;—"বাম এবে, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার। যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
বৃথা রাজাসুখে, সতি! জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহ। যাও ফিরি, কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণী মন্দোদরি ?
বন-সুশোভন শাল ভূপতিত আজি,
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে,
গগন-রতন শশী চির-রাহুগ্রাসে!"

—ইহার সহিত রামের সেই কাতরোক্তি—"নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি" প্রভৃতির তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে, 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কবি এই হৃদয়-দৌর্ব্বল্যকে স্বীকার করিয়াও মানবতার কোন্ আদর্শকে অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।

*　　*　　*　　*　　*

রাবণ-চরিত্রসৃষ্টির মূলে যে কল্পনা আছে—কবিমানসের যে এক নূতন বিচিত্র ভাব-প্রেরণা আছে, সেই কল্পনাই সমগ্র কাব্যখানিকে একটি অখণ্ড সৃষ্টিসুষমায় মণ্ডিত করিয়াছে, ইহাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। এ কাব্যের বীররস হোমার-মিল্‌টনের কাব্যের বীররস নয়—কেন নয়, এবং কেন যে ইহা রীতিমত মহাকাব্য হইতে পারে নাই, তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা এ প্রসঙ্গে করিয়াছি। এ কাব্যে মানবতার যে একটি বিশিষ্ট আদর্শ কবিচিত্তে প্রতিফলিত হইয়াছে দেখা যায়, তাহার মূল কোথায়—বাঙালীর সংসার ও বাঙালী-জীবনের সেই সংস্কৃতির কথাও বলিয়াছি। পাশ্চাত্য আদর্শের পৌরুষময় বীরবীর্য্যের প্রতি আকর্ষণ কবিকল্পনাকে কতখানি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে ; রাবণ-চরিত্রে সেই পৌরুষ কি অর্থে কতটুকু সত্য হইয়া আছে ; এই পৌরুষের পরাজয়ে কাব্যের যে ট্রাজেডি, এবং তাহার মূলে যে বিধি-নির্য্যাতন এই ট্রাজেডিকে রসোজ্জ্বল করিয়াছে ;—তাহা বলিয়াছি। ইহার পর—এ কাব্যের বারো আনা যে গ্রীক—কবির নিজের সেই উক্তি—কতখানি সত্য, তাহাও দেখিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই একই কল্পনার অনুসরণ করিয়া 'মেঘনাদবধে'র অপর চরিত্রগুলির মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মেঘনাদবধ-কাব্যের নায়ক কে? রাবণ, না ইন্দ্রজিৎ? রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ; ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণ।

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র নায়ক ইন্দ্রজিৎ ও নায়িকা প্রমীলা—কাব্যের সাধারণ লক্ষণ অনুসারে ইহাই মানিতে হয়; কিন্তু সেজন্য, রাবণকে যে কারণে এ কাব্যের মূল আশ্রয় বলিয়াছি, তাহাতে বাধে না—সে কথা পরে বলিব। মেঘনাদ-বধই যখন এ কাব্যের প্রধান ঘটনা ও বর্ণনীয় বিষয়, তখন সেই ঘটনাটিকে অতি উজ্জ্বল ও গভীর বর্ণে পাঠকের চিত্তে প্রতিফলিত করিবার জন্য মেঘনাদ ও প্রমীলাকে যুগ্ম-তারকারূপে আমাদের দৃষ্টি-দিগন্তে সর্ব্বাপেক্ষা রশ্মিমান করিয়া তোলা কবির একটি প্রধান কর্ম্ম। এই কারণে মেঘনাদই এ কাব্যের মণিমালার মধ্যমণি—তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে বিস্ময় শ্রদ্ধা ও প্রীতির যোগ্য করিয়া তুলিতে কবি ত্রুটি করেন নাই। মেঘনাদ-চরিত্র সম্বন্ধে কবির ব্যক্তিগত মনোভাব তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে একাধিক স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে—সে সম্বন্ধে এবং সেই সূত্রে, মধুসূদনের কবি-চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার বিষয়ে, এইখানে কিছু বলিব। এই সকল পত্রে আমরা কবি-মানুষটিকে যেমন পাই, কবি-মানসের তেমন পরিচয় পাই না। নিজের ব্যক্তিগত রুচি বা সজ্ঞান অভিপ্রায় সম্বন্ধে এই সকল পত্রে তিনি যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস ও আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলে কাব্যগত গূঢ়তর কবি-প্রবৃত্তির বরং বিপরীত; যেন দিব্য-আবেশের অবস্থায় লেখনীমুখে যাহা সৃষ্টি হইতেছে, তাহার সজ্ঞান চেতনা কবির নাই—মনের উপরি-তলে একটা প্রবল উন্মাদনা, বালকোচিত স্ফূর্ত্তি ও আত্মপ্রসাদ তাঁহার উৎসাহ রক্ষা করিতেছে, তাহাতেই তাঁহার তৃপ্তি। কবি-প্রতিভার প্রকৃতিবিশেষে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়—মধুসূদনের কবি-প্রকৃতি আধুনিক আত্মসচেতন গীতিকবির প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; অতি-আধুনিক তথা-কথিত কবিসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁহার যে দূরতম জ্ঞাতি-সম্পর্কও নাই, তাহাও মনে রাখিতে হইবে। এই সময়ে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিতেছেন। [রাজনারায়ণ তাঁহাকে একখানি জাতি-গৌরব-মূলক মহাকাব্য (National Epic) লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন]—

The subject you propose for a national epic is good—very good indeed. But I don't think I have as yet acquired a sufficient mastery

over the "Art of Poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime, I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit.

—ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মধুসূদন এক্ষণে আর কাব্যের নানা ছাঁচ ও আদর্শ লইয়া নিজ কবিশক্তির অনুশীলন করিতে উৎসুক নহেন—রোমান্টিক কমেডি ও রোমান্টিক ট্রাজেডি লিখিবার, অথবা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কল্পনার পক্ষ মুক্ত করিবার আগ্রহ আর তেমন নাই ; এইজন্য national epic-এর মত এক ধরনের আদর্শ-কাব্য রচনা করিয়া কেবলমাত্র একটা সাহিত্যিক কীর্ত্তি স্থাপন করিতে তিনি আর উৎসুক নহেন। "I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit"—এই সামান্য উক্তিটির মধ্যে তাঁহার নিজেরও অজ্ঞাত এক অভিনব প্রেরণার ইঙ্গিত রহিয়াছে। আর্ষ রামায়ণে ইন্দ্রজিতের চরিত্রে তিনি যে পৌরুষ-বীর্য্যের আভাস পাইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে অন্য প্রসঙ্গে করিয়াছি ; তাহারই বীজ তাঁহার মগ্নচৈতন্যে উপ্ত থাকিয়া এতদিনে অঙ্কুরিত হইয়াছে। এমন আত্মশক্তিমান নির্ভীক পৌরুষের সাক্ষাৎ তিনি বোধ হয় আর কোথায়ও পান নাই, এবং ঘটনাক্রমে পাইয়া তিনি এক অপূর্ব্ব আত্মস্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়াছিলেন ; বাহিরের সর্ব্বসংস্কার ভেদ করিয়া এই চরিত্রের গৌরব তাঁহার অন্তরতম আত্মচেতনা প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র প্রেরণামূলে যে আত্মস্ফূর্ত্তির আবেগ আছে, এইখানেই তাহার জন্ম। ইহার তুলনায়, কোন একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক আদর্শে কাব্যরচনার আগ্রহ মন্দ হইবারই কথা।

কিন্তু, এই আত্মানুরূপ পৌরুষ-বীর্য্যের গৌরব-গাথাই নয়—তাহার নিষ্ফল পরিণাম, মেঘনাদের হত্যাজনিত পরাজয়ের কাহিনীই—মর্ম্মান্তিক বিষাদ ও হতাশার সুরে গাহিবার জন্য—to celebrate "the death"—কবি অধীর হইয়াছেন। এইখানেই এক ধরনের রোমান্টিক কবি-প্রবৃত্তির পরিচয় রহিয়াছে। যাহা মহৎ তাহা অনন্যসাধারণ ও বিস্ময়করররূপে সকলের ঊর্দ্ধে বিরাজ করিবে, সকলকে জয় করিবে—এই কামনাই এপিকের বীর-গাথার গীত-ঝঙ্কারে আকাশ বাতাস মুখরিত করে। কিন্তু আর এক প্রকৃতির কবি-ভাব জগৎব্যাপারে এমন সুবিধি বা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা প্রত্যাশা করে না, বোধ হয় কামনাও করে না। যাহা শ্রেষ্ঠ, সুন্দর ও সর্ব্বগুণের আধার, তাহার বিনাশ ও ব্যর্থতাই সে প্রকৃতির

পক্ষে পরম রমণীয়, তাহাই অধিকতর সত্য। যাহাকে আমরা কাব্যের অপর প্রবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহাতে পুরুষ যেন আপন শক্তি ও বুদ্ধির গৌরবে আত্মতৃপ্ত, নিজেরই মনোগত সংস্কারের ন্যায়নীতি ও ধর্ম্মবিধানের দ্বারা জগৎকে শাসিত ও সুব্যবস্থিত মনে করিয়া নিশ্চিন্ত; সেখানে প্রকৃতির সহিত পুরুষের বিরোধে, পুরুষ আপনাকে জয়ী মনে করিয়া সুখী। জীবনের কোন কিছুই কার্য্যকারণ সঙ্গতির বহির্ভূত নয় বলিয়া সেখানে আলো-আঁধারের রহস্য নাই, দুর্জ্ঞেয় বলিয়া কিছুতেই বিস্ময়বিমূঢ়তাব কারণ নাই। কিন্তু যাহাকে আমরা রোমান্টিক কল্পনা বলিয়া থাকি, তাহাতে বাস্তব-অভিজ্ঞতার মূল্য কম—প্রকাশ অপেক্ষা অপ্রকাশের মাহাত্ম্যই অধিক। এজন্য সাক্ষাৎ জগৎব্যাপারে নিয়ম অপেক্ষা অনিয়ম, পূর্ণতা অপেক্ষা অপূর্ণতা, সার্থকতা অপেক্ষা ব্যর্থতা এবং চিন্তনীয় অপেক্ষা অচিন্তনীয়ের প্রভাবই স্বীকার করিতে হইবে—তাহাতেই কবি-চিত্তের মুক্তি ও কাব্যের লোকোত্তর-চমৎকার ঘটিয়া থাকে। এই কারণে, একটিতে—পুরুষ জীবনে যেমন, কবিও তেমনই কল্পনায়, প্রকৃতির সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বে দৃঢ়ভাবে আত্মসংবরণ করিবার প্রয়াসী; অপরটিতে পুরুষ প্রকৃতির সহিত সন্ধি করিতে চায় না, কোনরূপ হিসাববুদ্ধির বশে আত্ম-সংকোচ বা আত্মসংবরণ করিয়া শান্ত ও নিশ্চিন্ত হইতে চায় না—আত্মস্ফূর্ত্তির প্রবল আবেগে বাসনা-কামনার চূড়ান্ত পরিণাম প্রত্যক্ষ করিতে চায়; তাহাকে সংযত করিয়া পরিমিত সুখভোগ অপেক্ষা, প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে আপনার অন্তর মথিত করিয়া, এক পরম চরিতার্থতা লাভ করে। ইহাই রোমান্টিক কবি-প্রবৃত্তির একটি অতি সহজ ও সাধারণ ভঙ্গি; ইহা ঠিক আত্মভাবপ্রাধান্য নয়—বিদ্রোহ বা আত্মঘোষণার ভাব। এই প্রবৃত্তিই সূক্ষ্মতর হইয়া গীতিকাব্যের আত্মভাবপ্রাধান্যে পরিণত হয়; সেখানে কবি আত্মসর্ব্বস্ব—সকল দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতন্ত্র। এজন্য সে-কল্পনা কাহিনী বা নাটকের কল্পনা নয়। সে কল্পনা এই অর্থে আরও রোমান্টিক যে, তাহা আপনার বাহিরে আর কিছুকেই স্বীকার করে না—তাহাতে কোন ব্যক্তির পৃথক ব্যক্তিত্ব নাই, সে-জগতে কবির স্বকর্তৃত্ব ব্যতিরেকে কোন ঘটনাই ঘটিতে পারে না—চরিত্র বা ঘটনা কিছুরই বস্তুগত (objective) পৃথক মূল্য নাই। বলা বাহুল্য, মধুসূদনের কল্পনা এ ধরনের রোমান্টিক কল্পনা নয়—তাঁহার কবি-প্রবৃত্তি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত। মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'ই এ প্রবৃত্তির পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন।

রামায়ণের মেঘনাদ-চরিত্রে তিনি সেই ভাববীজের পূর্ণবিকাশক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং মেঘনাদের মৃত্যু, অর্থাৎ আপন হৃদ্‌গত আদর্শের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—জগতের সঙ্কীর্ণ স্থান-কালের ব্যবস্থায়, দুর্জ্ঞেয় অন্ধ নিয়তির আঘাতে তাহার বিনাশ—তাঁহার রোমাণ্টিক কল্পনাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে। তাই কবি এমন উৎসাহের সহিত লিখিতেছেন—"I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit."

তথাপি, এই পত্রগুলির সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম—অর্থাৎ এগুলির মধ্যে কবির নিজ কবিমানসের গূঢ়তর প্রেরণার সজ্ঞান পরিচয় নাই। এক দিকে যখন এই কাব্যের অভিনব কবি-প্রবৃত্তির কথা চিন্তা করি, তখন আর এক দিকে মেঘনাদের সম্বন্ধে একখানি পত্রে বন্ধুকে এইরূপ প্রশ্ন ও মন্তব্য করিতে দেখিয়া কৌতুকাবিষ্ট হইতে হয়।—

Let me hear what favour the glorious son of Ravan finds in your eyes. He was a noble fellow, and but for the scoundrel Bibhishan would have kicked the Monkey army into the sea.

—এ যেন মেঘনাদবধ-যাত্রা শুনিয়া কোনও গ্রাম্য যুবক বা স্কুলের ছাত্র উচ্ছ্বসিত আবেগে মন্তব্য করিতেছে। অতএব, কবির মুখে এরূপ কথা শুনিয়া কাব্যসৃষ্টির প্রতিভা ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সেই পুরাতন বিস্ময় নূতন করিয়া জাগে। কাব্যসৃষ্টির আবেশ-কালে যে মানুষ দিব্য-চেতনার অধিকারী, সেই আবেশ যখন আর থাকে না, তখন সেই মানুষও আর সে-মানুষ নয়—যে 'বোধি' কাব্যসৃষ্টি করে, তাহা যেমন 'বুদ্ধি' নয়, তেমনই বুদ্ধি ও বোধি পরস্পরের সহায়ও নয়। ইহাও কবি-প্রতিভার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—এ ধরনের প্রতিভায় সৃষ্টি ও সমালোচনা একসঙ্গে বিদ্যমান থাকে না। এ যেন একই জীবনে জন্ম-পরিবর্ত্তন—এক জন্মের কথা আর এক জন্মে মনে থাকে না। কাব্যের মধ্যে কবিচিত্তের যে অবাধ স্ফূর্ত্তি—কবির মুখের যে হাসি বিস্ফারিত হইয়া আছে—কবিকে জিজ্ঞাসা করিলে কবি তাহার কারণ বলিতে পারিবেন না। আমাদের আর এক কবি অশোক-তরুকে দেখিয়া তাহার অজস্র পুষ্পরাশির 'লালে-লাল' হাসির কারণ তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তরু তাহা বলিতে পারে না, তাই কবি একটি চমৎকার ভাব-তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া বলিতেছেন—

—হায়, এই অবনী-মাঝারে
কেহ নহে জাতিস্মর—তরু, জীব, প্রাণী!

পরাণে লাগিয়া ধাঁধা আলোক-আঁধারে,
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী !

মধুস্থদনের মত কবির অবস্থাও তেমনই। আজ আমরা তাঁহার কাব্য লইয়া যে বিচার বিশ্লেষণ করিতেছি, তাহার লেশমাত্র কবির মনে কখনও উদয় হয় নাই।

মেঘনাদ যে কেন, কি হিসাবে এই কাব্যের নায়ক, তাহা বুঝিলাম—মেঘনাদ ও তাহার মৃত্যু এ কাব্যের আর সকল ঘটনা ও চরিত্র হইতে পৃথক প্রাধান্য লাভ করিবার কারণ আছে। কিন্তু অলঙ্কার-শাস্ত্রের সংজ্ঞা বাদ দিলেও, আমরা নায়ক অর্থে সেই চরিত্রই বুঝি, যাহার doing ও suffering সমগ্র কাব্যখানির ভিত্তি বা মূল প্রতিপাদ্যরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। এ কাব্যে মেঘনাদ-চরিত্র ও তাহার দারুণ দুর্ভাগ্য প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হইলেও, সে চরিত্র doing বা suffering কোনটাতেই একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া নাই—তাহার কোন বিশিষ্ট কীর্ত্তি অপেক্ষা, নিদারুণ অক্ষমতাই আমাদিগকে সমধিক বিচলিত করে। মেঘনাদ এ কাব্যের ভিত্তি বা ধারণ-স্তম্ভ নয়, কাব্যের ঘটনাক্ষেত্রের অতি অল্পই সে অধিকার করিয়া আছে—যদিও সেইটুকুর মধ্যেই কবি তাহাকে আদর্শ-নায়কের সর্ব্বগুণে গুণান্বিত করিরা আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। অপর দিকে, এ কাব্যের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রাবণের ভাগ্যই একটি অবিচ্ছিন্ন ডোর-রূপে অনুস্যূত হইয়া আছে। (মেঘাবৃত অন্ধকার আকাশের বুকে বলাকা যেমন অতিশয় লক্ষণীয় হইয়াও সেই আকাশের মসীবর্ণকেই গাঢ়তর করিয়া তোলে, এ কাব্যের সাক্ষাৎ নায়ক মেঘনাদও তেমনই, তাহার পশ্চাতে রাবণভাগ্যের বিস্তৃত পটভূমিকে গাঢ়তর বর্ণবৈভব দান করিয়াছে;) রাবণের বিশাল বক্ষের ক্ষতস্থল-রূপে মেঘনাদ ও তদ্‌সম্পর্কিত যতকিছু উজ্জ্বল লোহিতরাগ ধারণ করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে এ কাব্যের যে রোমান্টিক প্রবৃত্তির কথা—কবির আত্মভাবপ্রবণতার কথা বলিয়াছি, তাহা দ্বারাই রাবণ ও মেঘনাদ উভয়ের মধ্যে নায়ক-পদবীর এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইতে পারে। কাব্যে যাহা ঘটিয়াছে, কবি-মানসের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার অনুরূপ ক্রিয়া লক্ষ্য করা যাইবে। মেঘনাদ কবির কামনাগত আদর্শ, সে চরিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, নির্দ্দোষ; তাহার কল্পনায় কোন বাধা নাই, কবি-কামনার মোক্ষধামে তাহার অবস্থিতি। কিন্তু বাস্তব বিধি-নিয়তির সংঘাতে এ স্বপ্ন টিকিবে না—জীবনে তাহা সফল হইবার নয়; এ কল্পনার সঙ্গে এই দুঃখ—

সেই নিষ্ফলতার হাহাকার ও নৈরাশ্যের অন্ধকারই—রোমান্টিক কাব্য-পিপাসার পক্ষে বড় মধুর, বড় উপাদেয়। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' এই দুঃখের হেতু হইয়াছে মেঘনাদ—মেঘনাদই কবির সেই আশুবিধ্বংসী দুরূহ কামনার মানস-বিগ্রহ। কিন্তু মেঘনাদ তো সেই দুঃখের বিষয়, তাহার আশ্রয় হইবে কে? ভিতরে কবির নিজের প্রাণই সেই আশ্রয়—বাহিরে রাবণ তাহার প্রতিকৃতি। এইজন্য মেঘনাদই এ কাব্যের সর্ব্বস্ব হইতে পারে নাই, কবির এই আত্মভাব-প্রতিষ্ঠার জন্য রাবণের বিশাল ছায়া মেঘনাদকে আবৃত ও অতিক্রম করিয়া আছে। এই রোমান্টিক লিরিক আবেগ 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র এপিক-অভিপ্রায়কে দ্বিধাযুক্ত করিয়াছে, এবং মেঘনাদকে নায়ক করিতে গিয়াও, কবির স্বকীয় প্রাণের আকুতি, তাহাকেই শাস্তি ভোগ না করাইয়া, রাবণকে করাইয়াছে—doing ও suffering-এর যত-কিছু ভার রাবণই বহন করিতেছে। এই রহস্যই এ কাব্যের সবচেয়ে বড রহস্য। খাঁটি এপিক বা ক্ল্যাসিক্যাল, অথবা খাঁটি রোমান্টিক হইলে, আমরা রাবণ বা ইন্দ্রজিৎ একজনকেই নায়করূপে পাইতাম; কিন্তু ক্ল্যাসিকাল আদর্শ ও রোমান্টিক মনোবৃত্তি এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে এই নায়ক-দ্বৈধের সৃষ্টি হইয়াছে। সজ্ঞানে কবি মেঘনাদকেই নায়ক করিয়াছেন বটে, কিন্তু নির্জ্ঞানে রাবণই তাঁহার সমগ্র কল্পনাকে অধিকার করিয়া তাহার কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতেছে। যেন রাবণ-রূপ আকাশে নানাবর্ণের নিত্য-বিকাশের মধ্যে মেঘনাদ একটি অত্যুজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা—মুহূর্ত্তে ঝলসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল; সে ঘটনা ঐ আকাশকে চমকিত করিয়া, তাহার সকল শোভা সকল আলো ম্লান করিয়া, যে স্তব্ধ-গম্ভীর অন্ধকারে তাহাকে ঢাকিয়া দিল, আমরা শেষ পর্য্যন্ত তাহার দিকেই চাহিয়া রহিলাম; যখন মেঘনাদ নাই, আর কেহ নাই, তখনও রাবণ আছে; এই রাবণেই কাব্যের আরম্ভ ও তাহাতেই কাব্যের শেষ। তাহা ছাড়া, রাবণই সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, জয়-পরাজয়, কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির ফলভাগী; শত্রুর সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ সেই করিতেছে; এ কাব্যের পরিণামও রাবণের পরিণাম, ইন্দ্রজিৎ সেই পরিণামকে দারুণতর করিয়াছে মাত্র। অতএব কবির সজ্ঞান অভিপ্রায় যাহাই হউক, এবং মেঘনাদের জীবন যতই সুন্দর, ও মৃত্যু যতই করুণ হউক—এ কাব্যে সে সকলই উপলক্ষ্য হইয়া আছে, লক্ষ্য—রাবণ-চরিত্র ও রাবণ-ভাগ্য। তথাপি ইন্দ্রজিৎকে এই অর্থে নায়ক বলা যাইতে পারে যে, তাহাকে লইয়াই এ কাব্যের প্রধান ঘটনা, এবং কবি এই চরিত্র ও নায়িকা প্রমীলার

সহযোগে, জীবনের যে একটি উজ্জ্বল-মধুর ভাব-লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, পদ্মের শতদলবেষ্টিত মধুস্থলীর মত তাহা এই কাব্যের বিশিষ্ট রস-নিকেতন হইয়া আছে।

এক্ষণে এই মেঘনাদ-চরিত্রে মধুসূদনের নিজস্ব কবিস্বপ্ন কতখানি প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাই দেখিব। রাবণ ও মেঘনাদ, একই কল্পনার দুই দিক; রাবণ যাহা হইতে পারিত—সংশয়হীন জীবনের আশায়-আনন্দে উৎফুল্ল, সতেজ ও সুস্থ যৌবনধনে ধনী, সকল কর্ম্মফল-ভোগ হইতে মুক্ত যে আদর্শ-জীবন, কবি-কল্পনায় সকল পুরুষের পক্ষে সম্ভব, পুত্র মেঘনাদের জীবনে রাবণের সেই সম্ভব-জীবনের বীজ যেন পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু রাবণের জীবনীশক্তি ও সে-শক্তির স্ফুরণ মেঘনাদের অপেক্ষা অনেক অধিক—অধিক বলিয়াই রাবণ পাপী, মেঘনাদ অপাপবিদ্ধ। চন্দ্রকলায় কলঙ্ক নাই, পূর্ণতর না হইলে চন্দ্রকলায় কলঙ্ক প্রকাশ পায় না। মেঘনাদের যৌবন এমনই নবীন যে, তাহাতে জীবনের বসন্ত-ঋতু ছাড়া আর কোন ঋতুর প্রভাব নাই, তাহাতে কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের শুচিতা ও সৌন্দর্য্যই আছে; সে বৃক্ষে ফল নাই, কেবল ফুলই আছে। মানব-জীবনপুষ্পের এই যৌবন-বিকাশকেই কবি মেঘনাদ-চরিত্রে মূর্ত্তি দিয়াছেন। রাবণে যাহার প্রৌঢ় পরিণাম, মেঘনাদে তাহার সদ্য-তরুণ নবোদ্ভিন্ন রূপ; এই দুইই একই মনুষ্য-জীবনের অখণ্ডনীয় নিয়তি। ইন্দ্রজিৎ নিজে নিষ্পাপ,—সরস-সতেজ, উন্নত-সুঠাম একটি নবপুষ্পিত পুন্নাগ-তরুর মত; তথাপি যেন কোন অবোধ বালকের কুঠারাঘাতে সেই তরু ছিন্নমূল হইয়া ভূতলশায়ী হইল—ইহাই বিধি। পিতা রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিতের প্রাক্তন; আবার ইন্দ্রজিৎ যেন স্বকর্ম্মফলভুক্ রাবণেরই শাস্তির কারণ; ইন্দ্রজিতের মৃত্যু ইন্দ্রজিতের কর্ম্মফলভোগ নহে, "মরে পুত্র জনকের পাপে"। রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ একই চরিত্রের দুই রূপ নহে—একই মানব-নিয়তির দুই দশা। এই অর্থে ঐ দুই চরিত্রকে পরস্পরের পরিপূরক বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

এই মেঘনাদ—কবির 'favourite Indrajit'—রামায়ণের মেঘনাদের বীর্য্যাঙ্কুর হইতে কবির মনে জন্মলাভ করিলেও, ইহা মধুসূদনেরই কবিচিত্ত-ফুলবন-মধুর নির্য্যাস। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এইখানেই তাঁহার কবিকল্পনার ক্ল্যাসিকাল প্রবৃত্তি পূর্ণ প্রশ্রয় পাইয়াছে। এ চরিত্র নিদাঘ-দিবার মত দীপ্ত ও নির্ম্মল, কোনখানে মেঘ বা কুয়াশার লেশমাত্র নাই। ইহার অন্তঃকরণে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রশ্ন-সংশয় নাই, নৈরাশ্য নাই; প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রস্ফুট

কুসুমে কোথায়ও চিন্তাকীট প্রবেশ করে নাই। আর্ষ রামায়ণের মেঘনাদের সেই দৃপ্ত পশুবল, মধুসূদনের মেঘনাদে অপর সকল মহৎ গুণের সমবায়ে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে—মায়ের দুলাল, পিতার নয়ন-মণি, পত্নীর কণ্ঠহার, শত্রুর দুঃস্বপ্ন এই মেঘনাদ, সলিল-অগ্নি-মরুতের সন্নিপাতে মেদুর মেঘকান্তির মত নয়নমনোহর হইয়াছে। মেঘনাদের বীরত্বের মূল উপাদান হইয়াছে—তাহার নিরতিশয় ভয়শূন্যতা; শক্তিমদমত্ততা নয়—অসীম বাহুবল ও হৃদয়বলের অমোঘতায় বিশ্বাসই ইহার কারণ। আরও কারণ, মেঘনাদ ক্রূরতা বা কপটতায় বিশ্বাস করে না, জগৎকে সে আত্মবৎ বীরধর্ম্মী মনে করে—হিংস্র ব্যাঘ্র বা সর্পের ভয় সে করে না। রাবণের মনে বিধি নামক যে দুর্জ্জেয় বিরুদ্ধ শক্তির চেতনা জন্মিযাছে, তাহার মনে সে চেতনাও নাই। মনের সারল্য ও প্রাণের এই নির্ভীকতাই তাহার কর্ত্তব্যকেও সরল করিয়াছে। কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য, কাহার পাপে কে ফলভোগ করিবে—এ সকল ভাবনা তাহার নাই। অতি সহজ সুস্থ হৃদয়বৃত্তির বশে সে ভালবাসে, ভক্তি করে, যুদ্ধ করে; তাহার ধর্ম্ম বিচার-বিতর্কের ধর্ম্ম নয়, তাহা স্বাভাবিক প্রাণধর্ম্ম—পৌরুষের ধর্ম্ম। মেঘনাদের মনে যেমন কোন অস্বাভাবিকতা নাই, তেমনই, লক্ষ্মণের মত—স্বপ্ন, দৈব, বা অতিপ্রাকৃতের কোন বালাই তাহার কাহিনীর সঙ্গে জড়িত হইয়া নাই, সে সম্বন্ধে কবির কল্পনার এই সাবধানতা উল্লেখযোগ্য। এ চরিত্র-সৃষ্টিতে মধুসূদনের ক্ল্যাসিকাল কাব্যসংস্কারই জয়ী হইয়াছে।

মেঘনাদ-চরিত্র সম্বন্ধে ইহার অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, বাকি যাহা কিছু—কাব্যপাঠকালে পাঠকমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। আমি কেবল এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের কবিশক্তির দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার কবিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে লক্ষ্মণের কথা কিছু বলিয়া লইতে হইবে।

লক্ষ্মণ-চরিত্র 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ও তথা মধুসূদনের কবি-মনোভাবের একটি গুরুতর ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। খুব মন দিয়া কাব্যখানি পাঠ করিলে এ অভিযোগ একেবারে দূর করিতে না পারিলেও কতকটা লঘু করা যাইতে পারে। লক্ষ্মণ রামায়ণের একটি অসাধারণ জীবন্ত ও বীর্য্যবান চরিত্র। এ চরিত্রে ব্যক্তিত্বের লক্ষণ খুব প্রকট। মধুসূদন লক্ষ্মণের সে মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা যে করিয়াছেন, লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার কবিহৃদয়ের সহানুভূতিও অল্প নহে—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এ কাব্যে আছে। এমনও বলা যাইতে পারে যে, রামের প্রধান

ভরসা, শক্তি ও সহায়-স্বরূপ—তিনি লক্ষ্মণকেই অপর পক্ষের নায়করূপে বরণ করিয়াছেন, রাম অপেক্ষা লক্ষ্মণকে বহুগুণ শক্তি সাহস ও বীরত্বে মণ্ডিত করিয়াছেন। লক্ষ্মণ ধর্ম্মভীরু নয়—বরং ধর্ম্মবলদৃপ্ত; দেবতাদের আনুকূল্য তাহার নিকটে দয়া বা অনুগ্রহ নয়, সে যেন তাহাদেরই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। লক্ষ্মণের দেবভক্তি ন্যায়নিষ্ঠারই নামান্তর; সে একমাত্র এই ন্যায়ধর্ম্মের বিশ্বাসেই বলীয়ান—ইন্দ্রজিৎ যেমন একমাত্র বীরধর্ম্মের সেবক; অন্যায়ের দণ্ডবিধান করিয়া এই ন্যায়ধর্ম্মের উদ্ধার করিতে সে দৃঢ়পণ ও একাগ্রমনা। মধুসূদন তাঁহার কাব্যে সর্ব্বত্র লক্ষ্মণকে এই বিশিষ্ট গৌরব দান করিয়াছেন; সে চরিত্রের যেন মূলমন্ত্র এই—

> Because right is right, to follow right
> Were wisdom in the scorn of consequence.

এই লক্ষ্মণ এ কাব্যে প্রায় সর্ব্বত্র 'সৌমিত্রি কেশরী' ও 'দেবাকৃতি রথী' প্রভৃতি নিত্য-বিশেষণে কবিকর্ত্তৃক ভূষিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ-চরিত্রের এই বিশিষ্ট গৌরব যেমন মূল রামায়ণেই কবিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, এজন্য লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার একটি সহজ সহানুভূতি আছে, তেমনই, লক্ষ্মণের এই গৌরবরক্ষা তাঁহার এই কাব্যের জন্যও প্রয়োজন হইয়াছিল। যে মেঘনাদকে বধ করিবে, তাহাকে সাধারণ বীর হইলে চলিবে না; নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বী কেবল সমকক্ষ নয়, কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর না হইলে নায়কের গৌরববৃদ্ধি হয় না—এ নীতি বা রীতি অতিশয় সাধারণ কবিকেও মানিতে হয়। কিন্তু এই গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া—বিশেষত, আর্ষ রামায়ণবর্ণিত লক্ষ্মণ-চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ত্যাগ করিতে না পারিয়া, মধুসূদন বড় বিপদে পড়িয়াছেন। এক দিকে এই শ্রদ্ধা ও লক্ষ্মণের গৌরবরক্ষার প্রয়োজন, অপর দিকে তাঁহার কল্পনার মুখ্য অভিপ্রায়-সাধন—এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই—বরং এই creative necessity-র বশে তিনি যে নিরুপায় হইয়াই লক্ষ্মণকে এমন কলঙ্কের ভাগী করিয়াছেন, যাহা তাঁহারই কল্পিত চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী—সে বিষয়ে কবিও পূর্ণ সজ্ঞান; তাহার প্রমাণ—ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করিবার সময়ে লক্ষ্মণের মুখে যে বীরদর্পের আস্ফালন ও আত্মসমর্থনের বাণী আমরা শুনি, তাহার মত দুর্ব্বল রচনা এ কাব্যে আর কোথায়ও নাই। যে creative necessity-র কথা বলিয়াছি, তাহা এইরূপ। ইন্দ্রজিতের নিধন লক্ষ্মণের হাতেই হইতে হইবে, অথচ ইন্দ্রজিৎ

অজেয়—একরূপ অমর বলিলেই হয়। স্বর্গে মর্ত্ত্যে কেহ তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস করে না। সেই ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্মণ মারিবে কেমন করিয়া? বাল্মীকির রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ দুর্জ্জয় হইলেও অজেয় নয়; নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ নামক একরূপ যাদু বা মায়াঘটিত প্রক্রিয়ার দ্বারাই সে বারবার অজেয় হইয়া উঠে। মধুসূদনের মেঘনাদ এত ছোট নয়; সে তাহার নিজশক্তিতেই দুর্জ্জয়—নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ করিতে তাহার অনিচ্ছা নাই, কিন্তু সে কেবল পিতামাতার আদেশ ও কুলধর্ম্মের অনুরোধে। ইষ্টদেবতার বর ও আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা ইন্দ্রজিতের মত বীরের পক্ষে সুন্দর ও শোভন। অতএব এই ইন্দ্রজিৎকে যে বধ করিবে, তাহার কেবল অসাধারণ বীর-যোদ্ধা হইলেই চলিবে না, কারণ সম্মুখযুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত করিয়া তাহার বধসাধন অসম্ভব। কবি মেঘনাদ সম্বন্ধে যদি এই ধারণা শেষ পর্য্যন্ত বজায় না রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার কল্পনারই অঙ্গহানি হয়। অতএব লক্ষ্মণকে কাপুরুষের মত কাজ করিতেই হইবে।

কিন্তু লক্ষ্মণের এই কাপুরুষতা যে আমাদের মনে এত অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে, তাহার আরও কারণ আছে। আমরা ইন্দ্রজিতের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াই তাহার প্রতি লক্ষ্মণের এই আচরণে এত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির চক্ষে মেঘনাদ একটা দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস মাত্র, সে যেন 'দেবদৈত্য-নরত্রাস' একটা কালান্তক পুরুষ—কালিদাসের ভাষায় 'উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ'। স্বর্গে ইন্দ্র মায়াদেবীকে বলিতেছে—

> না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে!
> মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়াজাল পাতি,
> কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব, দুর্ম্মদ সংগ্রামে
> রাবণি!

রামও বিভীষণকে বলিতেছেন—

> ভেবে দেখ মনে, শূর, কালসর্প তেজে
> তবাগ্রজ, বিষদন্ত তার মহাবলী
> ইন্দ্রজিৎ।

স্বয়ং বিভীষণও তাহাকে 'কালফণী দুরন্ত দংশক' 'কানন-বৈরী ঘোর দাবানল' প্রভৃতির সহিত তুলনা করিয়া থাকে। অতএব এই মেঘনাদকে যে-কোন উপায়ে হত্যা করিতে লজ্জাবোধ না করা কোন মনুষ্য-বীরের পক্ষে

অস্বাভাবিক নয়। তাই লক্ষ্মণ যখন মেঘনাদের মুখে রথিকুলপ্রথার উল্লেখ শুনিয়া বলে—

জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষাত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে ?

তখন লক্ষ্মণের মুখে সে কথা যথার্থ বলিয়া মনে হয়।

মেঘনাদের এই হত্যা-ব্যাপারটিকে দুরূহ ও দুঃসাধ্য করিবার জন্য কবি-কল্পনা সর্ব্বাধিক আয়াস স্বীকার করিয়াছে—কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে ষষ্ঠ সর্গ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কবির ভাবনা সমান অব্যাহত আছে। ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে পরাস্ত করিবার জন্য নয়—হত্যা করিবার জন্যও, দেব অস্ত্র চাই ; লঙ্কার পুরপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া অদৃশ্যভাবে রাবণের পুরীতে ও মেঘনাদের যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিবার জন্যই নয়—হত্যাকালে মেঘনাদকে মোহিনী মায়ায় অবশ ও বিমূঢ় করিবার জন্য এবং লক্ষ্মণকে অদৃশ্য মায়া-কবচে সুরক্ষিত করিবার জন্যও, শক্তীশ্বরী মায়ার সাক্ষাৎ সহায়তা চাই ; এবং সর্ব্বশেষে, হত্যাকারী হইবার জন্যও লক্ষ্মণের মত 'দেবাকৃতি রথী'কে চাই, এবং সেই মহারথী 'তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী' হইলেই চলিবে না, তাহাকে তাহার চরিত্রের শুচিতা, সংকল্পের দৃঢ়তা ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অটলতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে—চণ্ডীর দেউলে পূজা দিয়া লক্ষ্মণকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। শেষোক্ত ঘটনাটির উদ্ভাবনায় কবি যেন লক্ষ্মণ-চরিত্রে কলঙ্কলেপনের পূর্ব্বে, তাহার চরিত্র-বল ও হৃদয়-বলের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন সৃষ্টি করিয়া, আত্মদোষক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন। এই দেউলে প্রবেশ করিয়া দেবীর আরাধনা যে কত বিঘ্নসঙ্কুল, এবং দেবীর সশরীরে আবির্ভাব ও বরদান যে সাধকের কতখানি শক্তিসাপেক্ষ, তাহাই বর্ণনা করিয়া কবি অবশেষে এটুকুও যোগ করিয়াছেন—

"শুভক্ষণে গর্ভে তোরে, লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর!" কহিলা আকাশে
আকাশসম্ভবা বাণী। "তোর কীর্ত্তি-গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে!"

লক্ষ্মণের এই কীর্ত্তি যেন মেঘনাদকে হত্যা করার অপকীর্ত্তিকে কতকটা সহনীয় করিবে! লক্ষ্মণকে লইয়া কবি যে বিপদে পড়িয়াছেন, তার প্রমাণের অভাব নাই।

তথাপি লক্ষ্মণের প্রতি কবি যদি কোথাও স্পষ্ট অবিচার করিয়া থাকেন, তবে

সে একটিমাত্র স্থানে—যেখানে ইন্দ্রজিৎকে কপট যুদ্ধে আহ্বান করিয়া লক্ষ্মণ বলিতেছে—

> আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
> ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
> অবোধ, তেমতি তোরে…
> …মারি অরি পারি যে কৌশলে!

ইন্দ্রজিৎকে এমনভাবে হত্যা করিতে লক্ষ্মণের সঙ্কোচ না হওয়ার যে কারণ থাকিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি—লক্ষ্মণ নিজেও সে কথা বলিয়াছে। কিন্তু 'দেবাকৃতি রথী' 'সৌমিত্রী কেশরী'র মুখে এই কথাগুলি দিয়া কবিও তাহাকে প্রায় হত্যা করিয়াছেন। লক্ষ্মণ এখানে এমন নীতির আস্ফালন করিতেছে, যাহা কোনও ক্ষত্রিয়-বীরের মুখে কোন অবস্থাতেই শোভা পায় না। "মারি অরি পারি যে কৌশলে"—এ কথা তো কেবল মেঘনাদকে হত্যা করার কথা নয়! ঠিক এমনই কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "গান্ধারীর আবেদন"-কবিতায় দুর্য্যোধনের মুখে দিয়াছেন, যথা—

> যার যাহা বল
> তাই তার অস্ত্র, পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল।
> ব্যাঘ্রসনে নখদন্তে নহিক সমান,
> তাই ব'লে ধনুঃশরে বধি' তার প্রাণ
> কোন্ নর লজ্জা পায়?

এ কথা দুর্য্যোধনের মুখেই শোভা পায়, কিন্তু লক্ষ্মণ তো দুর্য্যোধন নয়। আমার মনে হয়, ঐ দৃশ্যের ঐ অবস্থানে লক্ষ্মণের মুখে ঐ একটিমাত্র কথায় কবি তাহার প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, তেমন অবিচার আর কিছুতেই হয় নাই।

লক্ষ্মণের প্রতি কবির এই অবিচার যে কারণে হউক বা যেমনই হউক, এই চরিত্রের প্রতি কবির সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই; ইহাই যে কবিকে বিপদে ফেলিয়াছে, সে কথা বলিয়াছি। রামের অতিরিক্ত ভ্রাতৃপ্রেমের যে দৌর্ব্বল্য, তাহাও লক্ষ্মণের গুণেই অনেকটা মার্জ্জনীয় হইয়াছে। এই লক্ষ্মণের প্রতি কবির মনোভাব সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলিব। ভ্রাতৃপ্রেমবশে লক্ষ্মণের আত্মত্যাগ—"জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে" তাহার এই দুঃখবরণ ও কৃচ্ছ্রসাধন, ইন্দ্রজিৎভক্ত কবির হৃদয়ও যে স্পর্শ করিয়াছে, এমন কি, তাহার সঙ্গে কবির যে সমপ্রাণতা ঘটিয়াছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত

এখানে উল্লেখ করিব। ইন্দ্রের আদেশে, স্বর্গ হইতে স্বপ্নদেবী সুমিত্রার বেশে লক্ষ্মণের শিয়রে আসিয়া বসিলেন। লক্ষ্মণ স্বপ্নে শুনিলেন, তাঁহার মা যেন স্নেহ-ব্যাকুল কণ্ঠে তাঁহাকে বলিতেছেন, চণ্ডীর দেউলে আরাধনা ও দেবীর বরলাভ না করিয়া তিনি যেন ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে না যান। তারপর—

> চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে,
> হায় রে নয়ন-জলে ভিজিল অমনি
> বক্ষঃস্থল ! "হে জননি !" কহিলা বিষাদে
> বীরেন্দ্র ,—"দাসের প্রতি কেন বাম এত
> তুমি ? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা-দুখানি,
> পূরাই মনের সাধ লয়ে পদধূলি,
> মা আমার ! যবে আমি বিদায় হইনু,
> কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
> হৃদয় ! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
> হেরিব চরণ-যুগ ?"

আমার মনে হয়, এই পংক্তিকয়টিতে ('দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা-দুখানি' ইত্যাদি) মধুসূদনের নিজেরই জীবনের একটি গভীর ব্যথা, কাব্যের প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কথাগুলি লক্ষ্মণের মুখে সময়োপ-যোগী হইলেও, সেই কথার মধ্য দিয়া, কবির নিজেরই আর্ত্ত কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। গৃহত্যাগ করিবার পর গোপনে মায়ের সঙ্গে তাঁহার কয়েকবার দেখা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার পরেই দেশত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে চলিয়া গেলে মায়ের সঙ্গে জীবনে আর দেখা হয় নাই—মাও বেশিদিন বাঁচিয়া ছিলেন না। এ আক্ষেপ মধুসূদনের জীবনে কখনও ঘুচে নাই। উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলি পড়িবার সময়ে কবির অশ্রুসিক্ত চক্ষু যেন স্পষ্ট দেখিতে পাই। তাই কাব্যের নৈর্ব্যক্তিক করুণরস এই ব্যক্তিহৃদয়-সংস্পর্শে আরও করুণ হইয়া উঠে। লক্ষ্মণের মত, কবিও মায়ের আকুল অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া বহুদূরে নির্ব্বান্ধব প্রবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন—মায়ের প্রাণে দুঃখ দিয়াছিলেন। স্বপ্নে সেই মাকে তিনিও হয়তো দেখিতে পাইতেন; কিন্তু লক্ষ্মণের সহিত সুমিত্রার আবার দেখা হইয়াছিল, কবির আর মাতৃদর্শন ঘটে নাই। তাই লক্ষ্মণের মুখে—

> আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
> হেরিব চরণ-যুগ ?

—কবির নিজেরই মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি বলিয়া মনে হয়! নিজ জননীকে স্মরণ করিয়া কবির এই দীর্ঘশ্বাস এ কাব্যে অন্যত্র আরও কয়েকটি পংক্তিতে শুনিতে পাই—

হায় রে, মায়ের প্রাণ! প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি!

লক্ষ্মণের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি যে কারণেই হউক, কবি-হৃদয়ের গভীরতর উল্লাস ও কল্পনার গূঢ়তর জাগরণ ঘটিয়াছে—ইন্দ্রজিতের কাহিনী-রচনায়। এই চরিত্রের প্রতি যে সহানুভূতি, তাহারই প্রভাবে মধুসূদনের কবিশক্তি সমধিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে; 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গে এমন ভাবকল্পনার ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের রসাবেশ আছে, যাহাতে মনে হয়, কবির কাব্যতরণী এতক্ষণে পূর্ণস্রোতে ভাসিয়াছে। ইন্দ্রজিতের প্রতি কবি-আত্মার সেই আত্মিক মমতার ফলেই, তাহার কাহিনীতে, বিদ্যুদ্দীপ্ত অশ্রুমেঘের এমন নীলাঞ্জনশোভা ঘনাইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চম সর্গে, লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করার শেষ আয়োজন সমাপ্ত করিয়া, দেবীর বর ও আশীর্ব্বাদ লাভের পর যখন চণ্ডীর দেউল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—পাখী ডাকিয়া উঠিল। সেই পাখীর ডাকে ইন্দ্রজিতেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।—

কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।

এই একই পাখীর ডাক, একই প্রভাত—এক দিকে দেব-মানবের নৃশংসতা, এবং অপর দিকে মনুষ্যহৃদয়ের মাধুরী ও দম্পতী-প্রেমের অসন্দিগ্ধ সারল্যকে যুক্ত করিয়া—এ কাব্যের ট্র্যাজেডিকে নিমেষে নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। একই মুহূর্ত্তে, এক দিকে ব্যাধের অলক্ষ্য সায়ক শাণিত ও অব্যর্থ হইয়া উঠিয়াছে, অপর দিকে সেই সায়কের লক্ষ্য যে কপোত-দম্পতী, তাহারা আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় নিশ্চিন্ত সুখে কলকূজন করিতেছে। রাত্রির অন্ধকারে নানা বিভীষিকার মধ্যে কবি যেমন হত্যার শেষ আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছেন, তেমনই, উষার নিষ্কলুষ আলোকে দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন করিয়া, প্রেম, স্নেহ ও ভক্তির অপার্থিব শোভা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তখন, মেঘনাদ প্রমীলার ঘুমন্ত আঁখি-পল্লব

চুম্বন করিয়া, তাহার হাতখানি হাতে ধরিয়া, কানের কাছে মৃদুগুঞ্জন করিতেছে—

ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা, তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখীকুল। মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর!

মানব-জীবনের যে মাধুরীর প্রতি কবির প্রাণগত আকর্ষণ, তাহারই রসাবেশে তিনি মেঘনাদের মৃত্যুদিনের প্রভাতটিকে এমন কোমল-করুণ, প্রসন্ন উষালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন—সূর্য্যের প্রখর আলোককে যেন বহুক্ষণ প্রকাশ হইতে দেন নাই। তাই, মেঘনাদ যখন প্রমীলাকে জাগাইতেছে, তখনও যেমন—'এতক্ষণে পোহাইল তিমির-শর্ব্বরী', তেমনই, রাণী মন্দোদরীর প্রাসাদে গিয়া মেঘনাদ যখন অনেক আশ্বাস ও সান্ত্বনার পর মায়ের নিকটে বিদায় লইতেছে, তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই, তখনও মেঘনাদ বলিতেছে—

ওই শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে!
পোহাইল বিভাবরী।

তার পরেও যখন প্রমীলাকে মায়ের কাছে রাখিয়া—

শিবিকা ত্যজিয়া,
পদব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথিবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত পথে যজ্ঞশালামুখে।

—তখনও কাননের পুষ্পতরুমূলে, স্খলিত পুষ্পরাশির আস্তরণে, উষার শুভ্রজ্যোতি বিকীর্ণ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বশেষে যখন প্রমীলা কোনরূপে পলাইয়া ইন্দ্রজিৎকে অর্দ্ধপথে আসিয়া ধরিল, তখনও মেঘনাদের মুখে শুনি—

অনুমতি দেহ, রূপবতি,
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমাকে ভাবিয়া
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর-গমনে,—

এতক্ষণে রজনী সত্যই প্রভাত হইল। কিন্তু এ প্রভাত লঙ্কার পক্ষে কালমেঘে আবৃত, রামের শিবিরেই সত্যকার প্রভাত হইতেছে। সেখানে লক্ষ্মণ রামকে বলিতেছে—

দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে; কালমেঘসম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারিদিকে! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু!

এই প্রভাত ও তাহার পূর্ব্বরাত্রি—চণ্ডীর দেউলে লক্ষ্মণের সেই অভিযানরাত্রি, এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্বল্পক্ষণস্থায়ী উষাকে কবি যেন পুরূরবার উর্ব্বশীর মত ধরিয়া, মানবজীবন-মাধুরী উপভোগ করিয়াছেন। ইহার পর ষষ্ঠ সর্গে, এই জীবনের নিষ্ঠুর নিয়তি—যৌবনের যে মহিমা, ও হৃদয়ের যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তির নাম ইন্দ্রজিৎ, তাহারই হত্যা-কাহিনী বর্ণনা করিতে কবির কল্পনা অশ্রুসাগরে বাড়বাগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে সেই হত্যা যে ভাবে ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, কবির কল্পনা প্রথম হইতেই সকল ঘটন ও অঘটনের মধ্য দিয়া একাগ্র ও অভ্রান্ত ভাবে অগ্রসর হইয়াছিল। দেব-মায়া, দেব-মানবের ষড়যন্ত্র, লক্ষ্মণের মত বীরের বীরধর্ম্মচ্যুতি—এ সকলই এই দৃশ্যে সার্থক পরিণতি লাভ করিয়াছে; এই দৃশ্যের অন্ধকারকে ঘনীভূত করিবার জন্য, ইহার মর্ম্মগত ট্র্যাজেডিকে চকিত বজ্রদীপ্তি দান করিবার জন্য, পূর্ব্বাপর সকল আয়োজন যথাযথ হইয়াছে। রুদ্ধদ্বার যজ্ঞগৃহে লক্ষ্মণের আকস্মিক আবির্ভাবে, মেঘনাদের হৃদয়ে যে ভয়ের সঞ্চার হইল, কবি প্রথমেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। মেঘনাদের মত বীরের হৃদয়ে এই যে ভীতির সঞ্চার, ইহাই এ চরিত্রের চরম দুর্গতি, ইহাতেই ট্র্যাজেডির সূত্রপাত।—

> যথা পথে সহসা হেরিলে
> উর্দ্ধ-ফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
> পথিক—চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
> সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!
> প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে গলিল!
> গ্রাসিল মিহিরে রাহু সহসা আঁধারি
> তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
> পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে!

এখানে কবির কল্পনা মেঘনাদের মৃত্যুর যেন স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছে। তারপর, ক্রমে ক্রমে এ দৃশ্যের যে গাঢ় হইতে গাঢ়তর বর্ণ-বিবর্ত্তন, তাহাতেও সে কল্পনা এতটুকু সত্যভ্রষ্ট হয় নাই। মেঘনাদের সেই নিরস্ত্র অসহায় অবস্থাকে কবি যে ভাবে আমাদের অনুভূতিতে, আঘাতের পর আঘাতে তীব্রতম করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাও কল্পনার দৃঢ়তা ও অব্যর্থতার নিদর্শন। কেবলমাত্র অসীম বাহুবল ও ততোধিক তেজস্বিতার বলে, সে অবস্থাতেও ইন্দ্রজিৎ যাহাকে ক্ষুদ্র কীটের মত দলিত নিষ্পেষিত করিতে পারিত, দৈবী মায়ায় ও বিভীষণের প্রতিবন্ধকতায় সে তাহার কিছুই করিতে পারিল না। তাহার নিক্ষিপ্ত কোষার অতর্কিত আঘাতে

মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণ, যখন পুনরায় চেতন পাইয়া তাহাকে ক্রমাগত শরবিদ্ধ করিতে লাগিল, তখন রক্তাক্ত কলেবরে—

> অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
> শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
> যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে। ···
> কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
> ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
> খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হ'তে
> করপদ্ম-সঞ্চালনে !

সেইক্ষণে, ইন্দ্রজিতের মত বীরের সেই নিশ্চল নিরুপায় মূর্ত্তি—অসীম শক্তিসত্ত্বেও তাহার সেই সর্ব্বশক্তিহত অবস্থা—এ ট্র্যাজেডির পরাকাষ্ঠা। এই অবস্থার সর্ব্বশেষ মুহূর্ত্তও কবির কল্পনাবেশে কি অপূর্ব্ব কাব্যসৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়াছে ! মেঘনাদ তখন চারিদিকে বিভীষিকা দেখিতে লাগিল—

> মায়ার মায়ায় বলী হেরিল চৌদিকে
> ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে,
> শূলহস্তে শূলপাণি , শঙ্খ, চক্র, গদা
> চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
> দেবকুল রথিবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
> বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী—
> নিষ্ফল, হায় রে, মরি, কলাধর যথা
> রাহুগ্রাসে, কিম্বা সিংহ আনায়-মাঝারে !

এই কয়টি পংক্তি পড়িবার সময়ে যেমন চমকিত হই, তেমনই সেই চমকসৃষ্টি কবির একটা কৌশলমাত্র বলিয়া মনে হয় না। ইহাই যেন ঘটিতে বাধ্য ; কাব্যের গভীরতম রস-সত্য ও জীবনের বাস্তব-সত্য এখানে মিলিয়াছে। ইহাকেই উৎকৃষ্ট স্টাইল বলে, মেঘনাদের হত্যাবর্ণনায় মধুসূদনের কল্পনা যথাস্থানে আপন গৌরব রক্ষা করিয়াছে। এই কাহিনীতে কবি মেঘনাদকে 'দেবদৈত্যনরত্রাস' এক অতি-মানুষ বীর-রূপে চিত্রিত করিয়াছেন ; তথাপি তাহার প্রাণ যেমন মানুষের প্রাণ. তেমনই সেই প্রাণ ত্যাগ করিবার সময়ে সে মানুষের মতই মৃত্যুর ভয়ঙ্করত্ব উপলব্ধি করে। আমরা এই দৃশ্যে, প্রথমে মেঘনাদের ভয় ও পরে তাহার অক্ষম অসহায় মূর্ত্তি দেখিয়াছি ; কিন্তু তখনও, আমরা মেঘনাদের অমানুষী শক্তি ও অতি-উদ্ধত পৌরুষের কথা বিস্মৃত হই না। এতক্ষণে, মেঘনাদের সকল মহিমার অন্তরালে তাহার জীবধর্ম্মের দুর্ব্বলতা প্রত্যক্ষ করিয়া—সাধারণ মর্ত্ত্য-নিয়তির বশে তাহার সকল দম্ভের পরাভব দেখিয়া, অতিগভীর মানবীয় সহানুভূতিতে আমাদের

হৃদয় বিগলিত হয়। অতএব, আসন্ন মৃত্যুর মুখে মেঘনাদের এই যে বিভীষিকাদর্শন—চরিত্র, ঘটনা ও অবস্থানের পক্ষে ইহা অবশ্যম্ভাবী; ইহা না হইলে কবির কল্পনা সত্যভ্রষ্ট হইত। বাস্তবের দিক দিয়াও ইহা অতিশয় স্বাভাবিক। এ কাব্যের ভাবমণ্ডলের সঙ্গে এ-জাতীয় বিভীষিকার সম্বন্ধ যেমন সহজ—তেমনই, বিস্ময়বিমূঢ়তা, ভয়, নিষ্ফল চেষ্টার অবসাদ, ও পরিশেষে রক্তক্ষয়-জনিত দুর্ব্বলতার ফলে, এ শুধুই 'মায়ার মায়ায়' নহে—মানুষ বলিয়াই, মেঘনাদের এই মস্তিষ্ক-বিকার অনিবার্য্য। এই বাস্তবকে বরণ করিয়াই মেঘনাদের জীবনের ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণ হইয়াছে; কবির কল্পনাও এই বাস্তবকে আশ্রয় করিয়া বৃহত্তর রস-সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মেঘনাদের মৃত্যু-কাহিনীর শেষ কয় পংক্তিও এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য।—

এতেক কহি, বিষাদে সুমতি,
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা বীর স্মরি প্রমীলারে—
চিরানন্দ। লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

শেষ কয়টি চরণের যতি-মন্থর গতি, সংক্ষিপ্ত উপমা, ও চকিত পরিসমাপ্তিতে যে মৌন-গভীর ভাব-গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, কবি যেন সর্ব্বশেষে মেঘনাদের মৃতদেহের উপরে এক দৃঢ়স্তম্ভ উন্নতচূড়া সমাধিসৌধ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

ইহাই মেঘনাদের মৃত্যু—"death of my favourite Indrajit". তথাপি, কাহিনীর এই অংশে, ঘটনা অপেক্ষা বক্তৃতা ও বিতর্কের পরিমাণ অধিক হইলেও, এবং কবির পক্ষে ভাবাতিরেকের বিপদ থাকা সত্ত্বেও, আশ্চর্য্য লিপিসংযমের পরিচয় আছে। ষষ্ঠ সর্গের কোথায়ও, বিশেষত এই দৃশ্যের বর্ণনায়, এতটুকু অতিরিক্ত কাব্য-বিলাস নাই; যজ্ঞগৃহে লক্ষ্মণের প্রবেশ হইতে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু পর্য্যন্ত, কবি যেন—to guide the whirlwind and ride the storm—তাঁহার লেখনীকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দৃঢ়াসনে বসিয়াছেন। এইখানে, শ্রেষ্ঠ ক্ল্যাসিক কাব্যগুলির সহিত মধুসূদনের যে আবাল্য পরিচয়, ও তাহার ফলে, কাব্যের যে আদর্শ, ও রচনার যে রীতি তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা বড়ই কাজে লাগিয়াছে। আমি পূর্ব্বে

বলিয়াছি, এ কাব্যে মেঘনাদ-ঘটিত যাহা কিছু, তাহাতে কবিকল্পনার একটি যে সরলতা ও স্বচ্ছতা আছে, তাহাই ক্ল্যাসিক্যাল প্রবৃত্তির লক্ষণ। মেঘনাদের চরিত্র-চিত্রে বা জীবনের কাহিনী-বর্ণনায়, কবি যেমন কোথায়ও নিছক কাব্য-কলার অনুরোধে বাগ্‌বিস্তার করেন নাই—বরং মেঘনাদকে আমরা এ কাব্যে, কেবল এই পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গেই, বেশিক্ষণ ও বিশেষ করিয়া পাই—তেমনই, তাহার এই মৃত্যুর বর্ণনায় কবি একটি সুসংযত পারিপাট্য রক্ষা করিয়াছেন। কল্পনার এই গুণে, কাব্যের এই মুখ্য ঘটনাও বর্ণনার বাহুল্যদোষে দুষ্ট হয় নাই; ইহার তুলনায় লক্ষ্মণের প্রতি রাবণের শক্তিশেল-নিক্ষেপের কাহিনী এমনই ঘনঘটাময়ী যে, সেই যুদ্ধবর্ণনার সর্গ, অর্থাৎ সপ্তম সর্গই, সেকালের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মতে, এ কাব্যের শ্রেষ্ঠ সর্গ। ষষ্ঠ সর্গের এই হত্যাদৃশ্য, ঘটনার ঘনঘটায় চমকপ্রদ না হইলেও, অন্তর ও বাহিরের দ্রুতপরিবর্ত্তমান ভাবচিত্রের মধ্য দিয়া অনিবার্য্য বেগে পূর্ণসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। তথাপি এই দৃশ্য এ সর্গের প্রায় অর্দ্ধেক অধিকার করিয়া আছে, যদিও এখানে ঘটনাকে দীর্ঘ করিবার কোন উপায়ই নাই; কারণ, লক্ষ্মণ যে ভাবে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে তাহাতে, নিদ্রিত ব্যক্তিকে হত্যা করার মত, একটি আঘাতেই এ ঘটনা শেষ হইবার কথা। এইজন্যই, কবি এই অতি-সংকীর্ণ ঘটনাবস্তুকে যতখানি প্রসারিত করিয়াছেন, তাহাতে অবান্তর বিষয়-সন্নিবেশের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু কবির কল্পনা একটি অতি সহজ কৌশলে সেই গুরুতর সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়াছে—ঘটনাটিকে দীর্ঘ করিতে গিয়া এতটুকু অবান্তর বা অতিবিস্তার-দোষ ঘটে নাই। বিভীষণের সহিত বাক্যবিনিময়ের যে অবকাশ, তাহাতেই ইন্দ্রজিতের আয়ুষ্কাল কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে, এবং এই অবকাশের সৃষ্টি হইয়াছে—লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের অতর্কিত প্রহারে কিছুকাল মূর্চ্ছাহত রাখিয়া। এই কথোপকথনের জন্য পাঠকের মনে কিছুমাত্র অধৈর্য্য ঘটে না, বরং তাহাতে যে নিদারুণ প্রতীক্ষার ভাব জাগে, তাহাতেই এ দৃশ্য আরও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে। তারপর, ক্ষণ-স্তম্ভিত বজ্র যখন এই রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ঘটনার অবসান করিয়া দেয়, তখন পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়। এদিক দিয়াও কবির কল্পনাচাতুর্য্য কম বিস্ময়কর নহে।

এই সময়ে বন্ধুকে লিখিত কবির একখানি পত্রে জানা যায় যে, এই সর্গ-রচনাকালে কবি কয়েকদিন অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়েন; কিন্তু তখন তাঁহার

মস্তিষ্কে মেঘনাদ পূরা ভর করিয়াছে, এ সর্গ শেষ করিবার জন্য তিনি অধীর হইয়াছেন। কবি বন্ধুকে লিখিতেছেন—

A few hours after we parted, I got a severe attack of fever and was laid up for for six or seven days. It was a struggle whether Meghnad will finish me or I finish him. Thank Heaven, I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the VI Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him.

পত্রের এই পরিহাসোক্তির মধ্যেও কবির প্রবল হৃদয়াবেগ ব্যক্ত হইয়াছে—'মেঘনাদ মরিয়াছে, তাহার অর্থ—ষষ্ঠ সর্গ শেষ করিতে প্রায় ৭৫০ লাইন লাগিয়াছে। তাহাকে মারিতে আমি বড় কান্না কাঁদিয়াছি।' এই পত্রে, কাব্যরচনার অন্তরালে কবিহৃদয়ের যে অবস্থার কথা আছে, তাহা সত্য। কিন্তু এই আবেগ কবিকেই পীড়িত করিয়াছে, কাব্যকে করে নাই—করিলে এমন গাঢ়-শ্রী ও সুসংযত রচনা আমরা লাভ করিতাম না। কবির যাহা ক্লেশ তাহা প্রকৃতপক্ষে ক্লেশ নহে, এ আবেগের মূলে আছে সৃষ্টিপ্রেরণার পীড়া। যে ভাব-বস্তু তাঁহার অন্তরের মূলে বিদ্ধ হইয়া আছে, ইহা—তাহাকেই উৎপাটিত করিয়া, কাব্যের আকারে প্রকাশ করিয়া, সুস্থ হইবার—প্রাণপণ চেষ্টা। এ সময়ে হঠাৎ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ারও বোধ হয় কারণ ছিল; মধুসূদনের মত কবির পক্ষে, এইরূপ কাব্যরচনাকালে, ভাবাবস্থার ক্রমিক উত্তেজনায় এইরূপ একটা অসুস্থতা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়—বিশেষত, যখন মেঘনাদের মৃত্যুবর্ণনাই তাঁহার কাব্যের স্ব-নির্দ্ধারিত উচ্চতম শিখর, এবং এক্ষণে সেই শিখর লঙ্ঘন করিবার দুরূহ সাধনায় তাঁহার কবি-মন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।

মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রসঙ্গে আমি মেঘনাদ-চরিত্র ও মেঘনাদবধ-সর্গের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিলাম; সমগ্র কাব্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়; তথাপি আমি কাব্যের এই অংশের কল্পনা ও কাহিনীগত গুরুত্ব-বিবেচনায় ইহাকেই অবলম্বন করিয়া, মধুসূদনের কবিশক্তির দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিলাম। এ প্রবন্ধের আরম্ভে আমি, মেঘনাদ-চরিত্র যে কোন্ অর্থে এ কাব্যের আদি-প্রেরণা বা ভাবোদ্দীপনার হেতু হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি। গভীরতর অর্থে, এ কাব্যের নায়ক রাবণ, কিন্তু কাব্যের বহিরঙ্গ-বিচারে এবং আরও কতকগুলি কারণে, মেঘনাদও নায়কত্ব দাবি করিতেছে—এই নায়ক-দ্বন্দ্বের কারণ, এবং ঐ দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও কেন যে কল্পনার সমগ্রতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, সে আলোচনাও করিয়াছি।

এ কাব্যের কল্পনায় কবিপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের কথাও বলিয়াছি। ক্ল্যাসিক্যাল কাব্যের আদর্শই মধুসূদনের কবি-মানসে আধিপত্য করিয়াছিল—অথচ ব্যক্তি-জীবনের গূঢ়তর চেতনায় তিনি একজন রোমান্টিক। কবির সেই দুই প্রবৃত্তিই রাবণ ও মেঘনাদ-চরিত্রে পাশাপাশি রহিয়াছে। রাবণের চরিত্রে কবির সেই আত্ম-প্রতিকৃতির আভাস আছে, যাহাকে ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় 'Romantic self-representation' বা 'Imaginative self-identification' বলা যাইতে পারে। রাবণ যেন কবিরই নাভি-নালের উপরে পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার চেতনার তলদেশ হইতে যত কিছু উৎকণ্ঠা ইহাতেই মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছে। মেঘনাদ যেন সেই পদ্মের মধ্যশোভী কামনা-ভ্রমর; কিন্তু সেই বেদনা-কমলের বিষ-মধু তাহার সহ্য হইল না, তাই সে মরিয়া গেল। মেঘনাদ যেন কবিকল্পনার সহজ সুস্থ দিবালোক—প্রাণের স্বাস্থ্য ও মনের অকপট বিশ্বাসে সে জীবন সমুজ্জ্বল। রাবণ মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দিবা—তাহাতে প্রাণের স্বাস্থ্যহানি ও মনের বিশ্বাস-ভঙ্গই প্রকট। সমগ্র 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' এই রূপকের ছায়া স্পষ্ট ও ঘনীভূত হইয়া আছে; এবং ইহা হইতেই এ কাব্যে—কবিকল্পনার দ্বৈধ, সে কল্পনার সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান ক্রিয়া, কাব্যে ক্ল্যাসিক্যাল ও রোমান্টিক প্রবৃত্তির যুগ্মধারা, এবং দ্বি-নায়কত্বের আভাস—বুঝিয়া লইতে হইবে। কিন্তু ইহার কোনটির জন্যই কাব্যের রূপ-সমগ্রতা বা কল্পনার মূলগত ঐক্যের বিঘ্ন ঘটে নাই। তাহার কারণ, এ কাব্যের কল্পনায় কবির সমগ্র সত্তা সাড়া দিয়াছে—ইহাই Imagination; বা খাঁটি কবিশক্তির লক্ষণ; কারণ—"Imagination is an act of the whole being"। তাই উৎকৃষ্ট কবিকল্পনায় সকল বিরোধ, সকল জটিলতা—সমগ্রতার এক-রসে সমাহিত হইয়া কাব্যকে আরও গভীর ও রসাত্মক করিয়া তোলে। কবির সেই আত্ম-সত্তাই যে এ কাব্যের কল্পনা-বিস্তারে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত হইয়া আছে, আশা করি এ আলোচনায় তাহার কিছু প্রমাণ দিতে পারিয়াছি।

সপ্তম অধ্যায়

মেঘনাদবধ-কাব্যের নারী-চরিত্র; চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরী; প্রমীলা—প্রেমের নূতন আদর্শ; সীতা—অপর আদর্শ।

এইবার আমরা এ কাব্যের কল্পনা ও কবিশক্তির আর এক দিক লক্ষ্য করিব; কবিমানসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা—স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল, দেব-দেবী ও মনুষ্যবীরের কাহিনীরচনার যে আগ্রহ—তাহারই সঙ্গে, কবিপ্রাণের অতিশয় পরিচিত ঘনিষ্ঠ বস্তুর রসরূপকে এই ঘনঘটাময়ী কাব্য-প্রদর্শনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিবার যে সফল প্রয়াস—তাহার কথা বলিব, অর্থাৎ 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র নারীচরিত্রগুলির প্রতি আমাদের বিস্ময়-দৃষ্টির কারণ আলোচনা করিব। এবার আমাদিগকে ভুলিতে হইবে যে, আমরা এক পৌরাণিক-আখ্যানঘটিত মহাকাব্য পড়িতেছি—উত্তাল সাগর-তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে জলকল্লোল অথবা ঝটিকার ভেরী-রব শুনিতেছি। সত্যকার কবিদৃষ্টির মূলে বাস্তবের রসপ্রেরণা থাকিবেই—যদি সে প্রতিভা সৃষ্টি-প্রতিভা হয়; তাই, অতি ঊর্দ্ধগ কল্পনার সার্ব্বভৌমিকতার মধ্যেও কবির স্বকীয় ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা, জাতি ও জন্মগত ভাব-সংস্কার লুপ্ত হয় না; তাহা হইলে কবির সৃষ্টি-কর্ম্ম অমূলক হইয়া থাকে। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কল্পনায় কবি যেন আপনাকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; যেন তিনি কল্পনার সত্য ছাড়া আর কোন সত্য মানিবেন না—রামায়ণের কাহিনীকে আপনার কবিপ্রবৃত্তির বশে আনিবার জন্য, তিনি যেন কোন সংস্কারকে মনে স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন; যেন একমাত্র কাব্যের অধিকারকেই বিস্তৃত করিবার জন্য তিনি এক প্রশস্ত পটভূমিকার উপরে, রাজা ও রাজ-ঐশ্বর্য্য, বীরধর্ম্ম ও বীরকীর্ত্তি, বিপুল উদ্যম ও দারুণ ব্যর্থতার মহনীয় চিত্র অঙ্কিত করিবার উৎসাহে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু সে কল্পনারও অন্তস্তলে—পার্ব্বত্য মহারণ্যের দিগন্ত-প্রসারী শাখা-প্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে জলজ কুসুম-শোভার মত—বাস্তবজীবনের সরস সহজ সুষমার প্রতি অনুরাগ উঁকি দিয়াছে; রাবণের স্বর্ণালঙ্কার মণিমাণিক্য-কঠিন আস্তরণ ভেদ করিয়া বঙ্গমৃত্তিকার সরস শ্যামল কুঞ্জবিতান স্বচ্ছন্দে ও সহাস্যে আপনার কোমল তনু-লতিকা উচ্ছ্রিত করিয়াছে। মধুসূদন তাঁহার দুরারোহিণী কল্পনাকেও এই মৃত্তিকার মোহ ত্যাগ করাইতে পারেন নাই, বরং তাহাকে অসঙ্কোচে প্রশ্রয় দিয়াছেন। তাঁহার চক্ষে, যেন নারীমাত্রেই বঙ্গনারী—

শিশুর চক্ষে যেমন সকল নারীই তাহার মা, তেমনই 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' যেখানেই নারীর সাক্ষাৎ পাই, সেখানেই দেখি, কবির কল্পনা, চরিত্র-চিত্রণে বা রূপ-বর্ণনে, তাহার নিজের ঘরের প্রতিমাগুলিকে ছাড়িয়া এক পাও বাহিরে অগ্রসর হইবে না, সে জন্য সময়ে সময়ে আমাদেরও লজ্জা হয়। লঙ্কার পুর-নারীদের বর্ণনায়, কবি বাংলাদেশেরও বাহিরে যাইতে রাজি নহেন—যদিও তিনি বহুকাল দক্ষিণ-ভারতে বাস করিয়াছিলেন—নহিলে, তাহাদেরও কক্ষে কলস দেখিবেন কেন?—

রাক্ষসবধূ মৃগাক্ষীগঞ্জিনী
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ কলসী কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি!

সরমাও সীতাকে সিঁদূর পরাইবার আগে যাহা বলিতেছে, তাহা ভারতের আর কোন দেশের এক সধবা আর এক সধবাকে নিশ্চয় বলে না—

আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর, করিলে আজ্ঞা সুন্দর ললাটে
দিব ফোটা। এয়ো তুমি তোমার কি সাজে
এ বেশ!

—'এয়ো তুমি'—রাক্ষসবধূ সরমার কথাই বটে। সীতাও একেবারে খাঁটি বঙ্গবধূ, পূর্ব্বকথা বলিবার সময়ে এক স্থানে সরমাকে বলিতেছেন—

আবরি বদন আমি ঘোমটায় সখি,
করপুটে কহিনু,...

—এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু বাহিরের এই রূপ, বেশবাস ও আচারের বর্ণনাতেই নয়, এ কাব্যের যে কয়টি প্রধান নারী-চরিত্র—এমন কি, এ কাব্যের নায়িকা বীরাঙ্গনা প্রমীলাও, চরিত্রের মাধুর্য্যে ও মহিমায় খাঁটি বঙ্গনারী। মধুসূদন মাতৃভাষায় কাব্য লিখিতে বসিয়া যেন তাঁহার নিজের মাতৃজাতিরও বন্দনা করিয়াছেন; বস্তুত, এ কাব্যে যে মানবতার নিগূঢ় প্রেরণা অপর সকল বাসনাকে পরাভূত করিয়াছে, তাহারও একটা কারণ ইহাই বলিয়া মনে হয়। তাই হোমারের বীর-গাথা ও মিল্‌টনের অমর্ত্ত্য-গীতরাগ তাঁহাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিলেও তিনি সে প্রলোভন দমন করিয়াছিলেন; এবং এইজন্যই সর্ব্ববিধ বিজাতীয় ভাব ও আলঙ্কারিকতা সত্ত্বেও, 'মেঘনাদবধ-কাব্য' খাঁটি বাংলাকাব্য হইয়াছে; ভাবে যেমন বীররসকে ছাপাইয়া করুণরসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে,

ভাষাতেও তেমনই সুগম্ভীর সংস্কৃত সাধুশব্দকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, যেখানে সেখানে খাঁটি মাতৃভাষার অসংস্কৃত বুলি তাহাদের পাশে আসিয়া বসিয়াছে,—অতিশয় গম্ভীর বাক্যধ্বনির নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে কবির প্রাণ যেন স্বস্তি পাইতেছে না। কল্পনার উত্তুঙ্গ নির্জ্জন শিখর হইতে নামিয়া তিনি যেন নিম্ন-ভূমির শষ্পশ্যামল তটিনীতটে—যেখানে হৃদয়-যমুনার তল-তল ছল-ছল বারি-রাশিতে নরনারীর গাহন, সন্তরণ ও নিমজ্জন-লীলা চলিতেছে—সেইখানে বিচরণ করিতেই উৎসুক। কবি নিজেই তাঁহার পত্রাবলীর এক স্থানে লিখিতেছেন—

He who is beautiful, tender and pathetic with a dash of sublimity is sure to float down the stream of time in triumph.

সেই সঙ্গে মিল্‌টনের মহাকাব্য সম্বন্ধে বলিতেছেন—

He is full of lofty thoughts, but has little or nothing that can be called amiable. * * * His is the deep roar of the lion in the silent solitude of the forest.

এই কথাগুলিতেই 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কাব্য-প্রকৃতির সঠিক পরিচয় আছে। Beautiful, tender and pathetic—এইগুলিই আসল; কেবল, তাহার সহিত sublimity বা ভাবগাম্ভীর্য্য চাই; প্রথম কয়টিতেই মূল রস, শেষেরটি তাহাদিগকে উজ্জ্বল করিবার উপায় মাত্র। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কাহিনীর ঘনঘটা ও বর্ণনার বিপুল আয়োজন, যেন মেঘচুম্বী পর্ব্বতমালার মত, ভাবের একটি করুণ-কোমল স্বচ্ছ-সুন্দর কমল-হ্রদকে বেষ্টন করিয়া আছে। এ কাব্যে যাহা কিছু beautiful, tender and pathetic, তাহার আলম্বন হইয়াছে এই নারীচরিত্রগুলি—সেই মীলিত ও মুদিত কমলদলের শোভা ও সৌরভে মুগ্ধ হইয়া, কবির কল্পনা-মধুকরী স্বচ্ছন্দে ও পূর্ণতানে গুঞ্জন করিয়াছে। আমরা অতঃপর এই গুঞ্জনের গীতি-কৌশল একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

এ কাব্যের নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে সীতা ও প্রমীলাই প্রধান, এবং সাধারণতঃ এই দুইটিই কবির কবিশক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এরূপ ধারণা যথার্থ বটে; কিন্তু, রসনা-রস-বিচারে আমরা যেমন প্রচুর মশলা-সুগন্ধি ঘৃতপক্ক মূল্যবান ভোজ্য এবং পায়স-পিষ্টককেই পাকশিল্পের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করি, এবং অতি সহজেই তাহার প্রশংসা করিয়া থাকি,—কিন্তু তাহারই সঙ্গে অপর যে দুইচারিটি অতি সুলভ তুচ্ছদর্শন বস্তুও থাকে, তাহার প্রতি তেমন মনোযোগ করি না; অথচ সেই সুলভ ও স্বল্প উপকরণে প্রস্তুত ব্যঞ্জনের মৃদু ও

বিশিষ্ট স্বাদই যে প্রকৃত পাকনৈপুণ্যের পরিচায়ক, তাহা বুঝিবার অবকাশ প্রায়ই হয় না;—তেমনই, কল্পনার উচ্চতা ও বিষয়-বস্তুর অসাধারণত্বে মুগ্ধ আমাদের মন, সূক্ষ্মতর সৃষ্টিকে সুলভ ও সাধারণ ভাবিয়া তাহার তেমন আদর করে না। 'মেঘনাদবধ-কাব্য' হইতেই আমি তাহার প্রমাণ দিব। সে কাব্যের সীতা ও প্রমীলা, এই দুই মহত্তর সৃষ্টির আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, আমি দুইটি ক্ষুদ্রতর সৃষ্টি—রাবণের দুই মহিষী, চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরীর—চরিত্র-চিত্রণে কবির নৈপুণ্যের পরিচয় দিব।

চিত্রাঙ্গদাকে আমরা কাব্যে একবার মাত্র দেখিতে পাই, সেই একবারের যে দেখা তাহাতেই চিত্রাঙ্গদার সেই মূর্ত্তি আকস্মিক বিদ্যুৎদ্দীপ্তির মত আমাদের নেত্রপটে মুদ্রিত হইয়া যায়। রাবণের বিরাট রাজসভা-মধ্যে পুত্রশোকাতুরা রোরুদ্যমানা বীরবাহু-জননী সখীগণ সঙ্গে প্রবেশ করিল। সেই অবস্থাতেও কবি তাহার যে রূপলাবণ্যের আভাস দিয়াছেন, তাহাতে বুঝি, সে রাবণের মহিষী হইলেও এখনও বিগতযৌবনা নহে।—

আলুথালু হায় এবে কবরীবন্ধন!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতনহীন বন-সুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন!......

এই চিত্রাঙ্গদা রাবণের একাধিক মহিষীর একজন, এবং রাবণের সহিত তাহার বয়সের ব্যবধানও অল্প নহে। বহুপত্নীক স্বামীর প্রতি এরূপ পত্নীর যেরূপ মনোভাব হইয়া থাকে, তাহা আমরা জানি। আজ রাবণের মত পুরুষের সম্মুখে এই অতিশয় অসমবয়সী স্নেহানুগ্রহধন্যা নারীর সেই অভ্যস্ত আচরণও বিচলিত হইয়াছে। স্বামী নয়—পুত্রই ছিল যাহার একমাত্র আপন বস্তু, আজ সেই পুত্রের বিয়োগে তাহার অন্তর ও বাহিরের সকল আব্রু যেন খসিয়া গিয়াছে। পুত্রশোকে অধীর হইলেও রাবণ সিংহাসনে রাজমহিমায় আসীন, সেই সিংহাসনের তলে দীন প্রজার মত দাঁড়াইয়া চিত্রাঙ্গদার এই যে অভিযোগ—

একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়, দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে রক্ষঃকুলমণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবক যেমতি

পাখী। কহ কোথা রেখেছ তাহারে
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্রধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর, কহ কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?

—তাহাতে চিত্রাঙ্গদার শুধুই শোক নয়, তাহার সমগ্র জীবন—স্বামীর সহিত তাহার সম্পর্ক, তাহার অসহায় একক অবস্থার দুঃখ, মুহূর্ত্তে আমাদের হৃদয়গোচর হয়। রাবণের বিশাল পুরীতে এই অবহেলিতা নারীর একটি মাত্র সম্বল ছিল—তাহার সেই পুত্র। রাবণের সুখ-দুঃখ তাহার সুখ-দুঃখ নয়—পুত্রের মৃত্যুতে তাহার যাহা হইয়াছে, তাহাতে স্বামীর সহিত ব্যবধান কিছুমাত্র ঘুচে নাই। তাই, রাবণ যখন বলিয়া উঠে—

এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে।
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি।

তখনও সে স্বামীকে সমদুঃখে দুঃখী মনে করেন না, বরং ইহাই ভাবিয়া আরও অধীর হয় যে, শতপুত্র যাহার—একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোক সে বুঝিবে কেমন করিয়া? সে সত্যকার রাজমহিষী নয়—রাজ্যের মঙ্গল অমঙ্গল সে বোঝে না, রাবণের ভাবনার অংশভাগিনী সে নয়; তাই দেশরক্ষার্থে বীরপুত্র প্রাণ দিয়াছে, এ সান্ত্বনা তাহার সান্ত্বনা নয়। নিজের পুত্রহানির মর্ম্মান্তিক ক্ষোভে, রাবণের উপস্থিত বিপদ তাহাকে কিছুমাত্র ব্যাকুল করে না; রাবণের শোকেও তাহার সহানুভূতি নাই। যাহার জন্য তাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, সেই রাবণের কোনও সান্ত্বনা-বাক্যে সে আশ্বস্ত হইবে না; রাবণের পাপকেই সে বড় করিয়া দেখিতেছে। বিধাতার ন্যায়দণ্ডকে বুক পাতিয়া লইবার মত ধীরতা, কিম্বা তাহার আঘাতে পাপীর যে যন্ত্রণা, তাহা নিজেরও বক্ষে অনুভব করিবার মত প্রেম—কোনটাই তাহার নাই। তাই শোকে মুহ্যমানা বিবশা রাবণ-বধূর অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডলে যেন বিধাতার রোষানলকেই প্রদীপ্ত হইতে দেখি; যখন তাহার মুখে এই জ্বালাময় বাক্যস্রোত বহির্গত হয়—

কিন্তু ভেবে দেখ নাথ, কোথা লঙ্কা তব,
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে

রাঘব ? এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে, ইহার চৌদিকে
রজতপ্রাচীর-সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈম সিংহাসন আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশ-রিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশির, কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, উর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলে আপনি।

—তখন জীবনের একটা মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুরতা, এবং নারী-পুরুষঘটিত সংসার-নাট্যের একটি নিদারুণ পরিহাস-রস যেমন আমাদিগকে অভিভূত করে, তেমনই এই একটি মাত্র দৃশ্যের অতি ক্ষুদ্র পরিসরে, একটি নারীর জীবন ও চরিত্র অতি গভীর রেখায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে; রাজগৃহবন্দিনী রূপসী চিত্রাঙ্গদার দুঃখ ও অভিমান, স্বামীস্নেহবঞ্চিতা পুত্রহারা রমণীর নৈরাশ্যপীড়িত তেজস্বিনী-মূর্ত্তি—তাহার সেই অশ্রুপ্লাবিত করুণ-সুন্দর চক্ষে আহত নারী-হৃদয়ের বহির্বিভাস—আমাদের মানসপটে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

এই চরিত্রের পাশে মন্দোদরীকে দাঁড় করাইলে, উভয় চরিত্র, মর্ম্মর-শিল্পীর মূর্ত্তি-রচনার মত, আকারে, আয়তনে ও ডৌলে বিলক্ষণ ও সুপরিচ্ছিন্ন হইয়া উঠে। মন্দোদরী রাবণের জ্যেষ্ঠা মহিষী, পাটরাণী; সে তাহার সহধর্ম্মিণী—ধর্ম্মসাধন ভার্য্যা। মন্দোদরী শুধুই পুত্রের জননী নয়, রাবণের গৃহিণী; সমস্ত রাক্ষস পুরী ও রাক্ষস-পরিবারের কল্যাণ-চিন্তা, রাজ্যের শুভাশুভ, স্বামীর সম্পদ-বিপদের ভাবনা তাহাকে ভর্ত্রিণীযোগ্য গুরুভার মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছে। রাবণ যেমন লঙ্কেশ্বর, সেও তেমনই লঙ্কেশ্বরী। মন্দোদরীর মূর্ত্তিও পূর্ণ মাতৃত্বের মূর্ত্তি, তাহার বাৎসল্য সহজ শান্ত ও আত্মতৃপ্ত। পুত্রের কল্যাণ-কামনায় শিবের আরাধনা করিয়া মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে—এই অবস্থায় মন্দোদরীর সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ, এবং মেঘনাদ যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে মাতৃপদ বন্দনা করিয়া বিদায় লইতে আসিয়াছে, ইহাই তাহার উপলক্ষ্য। পুত্র ও পুত্রবধূর শিরশ্চুম্বন করিয়া সে যখন তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিল, মন্দোদরীর তখনকার সেই রূপ

কবি কেবল একটিমাত্র উপমায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার রূপের আর কোন বর্ণনা কবি করেন নাই। সে কেমন রূপ ?—

> শরদিন্দু পুত্র, বধূ শারদ কৌমুদী,
> তারাকিরীটিনী-নিশিসদৃশী আপনি
> রাক্ষসকুল-ঈশ্বরী !

—এ উপমার আলঙ্কারিক মৌলিকতা যেমনই হউক, এ চিত্রে তাহার যে ধ্বনিব্যঞ্জনা ঘটিয়াছে, মাতৃত্বের যে বিশাল গম্ভীর মহনীয়তা—সেই স্নেহের যে উদার মধুর রহস্যময়তা ইহাতে সূচিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় এই উপমার এমন সার্থক প্রয়োগ আর কোথায়ও হইতে পারিত না। চিত্রাঙ্গদা শোকার্ত্ত জননী হইলেও তাহার রূপে নায়িকার লক্ষণ আছে। এ রূপ 'তারাকিরীটিনীনিশিসদৃশী'—কালিদাসের 'স্ফুটচন্দ্রতারকা বিভাবরী' নয় ; কারণ, ইহার যৌবন—ইহার চন্দ্র ও জ্যোৎস্না—এক্ষণে পুত্র ও পুত্রবধূতে বর্ত্তিয়াছে। মন্দোদরীর এখন সেই বয়স, যে বয়সে জননীরূপিণী নারী কেবল মাতৃত্বের সুখে ও গৌরবে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত—যেন তাহার পাইবার আর কিছুই নাই, এখন কেবল দিবার পালা আসিয়াছে, স্বামীর নিকটেও আর কোন স্বার্থের দাবি নাই। এই মন্দোদরী-চরিত্রে কবি সেকালের খাঁটি বাঙালী-মায়ের ছবি আঁকিয়াছেন—একেবারে বাঙালীর মা। স্নেহের নির্ব্বুদ্ধিতায়, বয়স্ক পুত্রের বুদ্ধি ও শক্তির উপরে নিরতিশয় শ্রদ্ধায়, তাহার দুঃসাহসের জন্য একই কালে গর্ব্ববোধ ও আশঙ্কায়, পুত্রের বিপদ ঘটাইয়াছে বলিয়া জগৎশুদ্ধ সকলের উপর দোষারোপে, এবং ব্রত-উপবাস দ্বারা সেই বিপদ কাটাইবার জন্য আহারনিদ্রাত্যাগে—এ চরিত্র মধুসূদনের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। মন্দোদরী মেঘনাদকে বলিতেছে—

> দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর, কালসর্প সম
> দয়াশূন্য বিভীষণ ! * *
> কুক্ষণে, বাছা, নিকষা-শাশুড়ী
> ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে !
> এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি।
> হায়, বিধি, কেন না মরিল
> কুলক্ষণা শূর্পনখা মায়ের উদরে ?

—'এ কনক-লঙ্কা মোর'—এখানে মন্দোদরীর মুখে এই একটি কথা 'মোর' সমগ্র লঙ্কাপুরীর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ—শুধুই কর্ত্তৃত্বের নয়, তাহার মমত্বের অধিকার—ব্যক্ত করিয়াছে ; এমন কথা চিত্রাঙ্গদার মুখে কখনও আসিত না। চিত্রাঙ্গদার

মাতৃস্নেহও এমন অবুঝ নয়, সে প্রখরবুদ্ধিমতী ; অথবা, সে স্বামীস্নেহে এত অন্ধ নয় যে, লঙ্কার সর্ব্বনাশের জন্য রাবণ ছাড়া আর কাহাকেও দায়ী করিবে। একজন সংসারকে বুকে জড়াইয়া এবং আপনাকেও সেই সংসারে বিলাইয়া দিয়া, স্নেহ ও প্রেমের দাবি ছাড়া আর কিছুই জানে না। আর এক জনের আত্ম-সচেতনতা এখনও অটুট ; বিবেক ও বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যে, সে চরিত্র আপনাকে হারায় না—প্রেম বা স্নেহের আত্মবিগলিত অবস্থার গদগদ-ভাষ বা প্রলাপ-বাণী তাহার পক্ষে অসম্ভব। এমন মাকে ভয় পাওয়ানো বা আশ্বস্ত করা দুইই সহজ, তাই মায়ের প্রাণ যখন আসন্ন পুত্রবিয়োগ-ঘটনা যেন অজ্ঞাতে জানিয়াই অধীর হইয়াছে মেঘনাদ যাহা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—

কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ মা আমারে ?

এবং মন্দোদরী তাহার আর কোন কারণ দেখাইতে না পারিয়া বলিতেছে—

মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত !
নাগপাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে
কে খুলিল সে বন্ধন ? কে বা বাঁচাইল
নিশা-রণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে ? এ সব আমি পারি না বুঝিতে !

—তখন মেঘনাদ তাহার ভয় দূর করিতে না পারিয়া শেষে বড় বুদ্ধি করিয়া বলিল—

বিখ্যাত রাক্ষসকুল, দেবদৈত্য নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি ! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময় ? রথী যত
মাতুল ?

মেঘনাদ জানে—'রাবণি ইন্দ্রজিৎ' এবং 'মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়, রথী যত মাতুল'—এক সঙ্গে এই দুই বাক্য এ ক্ষেত্রে কত অমোঘ। পতিগতপ্রাণা নারীর পক্ষে পতিকুলমর্য্যাদা পিতৃকুলমর্য্যাদার চেয়ে অধিক ; আবার, পিতার নিকটে কন্যার বীরপুত্রবতী হওয়ার গর্ব্বও কম নয়। তা ছাড়া, 'রাবণি ইন্দ্রজিতে'র প্রতি কটাক্ষ করিবে তাঁহার পিতৃকুল ! মন্দোদরীর মাতৃত্ব ও পত্নীত্ব এই দুইয়েরই সম্পূর্ণ চিত্র এখানে কত সংক্ষেপে অঙ্কিত হইয়াছে ! কিন্তু এই দৃশ্যের সর্ব্বশেষে কবি মন্দোদরীর

মুখে যে কথাটি দিয়াছেন, তাহাতেই এই মাতৃচরিত্রের—মাতৃহৃদয়ের—চিত্র যেন শেষ রেখায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। পুত্র যখন যাইবেই, তখন—

কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে,—
"থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইব
ও বিধুবদন হেরি এ পোড়া পরাণ !
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।

—কবি এখানে পুত্রস্নেহাতুরা জননীর মর্ম্মস্থল উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী সর্গে মন্দোদরীর এই মাতৃত্বের সহিত পত্নীত্বের যে অপূর্ব্ব মিলন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও বর্ণনা নাই, বক্তৃতা নাই। পুত্র মেঘনাদের মৃত্যুতে তাহার যে শোক, তাহা স্বামী রাবণের শোকের সহিত মিলিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া আছে। সে শোক চিত্রাঙ্গদার শোকের মত একার শোক নয়, তাই তাহা একেবারে সান্ত্বনাতীত নহে; এবং তাহাতে কাহারও প্রতি অভিযোগের মর্ম্মদাহ নাই বলিয়া তাহা নির্ব্বাক। যখন শোকে অধীর হইয়া "রণমদে মত্ত সাজে রক্ষকুলপতি", তখন "সভাতলে উতরিলা রাণী মন্দোদরী * * * রাজপদে পড়িলা মহিষী"। মন্দোদরী আর কিছুই করিল না—এ যেন সেই দারুণ শোকে হৃদয়ের আশ্রয় প্রার্থনা। তারপরেও আর কিছুই নয়; রাবণের মুখে তাহার হৃদয়বিদারক মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া রাণী যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন, সখীরা ধরাধরি করিয়া দেবীকে অবরোধে লইয়া গেল। প্রথম সর্গের চিত্রাঙ্গদা ও রাবণ-সংবাদ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে পুত্রই যেন পতি-পত্নীর মিলিত হৃদয়বৃন্তের ফুল, সে ফুল বৃন্তচ্যুত হইলে কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবে? অথবা, পুত্রশোকের বজ্রালোকে দম্পতি যেন আজ আর একবার নূতন করিয়া, আরও গভীর স্নেহে, পরস্পরের মুখাবলোকন করিল—দুর্য্যোগ-ঝটিকার দারুণ উচ্ছ্বাসে দুই হৃদয়-স্রোতে উতল তলদেশ পর্য্যন্ত যুক্ত হইয়া অকূলপ্রসারী মোহানার সৃষ্টি করিল। চিত্রাঙ্গদা এত বড় ভাগ্যবতী নয়—সে কিছুই পায় নাই, যাহা পাইয়াছিল তাহাও হারাইয়াছে; মন্দোদরী সকলই পাইয়াছিল, এবং হারাইয়াও যেন সব হারায় না। মধুসূদন তাঁহার কাব্যের কল্পনাকাশে ঝড়ঝঞ্ঝার যে ঘনঘোর সমারোহ আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই মধ্যে, নিম্নে ধরণীতলে আমাদের অতি সন্নিকটে—গৃহস্থের গৃহ-বাতায়নে যে দুই একটি দীপশিখাকে অনির্ব্বাণ রাখিয়াছেন, তাহার দিকে চাহিয়া আমাদের দৃষ্টিপিপাসা কম চরিতার্থ হয় না। সীতা ও প্রমীলার পার্শ্বে

এই দুইটি নারীচরিত্র নিতান্ত অপ্রধান বলিয়া মনে হইলেও কবি-কল্পনার সমগ্রতার পরিচয় ইহাতেই আছে। কবির সৃষ্টি যে জগৎ, তাহার মূলে আছে এক দৃষ্টি—একটি বীজ হইতেই কাব্যের পূর্ণাঙ্গবিকাশ হইয়া থাকে। কাব্যের বিকাশমুখে চিত্রাঙ্গদা এবং প্রায় শেষে মন্দোদরীর আবির্ভাব; কিন্তু কবির দৃষ্টি এমনই যে, এ দুই চরিত্র, তাহাদের ব্যক্তিত্বে ও বৈশিষ্ট্যে, যেন সেই বীজের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল—কবির দৃষ্টি যখনই যাহার উপরে পড়িয়াছে, তখনই সে স্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যসৃষ্টি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, সম্মুখ হইতে পিছনে, এবং পিছন হইতে সম্মুখে, যেমন করিয়াই আমরা পর্য্যবেক্ষণ করি না কেন, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কাব্যের সর্ব্বাঙ্গের যেমন সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তেমনই প্রত্যেক অঙ্গও আপনার বৈশিষ্ট্যে ও বৈলক্ষণ্যে অপর অঙ্গগুলিকে উজ্জ্বল করিয়াছে। বড় কাব্যে ও ছোট কাব্যে প্রভেদ এই যে, ছোট কাব্যে বা কবিতায় উপকরণ-বাহুল্যের অভাবে, বিচিত্র ও জটিলকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধিবার প্রয়োজন হয় না; সেখানে বিষয়-বস্তু অতিশয় সামান্য ও সরল—জীবনের বহিঃপ্রকাশের যে বিস্তৃতি এবং জগতের স্থান-কাল-পাত্রভেদের যে অশেষ দ্বন্দ্ব, তাহার প্রতিরূপ সে কবিতায় নাই; সেখানে শেষ পর্য্যন্ত—বস্তু নয়—ভাবই প্রধান। এ জন্য যে-শক্তি—বৈচিত্র্য, াবরোধ ও বিভেদের মধেই একটি রসরূপের স্থাপনা করে, সেই উৎকৃষ্ট সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় তাহাতে নাই। যাঁহারা সকল কাব্যকেই—রূপ নয়, কেবল রসের নিকষে যাচাই করিয়া থাকেন, তাঁহারা কাব্যের লিরিক-নির্য্যাসটুকুতেই পরিতৃপ্ত, এপিক বা কাহিনীকাব্যের পৃথক মাহাত্ম্য স্বীকার করেন না। বিশেষ অপেক্ষা নির্ব্বিশেষের প্রতিই তাঁহাদের পক্ষপাত, এ জন্য কাব্য-বিচারে, কবির বিশেষ-সৃষ্টির যে ক্ষমতা, তাঁহাদের রস-পিপাসা তাহার সম্যক পরিচয় গ্রহণে উৎসুক নহে। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র মত কাহিনী-কাব্যে এই শক্তিই উৎকৃষ্ট সৃষ্টিশক্তির নিদর্শন, তাই আমি প্রথমেই এ কাব্যের এই দুইটি অপ্রধান নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও সৃষ্টিচাতুর্য্যের আলোচনা করিলাম।

চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরী মধুসূদনের যে-কল্পনার সৃষ্টি, তাহাকে objective বা বস্তুনিষ্ঠ বলা যাইতে পারে। যাহা প্রত্যক্ষ-পরিচিত, যাহার আদর্শ ও ভাব-রূপ াস্থর, যাহা ব্যক্তির বাসনা-কামনায় রঞ্জিত নহে; সামাজিক ও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে যাহার রস-রহস্য সর্ব্বজন-হৃদয়বেদ্য, যাহার প্রকাশে ও বিকাশে, মানুষের স্বাধীন কল্পনার বিরোধী এক নিত্যস্বীকৃত নিয়তি-লীলা প্রকটিত হইতেছে, এবং

তাহাই মানুষের হাসি-কান্নার—তাহার বাস্তব হৃদয়ানুভূতির কারণরূপে, কাব্যে একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য সঞ্চার করে—কবিচিত্তের সেই ক্ল্যাসিকাল প্রবৃত্তির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; এই দুই চরিত্রসৃষ্টিতে মধুসূদন তাহারই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রমীলা ও সীতা যে-কল্পনার সৃষ্টি তাহাতে কবির নিজ স্বাধীন প্রবৃত্তির ক্রিয়া রহিয়াছে—এই দুইটিতে কবির মানস-আদর্শ দুই রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই দুইয়েরই মূল উপাদান সেই এক বস্তু—যাহা কাব্যে ও জীবনে মানুষের প্রবলতম ও শ্রেষ্ঠতম প্রাণধর্ম্মরূপে পূজিত হইয়া থাকে। মধুসূদন সেই প্রেমকে, এই দুইটি চরিত্রের কল্পনায়, আপন কবিহৃদয়ের সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন; তাই এখানে কবির কবি-প্রবৃত্তি অন্যরূপ—একটিতে প্রেমের রতি এবং অপরটিতে তাহারই আরতি রোমাণ্টিক লিরিক আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। তথাপি প্রমীলার সৃষ্টিই নবসৃষ্টি, ইহার মধ্যে কবির প্রাণের অভিনব উৎকণ্ঠা একটি দুরূহ সৃষ্টিসাফল্যে মণ্ডিত হইয়াছে। সীতার আদর্শ নূতন নহে, সেখানে কবি পুরাতনকেই, নূতন মন্ত্রে আবাহন করিয়া নবতন কিরণ-কিরীট' পরাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রমীলায় তিনি পুরাতনকেই গ্রহণ করিয়া, তাহাকে ভাঙিয়া, তাহার সেই চূর্ণ-মুষ্টি হইতেই আপনার মনের মানসী গড়িয়া লইয়াছেন। এ কাজ সহজ নহে—দেশী ও বিলাতী দাম্পত্যের দুই বিভিন্ন আদর্শকে, তিনি যেন এক আশ্চর্য্য রাসায়নিক যাদুশক্তিতে একাধারে মিলাইয়াছেন। প্রমীলার চরিত্রে স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকার সঙ্গে বাঙালী কুলবধূ, এবং ভারতীয় আদর্শের শক্তিরূপা নারীর সঙ্গে অভারতীয় বীরাঙ্গনা-মূর্ত্তির এই যে সংযোজন, ইহারই প্রতিভা সে যুগের বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গুলিতে যে-প্রতিভা য়ুরোপীয় ভাববস্তুকে দেশীয় বিগ্রহরূপে এমন রূপান্তরিত করিয়াছিল, এখানেও সেই প্রতিভার কীর্ত্তিকুশলতা লক্ষ্য করা যায়। এমনই করিয়া সে যুগে কবিপ্রতিভার এই আত্মসাৎ বা স্বীকরণ-শক্তির গুণে আমাদের সাহিত্য প্রাণ পাইয়াছিল। কিন্তু প্রমীলার চরিত্রসৃষ্টিতে মধুসূদনের দুঃসাহস বিস্ময়কর; দুই সম্পূর্ণ-বিরোধী সংস্কারকে তিনি এই চরিত্রে যুক্ত করিয়াছেন—সে বিরোধ এতই অসংশয় যে, কবির সৃষ্টিতে এইরূপ চাক্ষুষ জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছাড়া, আর কোন প্রকারে, তাহাকে মন হইতে দূর করা যায় না। ইহাই প্রতিভার যাদুশক্তি; অথবা হয়তো যাদুশক্তি নয়, ইহাই সত্য। আমাদের ধারণায় যাহা অবাস্তব, কবির কল্পনা তাহাকে শুধুই একটা বাস্তবের ভানমাত্র ধারণ করাইয়া দেয় না—বরং তাহার

স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া আমাদের মিথ্যাকে তাহার স্বকীয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে। নারীচরিত্র পুরুষের কাছে রহস্যময়, তাহার মধ্যে আমরা আমাদের ধারণাকে পদে পদে খণ্ডিত হইতে দেখিয়া মনে করি, সে বুঝি সকল নিয়মের বহির্ভূত ; সে যে আমাদেরই আত্মসংস্কারের দোষ তাহা আমরা কখনও ভাবিয়া দেখি না। একই নারীর পক্ষে বীরাঙ্গনা ও কুলবধূর আচরণ যে বিসদৃশ, এমন কি, অপ্রাকৃত—ইহাই আমাদের অভ্যস্ত ধারণা। সে ধারণা আমাদের বুদ্ধি অনুসারে যুক্তিযুক্তও বটে ; কিন্তু এ কাব্যের প্রমীলা-চরিত্র—তাহার সকল আচরণে সকল অবস্থায়—এমনই স্বাভাবিক ও জীবন্ত যে, আমাদের সে ধারণাও অন্ততঃ সাময়িকভাবে নিরস্ত হইয়া থাকে। তার একমাত্র কারণ, কবি আমাদিগকে, কোন অবস্থাতেই তাহার নারীত্বকে বিস্মৃত হইবার অবকাশ দেন নাই। প্রমীলার বীর-ভূষণ ও নারী-ভূষণ যতই বিপরীত হউক, মূলে একের সহিত অপরের বৈসাদৃশ্য নাই—কবি তাহা কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। অশ্বপৃষ্ঠে রণসজ্জায় সজ্জিত তাহার যে-রূপ বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন—

শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুঙ্কারে! বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে!
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরীবন্ধনে,
তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে, মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে!

সেই রূপের সঙ্গে—যখন সে

ত্যজিলা বীরভূষণে, পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী ; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে, জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি,
অলকে মণির আভা, কুণ্ডল শ্রবণে।

—তখনকার সেই রূপের কিছুমাত্র বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় না।

আবার, একদা যে প্রমীলাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম—

"পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি'
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?…
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি!

তাহারই সম্বন্ধে যখন অন্যত্র পড়ি—

> "হায়, নাথ," কহিলা সুন্দরী—
> "ভেবেছিনু যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে,
> সাজাইব বীরসাজে তোমায়। কি করি?
> বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।"

—তখন চমৎকৃতই হই, বিস্মিত হই না। ইহার কারণ কি? কারণ, প্রমীলা বীরাঙ্গনাও নয়, লজ্জাশীলা কুলবধূও নয়—সে পতিগতপ্রাণা প্রেমিকা নারী। সেই একই প্রেমের দায়ে সে কখনও বীরাঙ্গনা, কখনও কুলবধূ; নতুবা, তাহার আসল রূপ একই। সে রূপের আভাস কবি চকিতে একবার দিয়াছেন। রজনী-প্রভাতে ইন্দ্রজিৎ যখন বড় আদরে, মধুর মৃদুভাষে, তাহাকে ডাকিয়া জাগাইল, তখন—

> চমকি বামা উঠিলা সত্বরে—
> গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে!
> আবরিলা অবয়ব সুচারুহাসিনী
> সরমে।

—এ আচরণ কুলবধূর পক্ষেও যেমন, বীরাঙ্গনার পক্ষেও তেমনই স্বাভাবিক। এমনই করিয়া সর্ব্বত্র প্রমীলার ভিতরকার এই নারীরূপকে এক মুহূর্ত্তের জন্য আচ্ছন্ন হইতে না দিয়া, কবি এই চরিত্রে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা একান্ত বিরোধী, সেই আদিরস ও বীররসকে একাধারে মিলাইয়াও রসাভাস বা অসঙ্গতি-দোষ নিবারণ করিয়াছেন।

তথাপি প্রমীলা-চরিত্রে কবি নারীর প্রেমকে এক নূতন আদর্শে উদ্বোধন করিয়াছেন—সেই আদর্শকেই বুঝিয়া লইতে হইবে, নতুবা এ চরিত্র-সৃষ্টির রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না। প্রমীলার নারীত্বে কবি প্রেমকেই একাধিপত্য দিয়াছেন; সে বিষয়ে আর এক কবির নজীর আছে, যথা—

> Man's love is of man's life a thing apart,
> 'Tis woman's whole existence.

কবি এই তত্ত্বটিকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া তাহাকেই তাঁহার নায়িকার একমাত্র ধর্ম্ম করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এই তত্ত্বের সহিত তিনি তাঁহার নিজের কামনা-গত আদর্শকেও যুক্ত করিয়াছেন, কারণ, কেবলমাত্র ঐ তত্ত্বটিই তাঁহার কাছে সত্য নয়—প্রেম কেবল নারীজীবনের সর্ব্বস্বই নয়, তাহা নারীকে দুর্জ্জয় শক্তির অধিকারিণীও করে; এবং সে শক্তি কেবল আত্মদমন বা অসীম ধৈর্য্যের শক্তি নয়, সে শক্তি তাহার কামনা-বাসনাকে মুক্ত করিয়া দেয়; সে প্রেম কোন বাধা

মানে না, সে আপনার মধ্যে আপন বাসনাকে রুদ্ধ করিয়া একটা আত্মিক আনন্দেই চরিতার্থ হয় না। প্রমীলা যেন আর এক বাংলা কাব্যের নায়িকার মতই বলিতে পারিত—

এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে,
যে নারী নির্ব্বাক্ ধৈর্য্যে চিরমর্ম্মব্যথা
নিশীথ-নয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,—
আজন্মবিধবা, আমি সে-রমণী নহি ;
আমার কামনা কভু নিষ্ফল না হবে !

—কিন্তু সে ভিন্ন অর্থে ; কারণ, তাহার প্রেম এমন আত্মনিষ্ঠ, আত্মসচেতন নয় বলিয়া—মধুসূদনের আদর্শ, খাঁটি নারী-প্রেমের আদর্শ বলিয়া—তাঁহার আদর্শ-নারী পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় এমন করিয়া আত্মশক্তির ঘোষণা করে না ; তাহার প্রেম আত্মদানের আকাঙ্ক্ষায় অধীর—সেই কামনার মুখেই সে কোন বাধা মানে না। মধুসূদন নারী-প্রেমের সেই কামনা-বলিষ্ঠ আদর্শকেই বরণ করিয়াছেন—সে প্রেমের সেই রাজসিক মহিমার ধ্যান করিয়াছেন, যদিও সেই প্রেম—

Oft to agony distrest,
And though his favourite seat be feeble woman's breast.

প্রেমের 'calm pleasures, majestic pains' তাঁহাকে ততটা মুগ্ধ করে না—যতটা করে সেই প্রেমে বাসনার প্রখরতা।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একালের শ্রেষ্ঠ কবির আর একটি কবিতা মনে পড়িতেছে, তাহাতেও প্রেমকে যে-রূপে কবি উদ্বোধন করিয়াছেন তাহার সহিত তুলনা করিলে, মধুসূদনের এই আদর্শ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।—

ভস্ম-অপমান-শয্যা ছাড়, পুষ্প-ধনু,
রুদ্র-অগ্নি হ'তে লহ জ্বলদর্চ্চি তনু !

*   *   *

সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
অন্তরে করুক ক্ষুব্ধ দুঃখের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে ক'রে দিক্ দুঃসহ-সুন্দর।
মৃত্যু হ'তে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু।

—এ প্রেমও দুর্ব্বলতাকে পরিহার করার প্রেম, ইহাও কামনার দীপ্যমান দাহে—ভোগে-ত্যাগে, মিলনে-বিরহে—রুদ্রের উপাসক। এ কবিতার পরের পংক্তিগুলির প্রায় প্রত্যেকটি, লঙ্কাপ্রবেশের দু-সাহসিক অভিযানে উদ্যত, যোদ্ধবেশিনী প্রমীলার মুখে কিছুমাত্র অপ্রযুক্ত হয় না—

সঙ্কটবন্ধুর তব দীর্ঘ রাজপথ—
সে-দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।
তিমির-তোরণ রজনীর
স্পন্দিবে আহ্বানে মোর নির্ঘোষ-গম্ভীর।
যাক দূরে দ্বিধা লজ্জা ত্রাস—
আয় বক্ষে সর্ব্বনাশা প্রচণ্ড উল্লাস।
মৃত্যু হ'তে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু।

—গীতিকবিতার এই আবেগই মহাকাব্যের নায়িকা-চরিত্রে রূপপরিগ্রহ করিয়াছে। ইহাতেও প্রেমের সেই আর-এক রূপ নাই যাহাকে স্মরণ করিয়া, কবির ভাষাতেই বলা যাইতে পারে—

* * the Gods approve
The depth, and not the tumult of the soul,

—সে প্রেম সাত্ত্বিক, এ প্রেম রাজসিক। তাই বলিয়া, এ প্রেম কেবল আদি-রসের প্রেম নয়; মধুসূদন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা-কাব্যে' সেই আদিরসের প্রেম লইয়া কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছেন। সে প্রেম কাব্যরসের প্রেম—জীবনের প্রেম নয়; তাহারই ভস্ম-অপমান-শয্যা হইতে আর এক কবি পুষ্পধনুকে জাগাইয়া 'বীরের তনুতে তনু লইতে' আহ্বান করিয়াছেন। ইহারই বশে প্রমীলা বীরাঙ্গনা সাজিয়াছে। প্রমীলার বিরহ দুঃসহ বলিয়াই সুন্দর, এবং সেই দুঃসহতাই মিলনকে প্রখর করিয়াছে। অতএব যুদ্ধযাত্রার বীরবেশিনী প্রমীলা ও সহমরণ-যাত্রার বধূবেশিনী প্রমীলায় কোন পার্থক্য নাই। প্রখর-মিলনের এই তত্ত্ব কবির কল্পনাকে উজ্জীবিত করিয়াছে বলিয়াই, প্রমীলা-চরিত্রে বাহ্যতঃ অসঙ্গতি থাকিলেও, ভিতরে সৃষ্টি-সত্যের সঙ্গতি রহিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, ওই প্রখর মিলনের অর্থই এ কাব্যের প্রমীলাঘটিত কাহিনীর আদ্যোপান্ত অর্থবান করিয়াছে। এ প্রেম বড় অধীর, বড় অসহিষ্ণু—ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদও সহ্য করিবে না। মেঘনাদের প্রেয়সীর পক্ষে প্রেমের এই

প্রচণ্ডতা যেমন শোভন হইয়াছে, তেমনই, প্রাচীন কাব্যের আদিরস—সেই মদন —যে রুদ্রের নয়নবহ্নি সহ্য করিতে পারে না, তাহাকে ভস্ম না করিয়া—এইরূপ বহ্নিদীপ্ত করিয়া তোলা—নব্য বাংলা কবিতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা এই কবির প্রেরণাকে সার্থক করিয়াছে। তাঁহার এই নূতন প্রেমের কল্পনাকে উদ্দেশ করিয়া বলা যাইতে পারে—

> বন্ধু তব দৈত্যজয়ী দেব বজ্রপাণি,
> পুষ্পচ্ছলে তাঁরি অগ্নি দাও তুমি আনি'।

—কারণ, সে কল্পনারও বন্ধু ছিল য়ুরোপীয় কাব্য, এবং তাহাতে দৈত্যজয়ী দেব বজ্রপাণির বজ্র-ঘোষণাও ছিল।

কিন্তু কবি এই প্রেমকে, নারীর এমন প্রকৃতিগত করিয়া দেখিয়াছেন যে খাঁটি বাঙালী ঘরের বধূও রাক্ষস-বধূ প্রমীলার রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রমীলা যখন বলে—

> লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি!
> অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে! * * *
> যাইব তাঁহাব পাশে, পশিব নগরে
> বিকট কটক কাটি', জিনি ভুজবলে
> রঘুশ্রেষ্ঠে—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম,
> নতুবা মরিব রণে, যা থাকে কপালে!

—তখনও সে যাহা, আবার যখন স্বামীর অনুগমন করিয়া মৃত্যুর দুর্গমতর পথে যাত্রা করিবার কালে সে বলে—

> —লো সহচরি, এতদিনে আজি
> ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
> আমার, ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে।...
> কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
> লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
> এতদিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
> পিতামাতা, চলিনু গো আজি তাঁর সাথে,

—তখনও সে সেই একই নারী। অতএব, মধুসূদন এ চরিত্রের আদর্শ কোথা হইতে পাইয়াছিলেন—কোন্ বিদেশী বা স্বদেশী কাব্যের, অথবা দেশের অতীত বা সমসাময়িক ইতিহাসের—কোন্ নারী-চরিত্র তাঁহার কল্পনার সহায় হইয়াছিল, সে বিচার নিতান্তই গৌণ। কারণ, প্রমীলার বীরাঙ্গনা-মূর্তি এ চিত্রের আধখানা মাত্র—সেই আধখানাকে পৃথক করিয়া দেখিলে, এ চরিত্রের কিছুই দেখা হয় না;

বাকি আধখানা যখন যোগ করিয়া দেখি, তখন সে এমন একটি চরিত্র যাহা কোন কাব্যে বা ইতিহাসে নাই। তাই সেরূপ আলোচনা শুধু বৃথা নয়, তাহা ভ্রমাত্মক; তাহাতে প্রমাণ হয় যে, রসসৃষ্টির যে মূল রহস্য, কাব্য সমালোচনায় তাহারই সন্ধান লওয়া হয় না। প্রমীলার চরিত্রে কবি আমাদের দেশের মূক দাম্পত্য-প্রেমকে যে মুখরতা দান করিয়াছেন, এবং তাহারই যে দুঃসাহস, তাহাতেই নবযুগের নব্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছে; এই মুখরতাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-কাব্যে দাম্পত্য-প্রেমকে নূতন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—সে মুখরতাও অল্প নহে, যদিও উপন্যাসের অপেক্ষাকৃত বস্তুনিষ্ঠ কল্পনায় তাহাকে এমন করিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই। এ প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যে-প্রেমে আমাদের দেশের সেকালের সীমন্তিনীরা স্বামীর জলন্ত চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেন তাহাও কম প্রখর—কম উদ্বেল ছিল না; তাহাতে depth অপেক্ষা tumult of the soul-ই অধিক থাকিত; কেবল, শাস্ত্র-সংস্কার ও লোকাচারের কঠিন গুণ্ঠনে আবৃত থাকায় সে মুখের—সে চোখের-দীপ্তি তেমন ধরা পড়িত না।

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র মূল ঘটনাবস্তুর সঙ্গে সীতা-চরিত্রের কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই; যে-কল্পনা এ কাব্যের আখ্যান গড়িয়াছে ও তাহার উপযোগী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে—সীতা-চরিত্র যেন সে কল্পনার বাহিরে। এজন্য কবি যেন সীতা-চরিত্র-অঙ্কনে একটি স্বতন্ত্র তূলিকা ব্যবহার করিয়াছেন—সে যেন তাঁহার বিশ্রাম-মুহূর্তের স্বপ্ন-রচনা! পুরীর মধ্যে ও পুর-প্রাচীরের বাহিরে সমবেত অগণিত বীরবাহিনীর তূর্য্য ও পটহ-নিনাদ হইতে দূরে, স্নিগ্ধ শীতল পল্লব-ঘন প্রচ্ছায় কাননতলে বসিয়া, কবি যেন কিয়ৎকালের জন্য একখানি বাঁশি লইয়া প্রাণের নিভৃত রাগিণী আলাপ করিয়াছেন—নিদাঘ-দিবার দীপ্ত দ্বিপ্রহর যাপনের পর, গোধূলি-সন্ধ্যার একটিমাত্র তারার পানে চাহিয়া, জননান্তর-সৌহৃদ-স্মৃতির মত, আর এক পিপাসা অনুভব করিয়াছেন। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র সমগ্র চতুর্থ সর্গটি আর সকল হইতে পৃথক; সে যেন তরঙ্গিত ক্ষুব্ধ সাগরের মধ্যস্থলে একটি স্তব্ধ শ্যামল প্রবাল-দ্বীপ—মহাকাব্যের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত একটি গীতি-কবিতা। কবি নিজেও এ-কাব্যের সহিত এরূপ শাখা-কাহিনীর (episode) সঙ্গতি সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলেন না। বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিত একখানি পত্রে তিনি ইহার জন্য একটু কৈফিয়ৎ দিয়াছেন।—

I think I have constructed the Poem on the most rigid principles, and even a French critic would not find fault with me. Perhaps the

episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it?

কৈফিয়ৎ দিবার কথাই বটে। সমগ্র 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কল্পনায় আমরা কবিমানসের যে পরিচয় পাই—সে কাব্যের নায়ক-নায়িকা যে আদর্শে গঠিত, তাহা যখন স্মরণ করি, তখন কবির এই স্বধর্ম্ম-চ্যুতির জন্য কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারি। কবি তাহার কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারিয়া, শেষে বলিয়া উঠেন—'But would you willingly part with it?' কিন্তু, সত্যই কাব্যের রচনা-কৌশলের দিক দিয়া কৈফিয়ৎ দিবার কোন প্রয়োজন নাই—রীতিমত মহাকাব্যের গঠনে এইরূপ শাখা-কাহিনীর স্থান আছে; সে সম্বন্ধে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এইরূপ। মূল কাহিনীর প্রসাধন-স্বরূপ—তাহার বৈচিত্র্যবিধানের জন্য—শাখা-কাহিনী থাকাই আবশ্যক; তাহাতে দীর্ঘ একটানা আখ্যানের ক্লান্তি-বিনোদন হইয়া থাকে; পাঠকের চিত্ত প্রসঙ্গান্তরে আকৃষ্ট হইয়া, শেষে নবীভূত কৌতূহলে মূল কাহিনীতে ফিরিয়া আসে। কেবল, ইহাই দেখিতে হইবে যে, এরূপ প্রসঙ্গ যেন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, অথবা মূল কাহিনী অপেক্ষা দীর্ঘ বা অধিকতর চমকপ্রদ না হয়। সীতার কাহিনীতে এ অভিপ্রায় সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে—শুধুই বিষয়ের বৈচিত্র্যে নহে, কবি এই শাখা-কাহিনীর সুযোগে মূল কাহিনীর পূর্ব্ব-পর বৃত্তান্ত সংক্ষেপে পাঠকের গোচর করিয়াছেন—সীতার হরণ-কাহিনী ও তাহার উদ্ধারের কাহিনী সুকৌশলে ইহার মধ্যে বলিয়া লইয়াছেন। এতদ্‌ভিন্ন, তিনি যেভাবে ও যে সুরে, এই খণ্ড-কাহিনী রচনা করিয়াছেন—নূতন ছন্দের সর্ব্বভাব-বহন-ক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপ, তাহাও একটা বড় উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে। যে ছন্দে প্রমীলা ও মেঘনাদের মূর্ত্তি গঠন করা যায়, সেই ছন্দেই যে সীতার মত একটি লিরিক-প্রতিমা নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে—সে দৃষ্টান্ত কম মূল্যবান নহে। তাই নিছক কাব্য-কলার দিক দিয়া এ সর্গ আগন্তুক বা অবান্তর নয়।

কিন্তু কবি-মানসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সীতা-চরিত্র তাহার পক্ষে অভাবনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে। মনে হয়, এ যেন কবির নিজেরও অজ্ঞাত কোন সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রীর আকস্মিক ঝঙ্কার—ইহা যেন কোন্ দূর-দূরান্তর হইতে তাঁহার কাণে বাজিতেছে, ইহাকে ভুলিয়াও ভুলিতে পারা যায় না! তাই এই

সুরের প্রতিমাকে অশোক-কাননে বসাইয়া, নিজে সরমা সাজিয়া, কবি ইহার ললাটে সিন্দূর দিয়া পদধূলি লইয়াছেন। বিস্ময়ের কথাই বটে— 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কবির মানসে সরস্বতীর এ-রূপ কেমন করিয়া ধরা দিল! এ যেন—

কপোলে সুধাংশু-ভাস,
অধরে অরুণ-হাস,
নয়ন করুণাসিন্ধু—প্রভাতের তারা জ্বলে।

ইহাকে দেখিয়া সেই আর এক কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

এস মা করুণা-রাণী
ও বিধুবদন খানি
হেরি' হেরি' আঁখি ভরি' হেরি গো আবার।
শুনে সে উদার কথা,
জুড়াক মনের ব্যথা,
এস আদরিণী বাণী সম্মুখে আমার!

—বিহারীলালের সেই প্রভাতের শুকতারাই এ কাব্যের সীতা; এখানে সে গোধূলি-ললাটের তারারত্ন হইয়া জ্বলিতেছে। এ সরস্বতীও তেমনই 'করুণা-মেয়ে'; কেবল, বিষাদের অস্ত-কিরণে সেই তরল মুকুতা-বিম্ব সুবর্ণের দীপ-বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। বিহারীলাল যাহার ধ্যান করিতে বাল্মীকিকে স্মরণ করিয়াছেন, মধুসূদন তাহার চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন যে-সর্গে তাহার আরম্ভে তিনিও বাল্মীকি-বন্দনা করিয়াছেন। এ যেন একটি পূজা-গৃহ, এখানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কবিকে কায়মনোবাক্যে শুচি হইতে হইবে; তাই সে বন্দনা কেবল একটা মঙ্গলাচরণ নয়—কবির একান্ত ব্যক্তিগত ও আন্তরিক স্তুতি—

নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্রসঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে!

'তব অনুগামী দাস'—কবি ঠিকই বলিয়াছেন, সীতাচরিত-রচনায় তিনি আপন পথের পথিক নহেন; যে পথে বাল্মীকি ও বাল্মীকির অনুগামী রামায়ণ-কথা-কোবিদগণ গিয়াছেন, এখানে তিনিও সেই পথে চলিয়াছেন। কিন্তু সে পথে চলিবার পাথেয় তাঁহার আছে কিনা সন্দেহ—সে তীর্থে যাইবার মত ধন-বল কোথায়? তাই তিনি চলিয়াছেন—"রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ-

দরশনে"। *যেন তিনি জানেন যে, তাঁহার মত কবির পক্ষে সীতাচরিত-কীর্ত্তন—বিষয়মদমত্ত গৃহীর তীর্থদর্শনের মত।* কিন্তু এ অভিলাষ তাঁহার কেন হইল? সে প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয়, মধুসূদন, পুরুষের পৌরুষ ও মানুষের মনুষ্যত্ব-গৌরব সম্বন্ধে যে-ভাবের ভাবুক হউন—মাতৃস্তন্যরসের মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই; আমাদের ঘরের সেই নারীমূর্ত্তি, সেই সর্ব্বংসহা ধরিত্রী-কন্যা—সেই আত্মমুগ্ধা, পরগতপ্রাণা, স্বার্থে দুর্ব্বলা, ত্যাগে মহাবীর্য্যবতী মানবী-রূপিণী দেবীর মহিমা কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারেন নাই। এজন্য প্রমীলা-চরিত্রও সেই নারীরই এক নূতন সংস্করণ হইয়াছে মাত্র—নারীচরিত্রের কল্পনায় তাঁহাকে সকল আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে হইয়াছে। এই নারীই তাঁহার সেই নবযুগের বিদ্রোহী কবিচিত্তকে—তাঁহার কল্পনার বিপরীতমুখী আবর্ত্তকে—একটি স্থির কেন্দ্রবিন্দুর শাসনে রাখিয়া, এ কাব্যকে খাঁটি বাংলা কাব্য করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার মন যত ঊর্দ্ধে, এবং যত দূরেই বিচরণ করুক—আমাদের গৃহ-সংসারের যজ্ঞবেদিকায় নিত্যসেবার হোমানল জ্বালিয়া, যে নারী-ঋত্বিক দুই করপুটে নিজের তনু-মনঃপ্রাণ আহুতি দিয়া থাকে, কবির হৃদয় বার বার ফিরিয়া আসিয়া তাহারই চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে। বাঙালী কবির অন্তরের সেই অবশ আকর্ষণের ফলে 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' সীতাচরিত-গাথা আপনি আসিয়া পড়িয়াছে। কবির জাগ্রত চেতনায় এ কাব্যের পক্ষে যে কাহিনী অবাস্তব বলিয়া মনে হইয়াছে, অন্তরের গভীরতর প্রেরণার বশে সে কাহিনীকে তিনি বর্জ্জন করিতে পারেন নাই।)

তথাপি সীতা মধুসূদনের মানস-দুহিতা নয়—সে দাবি প্রমীলার, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ কথাও বলিয়াছি যে, নারীপ্রেমের যে দুই মূর্ত্তি কবি এ কাব্যের বহিরঙ্গনে ও অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার একটিতে আছে—কবিচিত্তের রতি, অপরটিতে আছে আরতি। প্রমীলাই তাঁহার মানসী; মধুসূদন, পাশ্চাত্য জীবনে ও কাব্যে, প্রেমের যে প্রোজ্জ্বল দাহন-দীপ্তি দেখিয়া নিজের জীবনেও প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহাকেই, কাব্যে কল্পনার উচ্চ-আদর্শে মণ্ডিত করিয়া তিনি প্রমীলা-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ চরিত্রে—সাত্ত্বিক আত্মস্থতা নয়, আধ্যাত্মিক অমৃতও নয়—আধিভৌতিক দেহ-চেতনার বিক্ষোভ, হৃদয়বৃত্তির প্রবল আক্ষেপ, এবং তাহার মহনীয় পরিণাম যে মৃত্যু, তাহাই তাঁহার রোমাণ্টিক কবি-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বোক্ত কবিতায় যে আছে—'যাহা মরণীয় যাক ম'রে', সে মরণীয় অর্থে বাসনা-কামনার বিক্ষোভ নয়—সেই

কামনা-বাসনার মধ্যেই যাহা কিছু দুর্ব্বল, তাহাই মরণীয়। মধুসূদনও তাঁহার আদর্শ-নায়িকার মধ্যে কামের সেই দুর্ব্বলতার ভস্ম নয়—তাহার রুদ্র বহ্নিশিখাই দেখিতে চান। প্রমীলার প্রেমে কবি যেমন দেখিয়াছেন মিলনকে—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহার কাহিনী প্রখর-মিলনের কাহিনী, তেমনই সীতার প্রেমে কবি দেখিয়াছেন—প্রশান্ত বিরহকে। (সীতার আদর্শ প্রমীলার ঠিক বিপরীত; ইহাতে নাটক বা মহাকাব্যের স্বর্গমর্ত্ত্যগ্রাসী, অথচ আত্মঘাতী, প্রেমের বিজয়-গৌরব নাই। এ প্রেম মৃত্যুতেই মহনীয় নয়।—ইহা আত্মার তপশ্চরণ; ধ্যানে ও স্বপ্নে, সংযমে ও ধৈর্য্যে, ইহার বিচ্ছেদ সুসহ বলিয়াই মহিমাময়—'দুঃসহ-সুন্দর' নয়। যে প্রেম অচ্ছোদ-সরসী-তীরে, প্রিয়তমের মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া, বিরহ-রজনীর যুগান্ত যাপন করে, অন্তরে ভাব-সম্মিলনের অমৃত-নিষেকে ভাবী মিলনের আশাকে সঞ্জীবিত রাখে—অশোককাননে সেই সাত্ত্বিক প্রেমের লিরিক-মূর্চ্ছনা শরীরী হইয়া, নিয়মক্ষামমুখী একবেণীধরা বিরহিণীর বেশে, বিরহকে তারাকুন্তলা তমস্বিনীর মত জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছে। এ প্রেমের বেদনাও যেমন—'majestic pains', ইহার সুখও তেমনই—'calm pleasures'। ইহার বেদনাও যেমন গভীর, স্তব্ধ, উদার; সুখও তেমনই সহজ, শান্ত, সরল। সীতার মুখে আমরা প্রিয়-মিলনের যে সুখস্মৃতি-কাহিনী শুনিতে পাই, তাহা প্রখর মিলনের মত নয়; সে সুখে উন্মাদনা নাই, প্রাণের পরিতৃপ্তি আছে।—

কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদীতটে, দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে। কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে?
শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্রকথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে,
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা! এখনও এ বিজন বনে
ভাবি আমি, শুনি যেন সে মধুর বাণী!

কিন্তু সীতা-চরিত্রে কবি যে-প্রেমের ধ্যান করিয়াছেন তাহা শুধুই দাম্পত্য-প্রেম নয়—সেইখানেই তাহার শেষ নয়। ইহা সেই প্রেম যাহা নরনারীর যুগল-হৃদয়ে জন্মলাভ করিয়া, শেষে করুণা বা মৈত্রীর মধ্যে চরম সার্থকতা লাভ করে। বিহারীলালের সারদা-প্রেমে আমরা যে-প্রীতির সাধনায় বিশ্বাত্মীয়তা-বোধের আভাস পাই, মধুসূদনের সীতা-চরিত্রে আমরা সেই করুণাকেই প্রেমের পরিণতি-রূপে দেখিতে পাই। সীতাও যেন মূর্ত্তিমতী করুণা—সেই করুণার মূলে আছে এই পতি-প্রেম। মনে হয়, ইহাই স্বাভাবিক; যে-প্রেম ব্যক্তির সমগ্র সত্তায় পুষ্পিত হইয়া উঠে, তাহা বিশ্বাত্মীয়তায় পর্য্যবসিত না হইয়া পারে না; যাহাতে আত্মার আনন্দ, তাহার অনুকম্পার সীমা নাই। বিহারীলাল ঘুমন্ত প্রেয়সীর মুখপানে চাহিয়া ভাবঘোরে গাহিয়াছেন—

বিমল আননে তোর
জাগিছে মুরতি মোর,
ঘুমন্ত নয়ন দুটি যেন ধ্যানে নিমগন।

—প্রেয়সীর মুখে কবি নিজ-মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতেছেন, ইহাও এক প্রকার মিষ্টিক অনুভূতির কথা। এই আত্মপর-ভেদ ঘুচিয়া যাওয়া যে অবস্থায় সম্ভব হয়, তাহাতেই এমন কথা বলা আশ্চর্য্য নয় যে—

তোমার পবিত্র কায়া
প্রাণেতে ফেলেছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া, ভালবেসে সুখী হই!
ভালবাসি নারী-নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
সদাই আনন্দে আমি চাঁদের কিরণে রই।

সীতার ভালবাসাও এই ভালবাসা, কেবল বিরহের অন্ধকারে চাঁদের কিরণ এক্ষণে ঢাকা পড়িয়াছে। 'ভালবাসি নারী-নরে, ভালবাসি চরাচরে' এ কথা সীতার পক্ষে আরও সত্য। সীতা কাহারও দুঃখ সহ্য করিতে পারে না, এমন কি, মহাশত্রুরও নয়। তাহার নিজ হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় দুঃখ তাহাকে সংসারের উপরে বিরক্ত বা বিদ্বিষ্ট করে নাই; সকল দুঃখীর দুঃখ সে আপনার দুঃখ দিয়া বুঝিয়াছে—পরকে দুঃখ দিয়া সে নিজের সুখ চায় না। তাহারই উপরে পাপাচরণ করিয়া যাহারা সেই পাপের শাস্তি ভোগ করিতেছে, তাহাদের দুঃখ দেখিয়া, তাহাদের সেই পাপের জন্যও সে আপনাকেই দায়ী করে। যে ইন্দ্রজিৎ না মরিলে সীতার

উদ্ধার নাই, সেই ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদ দিয়া, সরমা যখন তাহাকে এ সংবাদও শুনাইল—

দৈত্যবালা প্রমীলাসুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা—
প্রমীলাসুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি !

তখন—

ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
সীতা-রূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা—সজল-আঁখি, সম্ভাষি সখীরে,—
"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলা-রূপী
আমি ! পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা !
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী !
বনবাসী সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর ! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজ-সিংহাসন ! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ-পক্ষে ভীম-ভুজ-বলে
রক্ষিতে দাসীর মান ! হাদে দেখ হেথা—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে ?
মরিবে দানব-বালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে ! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুকাল
হেন ফুল !"

—এই যে 'মূর্ত্তিমতী দয়া', ইহারও আদি-মূর্ত্তি—প্রেম ; ইহাকেই বলে প্রেমের রূপান্তর। নারীর সকল সাধনাই প্রেমে আরম্ভ ; ইহা পুরুষের অধ্যাত্ম-সাধনা নহে। করুণা বা মৈত্রীর সাধনায় পুরুষের পন্থা অন্যরূপ—সেখানে জ্ঞান আছে বিবেক আছে, বৈরাগ্য আছে ; এখানে আছে কেবলমাত্র হৃদয়।

মধুসূদন তাঁহার কাব্যে পুরুষের পৌরুষের সঙ্গে নারীর নারীত্বকেও তাহার শ্রেষ্ঠ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—ইহাতে প্রমাণ হয়, 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কল্পনায় কবির সমগ্র কবি-সত্তা সাড়া দিয়াছে। এই কাহিনীর অনতিপ্রসর

পটভূমিকার মধ্যেই কবির অতিক্ষিপ্র তূলিকা, জীবনের বর্ণভাণ্ড হইতে অনেকগুলি রং লইয়া, তাহাদের সন্নিবেশে চিত্রের সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছে। সীতা-চরিত্র এ কাব্যের কাহিনী-অংশের বহির্ভাগে থাকিয়াও কবির কল্পনাকে কতখানি সার্থক করিয়াছে, সে ধারণা কবিরও ছিল না; প্রেমের যে আদর্শ তাঁহাকে সজ্ঞানে আকৃষ্ট করিয়াছিল, নির্জ্জানে তাহার বিপরীতই যে তাঁহাকে উন্মনা করিয়াছে—তাঁহার কল্পনা যখন রণবাদ্যমুখরিত নারীসেনার শোভাযাত্রায় নিশীথ-আকাশে মশাল জ্বালাইয়া প্রেমের গৌরব কীর্ত্তন করিতে ব্যাপৃত ছিল, তখন প্রাণের গভীরতর নিশীথে, সেই কল্পনাই যে, তুলসীর মূলে সেই প্রেমের স্থবর্ণ-দেউটি জ্বালাইতে অধীর হইয়াছে, তাহা কবিরও অগোচর ছিল। বাংলার এই কবি-শিশুর দুরন্ত হৃদয় এমনই করিয়া সেই দুরন্তপনার মধ্যেই, নিজের জাতি-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছিল। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কাব্যবস্তু যেমনই হউক—বিজাতীয় আদর্শের সঞ্জীবনী প্রেরণা তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় যতই সহায়তা করুক, কবি যে তৎসত্ত্বেও তাঁহার কবিতাকে কুলত্যাগিনী হইতে দেন নাই, ইহাই মধুসূদনের কবিশক্তির সবচেয়ে বড় নিদর্শন; এবং এইজন্যই সেকালের শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেই এ কাব্যের রস আকণ্ঠ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়

কাব্য-সমালোচনা; মেঘনাদবধ-কাব্যের গঠন ও রচনা-কৌশল, পাশ্চাত্ত্য প্রভাব; দেশীয় আদর্শের প্রতি বাহিক নতি-স্বীকার; মধুসূদনের কবি-ব্রত।

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কবিকল্পনা ও কবিত্বশক্তির যে পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে এ পর্য্যন্ত সে কাব্যের কাহিনী বা কল্পনা-বস্তুর, এবং তাহার অন্তরালে যে কবি-মানস রহিয়াছে তাহার, ব্যাখ্যা করিয়াছি। এক্ষণে কাব্যের রচনাভঙ্গি ও কবিকল্পনার সাধারণ গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু বলিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে, অর্থাৎ আমারই এই আলোচনার মূল্য সম্বন্ধে, কিছু বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি। আমি এই আলোচনায়, একাধিক প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, মধুসূদনের কাব্যপ্রকৃতি 'আত্মসচেতন' নয়, তাহার প্রমাণ, তাঁহার এই কাব্যগত কল্পনা ও সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের বহু সজ্ঞান উক্তির তুলনা করিলেই, নিঃসংশয় হইয়া উঠে; আমি সে দৃষ্টান্তও দিয়াছি। কাব্যসৃষ্টির মূলে নির্জ্ঞানের প্রভাব যে অনেকখানি থাকে, তাহাও আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত; এ শক্তিকে প্রাচীনেরা দিব্যশক্তি বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। বুদ্ধি ও বিদ্যার অতীত এক প্রকার 'বোধি'ই ইহার কারণ; এবং ইহা সাধারণ মনুষ্যধর্ম্মের অতীত বলিয়া, "নরত্বং দুর্লভং লোকে কবিত্বঞ্চ সুদুর্লভং"—এমন কথা তাঁহারা জোর করিয়াই বলিতেন। আবার, "কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ"—এই উক্তির মধ্যেও একটা গভীর সত্য নিহিত আছে। কবিরা যাহা রচনা করেন, তাহার সুগভীর রসরূপ বা নিগূঢ় তাৎপর্য্য সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্যক জ্ঞান না থাকিবারই কথা; কারণ, সে রস তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন—জাগ্রত চৈতন্যের অজ্ঞাতে, এক গভীরতর চিত্তবৃত্তির অতর্কিত প্ররোচনায়। অতএব সে সৃষ্টির রস-তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য এমন ব্যক্তির প্রয়োজন, যিনি সেই কাব্যের প্রেরণা-ঘটিত সাক্ষাৎ আবেশের প্রভাব হইতে মুক্ত, অথচ বাহির হইতে সেই কাব্যস্রষ্টা কবির অন্তরের আকূতিকে আবিষ্কার করিবার দৃষ্টি যাঁহার আছে; তাঁহাকেও এই অর্থে কবি বলিতে হইবে যে, অপরের কল্পনার শাখা-প্রশাখা হইতে মূল পর্য্যন্ত, তিনি আর এক জাতীয় কল্পনার বলে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। আর এক জাতীয়—এই অর্থে যে, এখানে সে কল্পনা মৌলিক-সৃষ্টির কল্পনা নয়; সেই সৃষ্টিকে সম্যক হৃদয়গোচর

করিবার রসদৃষ্টি মাত্র তাহাতে আছে। এ দৃষ্টিও সুলভ নয়। আমাদের আলঙ্কারিকের মতে "পুণ্যবন্তঃ প্রমিণ্বন্তি যোগিবৎ রসসন্ততিম্"। রস-সন্ততি, অর্থাৎ, রসপ্রেরণাসম্ভূত যাহা, তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে যোগীর ন্যায় দৃষ্টি চাই; এবং সে দৃষ্টি, পুণ্যবাণ না হইলে, কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। এ ভাষা প্রাচীন, আধুনিক ভাষাতেও কথাটা একই, এবং সত্য। মধুসূদনের কাব্যের রসনির্ণয় করিতে এতখানি যোগ-দৃষ্টির প্রয়োজন অবশ্য আমার হয় নাই, সে শক্তিও আমার নাই; কিংবা এ কাব্যের রস আস্বাদনে কোনরূপ 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর'-বস্তুর নাম স্মরণ করিবার মত বিপদও আমার ঘটে নাই। তথাপি, আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে কবির কল্পনা ও অন্তর্গূঢ় প্রেরণাকে আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, এবং তাহাতে আমার নিজের কল্পনারও সাহায্য লইতে হইয়াছে। এই কার্য্যে আমি কতটা সফল হইয়াছি, তাহার প্রমাণ হইবে—আমি কবিমানসে যে কাব্য-বীজ আবিষ্কার করিয়াছি, কাব্যের সর্ব্বাঙ্গ-বিকাশে সর্ব্বত্র তাহার লক্ষণ-সামঞ্জস্য করিতে পারিয়াছি কি না; কাব্যে যাহা আছে, তাহার অতিরিক্ত যদি কিছু বলিয়া থাকি, তবে তাহা কবির সেই মূল কল্পনা-পরিধির বহির্গত কি না! ব্যাখ্যা যদি মূলকে অতিক্রম করে, তবে তাহা অপব্যাখ্যা মাত্র; তাহা ব্যাখ্যাকারেরই গৌরব বৃদ্ধি করে—কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি করে না। আবার, কবিতা—অন্তত এই জাতীয় কাব্য—বেদান্তসূত্রের মত এমন গূঢ়ার্থপূর্ণ স্বল্পাক্ষর-রচনা নয় যে, তাহার ভাষ্য রচনা করিতে গিয়া নানা মুনি নানা মৌলিক ও স্বতন্ত্র শাস্ত্র রচনা করিতে পারেন। তথাপি অতি সূক্ষ্ম তর্ক আশ্রয় করিলে এমন কথাও বলা যাইতে পারে যে, কোনও কাব্যের কাব্যগত যাহা, তাহা যে ভাবেই পুনরুক্ত হউক, সে আর ঠিক সেই কাব্যের মর্ম্ম নহে; কাব্যপাঠের ফল ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব রুচি, রসবোধ, কল্পনা-প্রকৃতি ও সংস্কার অনুসারে পৃথক হইতে বাধ্য। অতএব কাব্যরসকে প্রত্যেক রসিক পাঠক আপনার মত করিয়া অপরোক্ষ করিবেন, কোন ব্যাখ্যাকারের পরোক্ষতায় কাব্যের সেই রস ক্ষুণ্ণ হইবারই কথা। কিন্তু এতখানি সূক্ষ্ম বিচার মানিতে হইলে কাব্যের রসপ্রমাণ-কর্ম্ম সাহিত্য হইতেই খারিজ হইয়া যায়। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে, আধুনিক ভাষায় যাহাকে 'ক্রিটিক' বলে—'রসপ্রমাতা' নামে তাঁহার অধিকার মানিয়া লওয়া হইয়াছে। কাব্যের কাব্যগত রসবস্তুকে অপরোক্ষ করিবার রসদৃষ্টি যাঁহাদের আছে, তাঁহাদেরই প্রমুখাৎ অপর সকলে কাব্যপরিচয় গ্রহণ করিবে—এমনই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও নিষ্কৃতি নাই;

কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি—আধুনিক কাব্যবিচার কেবল রসবিচার নয়, কাব্যের বিশিষ্ট রূপবিচারই মুখ্য। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র মত কাব্যে, তাহার বস্তুবিস্তারের মধ্যেই কবির কল্পনাকে অনুসরণ করিয়া আমি তাহার—রস নয়—কাহিনীগত ভাববৈচিত্র্য, ও তাহার রূপ-সমগ্রতার যে চিত্র উপস্থাপিত করিয়াছি, তাহাতে কবি-মন ও ক্রিটিক-মনের মনোভূমি এক না হইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। এজন্য অনেকের মনে এমন সন্দেহ জাগিতে পারে যে, আমি হয়তো আমারই মনের আস্তরণ দিয়া মধুসূদনের কাব্যকে ঢাকিয়া, তাহার উপর আমারই কল্পনার কারিগরি করিয়াছি। সত্যই, কাব্য-পরিচয় ব্যপদেশে এমন রচনা অনেক দেখা গিয়াছে, যাহাতে মূল কবির কল্পনা অপেক্ষা লেখকের স্বকপোল-কল্পনার বাহাদুরিই অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই ধরনের রচনা সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচকের উক্তি এইরূপ—

These are all fantastic embroideries, metaphors, easel pictures, which sometimes do honour to the artistic capacity of the eulogists, but have no connexion whatever with the direct impression of Corneille's tragedies. Spinoza would have said that they have as much connexion with them as the dog of Zoology with the dog-star.

আরও একজনের মতে, কাব্য-সমালোচনার সাধারণ দোষ তিনটি :—

(১) কোন কাব্যের সাধারণ লক্ষণ লইয়া ভাসা-ভাসা আলোচনা, তাহাতে সেই কাব্যের নিজস্ব বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়ে না—অপর বহু কাব্যের সহিত তাহার কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

(২) অত্যন্ত স্থূল লক্ষণ লইয়া বিচার—কাব্যের অন্তর্গত হৃদয়াবেগ-মূলক ভাবগুলিকেই মুখ্য করিয়া, তাহারই পরিচয় ও দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, এবং তাহা দ্বারাই কাব্যের মূল্য নিরূপণ করা হয়; যে বিশিষ্ট রূপে সেই ভাবাবেগ রূপ পাইয়াছে, তাহার পরিচয় দেওয়া হয় না। (আমাদের দেশের সাহিত্য-সমালোচনায় সাধারণত এই দুই পদ্ধতিই প্রচলিত আছে।)

(৩) মূল কাব্যের উপরে কারুকার্য্য করিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন কিছু গড়িয়া তোলা।

আমি এই তৃতীয় দোষটির কথাই বলিতেছিলাম, এবং এই সম্বন্ধেই আমার কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করি। কোনও কাব্যকে উপাদানস্বরূপ ব্যবহার

করিয়া নূতন কিছু রচনা করা সেই কাব্যের ব্যাখ্যা বা রসপরিচয় নয়। অন্যান্য বহু কাব্য হইতে কাব্যের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ স্থির করিয়া এবং তাহা হইতেই কয়েকটি সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া, সেই সূত্র অনুসারে কাব্য বিচার করিলেও তাহাতে কাব্যবিশেষের পরিচয় দেওয়া হয় না। কবি-চরিত, কবি-মানস ও কাব্যগত কল্পনা, এই তিনটিকে মিলাইয়া, এবং কাব্যের অন্তর্ভূত সকল উপাদানকে সকল দিক হইতে দেখিয়া, যতদূর সম্ভব, সেই কাব্যখানি ছাড়া আর কোনও কাব্যের প্রভাব মন হইতে দূরে রাখিয়া—যেন সেই কবি ও কাব্যের সহিত একাত্ম হইয়া, যদি তাহার বিশিষ্ট রূপটিকে হৃদয়গোচর করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয়, তবেই কাব্য-পরিচয় সাধ্যমত যথার্থ হইতে পারে। এ কথাও অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, সমালোচকের প্রকৃতিগত একটা সহজ সহানুভূতিও চাই; তাঁহার নিজের কোনও বদ্ধ সংস্কার বা বিরুদ্ধ মনোভাব থাকিলে চলিবে না। সেই কল্পনা-শক্তি তাঁহার চাই, যাহা দ্বারা তিনি আত্মভাবমুক্ত হইয়া অপরের ভাবে ভাবিত হইতে পারেন। এইজন্য, যাঁহারা অতিশয় আত্মভাবপরায়ণ, বা কোনও তত্ত্ববিশেষের অভিমুখী যাঁহাদের মন, তাঁহারা যে কোনও কবি বা কাব্যের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই, ইহার বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যেই আছে। মধুসূদনের কাব্য-পরিচয় লিখিতে, আমি মধুসূদনের কবি-জীবন ও কবি-মানসকে যতদূর সম্ভব একালের সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ সহানুভূতির সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; সেই কালের প্রবৃত্তি ও সেই যুগসন্ধির সকল সমস্যা ও সঙ্কটকে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, বাংলা সাহিত্যের সেই নবজন্মক্ষণের গ্রহসন্নিবেশ-ফল অবধারণ করিয়াছি; এবং, সেই সঙ্গে মধুসূদনের কাব্য দীর্ঘকাল ধরিয়া বিশ্লেষণ, ও নানা দিক হইতে তাহার ভাব-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, একই সঙ্গে কবি ও কাব্যের অন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহার ফলে, যাহা হইয়াছে তাহা যদি কবির নিজস্ব কল্পনার অতি-রিক্ত বা বহির্ভূত কিছু হইয়া থাকে, তাহার বিচার করা আমার সাধ্য তো নহেই, এবং আশঙ্কা হয়, একালের অপর কাহারও সাধ্য নয়। বাংলা সাহিত্যে যে ব্যাধি ও বিভ্রান্তির যুগ এখন চলিতেছে, কবি ও কাব্য সম্বন্ধে যে পণ্ডিতম্মন্য, আত্মভাবসর্ব্বস্ব, দাম্ভিক মনোভাবের ডিমোক্র্যাসি প্রবল হইয়াছে—তাহার অবসানে যদি সত্যকার সাহিত্যবোধ ও রসদৃষ্টি কখনও ফিরিয়া আসে, তবেই সেই ভবিষ্যতের দিব্যতর দৃষ্টিসম্পন্ন ক্রিটিক আমার ভুল সংশোধন করিবেন।

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র গঠন সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলা আবশ্যক। কবি নিজেই এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

I think I have constructed the Poem on the most rigid principles, and even a French critic would not find fault with me.

ইহা যে অতিশয় সত্য, তাহা যে কোন সাহিত্যপণ্ডিত স্বীকার করিবেন। মহাকাব্য বা দীর্ঘ কাহিনী-কাব্যের যে গ্রন্থন-নৈপুণ্য—সর্ব্ব অঙ্গের বিন্যাস-পারিপাট্যে কাব্যের যে সংহতি-সুষমা—তাহা বোধ হয়, আমাদের সাহিত্যে এই 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'ই প্রথম। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যের তো কথাই নাই, পরবর্ত্তী মহাকাব্য—হেম ও নবীনের কাব্যগুলির তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, কবিশিল্পীর এই শ্রেষ্ঠ সাধনা আর কোথায়ও এমন সিদ্ধিলাভ করে নাই। এখানেও, মধুসূদনের শুধু প্রতিভাই নয়, সেকালের পক্ষে যাহা অনন্যসুলভ ছিল, সেই খাঁটি সাহিত্যিক শিক্ষা বা উৎকৃষ্ট কাল্‌চারের প্রমাণ পাওয়া যায়। যুরোপীয় ক্লাসিক্যাল মহাকাব্যগুলি গভীর রসগ্রাহিতার সহিত পাঠ করার ফলে মধুসূদনের সেই শিক্ষা, হইয়াছিল, যাহা এ দেশের মহাকাব্য বা কাহিনী-কাব্যের আদর্শ বা রীতি হইতে লাভ করা সম্ভব ছিল না। একটা বিষয়বস্তু, ঘটনা, বা চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া আদি, মধ্য ও অন্ত-যুক্ত কাহিনী-বচনা—আমাদের দেশে এরূপ কাব্যের রীতি নয়। সে কাব্যের কাহিনীর দুই মুখ—আদি ও অন্ত খোলাই থাকে, গল্পের ধাবা যেন বহিয়াই চলে, এবং তাহা যথাস্থানে সমাপ্ত হইলেই হইল। সে সমাপ্তির জন্য পূর্ব্বাপর সকল অংশের সমান প্রয়োজনীয়তা নাই; কাহিনীর সেই পরিণাম অনুযায়ী অংশগুলির সামঞ্জস্য-জ্ঞান বা উপাদানের পরিমাণবোধ নাই। কাহিনীর কেন্দ্রটিকে ঘেরিয়া সকল উপাদান-উপকরণকে সুপরিমিত ও সুবিন্যস্ত করার যে শিল্প-চাতুর্য্য, সেদিকে আমাদের কবিদের—কি সংস্কৃতে কি ভাষায়—কোনও লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহাকাব্যে বিষয়ের একটা গাম্ভীর্য্য ও বিস্তৃতি এবং নানা রসের অবতারণা করিবার জন্য বর্ণনার বহুল বৈচিত্র্য থাকিলেই হইল; কাহিনীকে সর্ব্বপ্রকার অবান্তর বাহুল্যবর্জ্জিত করিয়া, তাহার অবয়বগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, পাঠকের চিত্তে একটি সুপরিস্ফুট রসরূপ জাগ্রত করা—আমাদের কাব্য-শিল্পের আদর্শ ছিল না; তাহার কারণ, আমাদের রসবোধ অনেকখানি বস্তুনিরপেক্ষ ছিল। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম এই যুরোপীয় কাব্যকলাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। কাব্যের কেন্দ্র ও

পরিধি গোড়া হইতে স্থির করিয়া নয়টি সর্গে তিনি পর পর যে বস্তুযোজনা করিয়াছেন; সামান্য আখ্যান-টুকুকে যেরূপ সাবধানতার সহিত বিস্তারিত করিয়াছেন; সর্গগুলির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য ও যথাস্থান যেভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মূল-কাহিনীর গতিধারা যেরূপ অব্যাহত রাখিয়াছেন—তাহাতে কাব্যখানি, গঠনে ও গাঢ়বন্ধতায়, প্রায় অনবদ্য হইয়াছে। কাহিনী-রচনায়, আমাদের সাহিত্যে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যকাব্য-গুলিতে, এই গুণ আরও অধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। অথবা এ তুলনাও ঠিক হইল না; এইরূপ তর-তম বিচার এ ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত নয়; ইহাই বলিলে ঠিক হইবে যে, এ গুণ মধুসূদনের রচনাতেই সর্ব্বপ্রথম পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। সর্গগুলির নামের দিকে দৃষ্টি করিলেই বুঝা যাইবে, কবি কত সাবধানে কাব্যের অঙ্গযোজনা করিয়াছেন। এ কাব্যে শাখা-কাহিনী মাত্র একটি আছে—"অশোকবন" নামক সর্গে সেই সীতা-সরমা-সংবাদ কাব্যের কোন্ দিক পূর্ণ করিয়াছে, সে আলোচনা পূর্ব্ব-প্রসঙ্গে করিয়াছি। অন্যগুলির প্রত্যেকটি মূল ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট—কোনটি মুখ্য, কোনটি গৌণ ভাবে। তৃতীয় সর্গ "সমাগম" এবং সপ্তম সর্গ "প্রেতপুরী"—এই দুইটা সর্গের উদ্ভাবনায়, কবি তাঁহার কল্পনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন। প্রথমটি ঘটনাহিসাবে গৌণ হইলেও, ওই একটিমাত্র সর্গে কবি এ কাব্যের নায়িকাকে মুখ্যভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার সুযোগ লইয়াছেন। সে হিসাবে এ সর্গ কাব্যের একটি প্রধান অঙ্গ হইয়াছে। দ্বিতীয়টি কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট না হইলেও, এ কাব্যের পরিকল্পনার বহির্ভূত নয়। তথাপি ইহার সংযোজনে নয়—রসের পাক-কৌশলেই—কিঞ্চিৎ দোষ আছে, সে কথা পরে বলিব। অপর সর্গগুলিতেই মূল আখ্যান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের একটিও অসংলগ্ন বা বাহুল্য-দোষদুষ্ট নয়। ইহাকেই বলে—"economy of means" বা উপকরণ-বাহুল্যের অভাব; ইহাই উৎকৃষ্ট স্টাইল, এবং ইহাতেই আছে সাহিত্যিক বিবেকবুদ্ধির পরিচয়। যাত্রীর নৌকা ও বোঝাই লইবার নৌকায় গঠনের যে পার্থক্য যে কারণে আছে—রসিকের হৃদয়গ্রাহী হইবার এবং অরসিকের জঠর পূর্ণ করিবার যে দুই প্রকার কাব্য—তাহাদেরও, গঠনে ও উপকরণ-সংগ্রহে সেইরূপ পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। মধুসূদনের কাব্যের সঙ্গে সে যুগের অপর মহাকাব্য-গুলির তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, কেবল কল্পনার স্রোত বা উপকরণ-বাহুল্যই কাব্যের গৌরব নয়, এমন কি, ভাবের উচ্চতা বা বিষয়ের

বিরাটত্বই কাব্যগত উৎকর্ষের প্রমাণ নয়; বিরাটই হউক, আর ক্ষুদ্রই হউক—কল্পনা যদি মেরুদণ্ডহীন হয়, এবং উপকরণের পরিমাণ অনুযায়ী গঠন-নৈপুণ্য না থাকে, তাহা হইলে রচনার সেই শিথিল, অসংলগ্ন মেদবহুল বপু সত্যকার রসরূপ ধারণ করিতে পারে না। যাঁহারা একটু মনোযোগের সহিত 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র এই গঠননৈপুণ্য লক্ষ্য করিবেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, কেবল নূতন ভাষা, নূতন ছন্দ ও নূতন কল্পনাভঙ্গি নয়—মধুসূদন, কাব্যরচনায় এই যে শিল্পীজনোচিত বিবেকবুদ্ধিকে মান্য করিয়াছিলেন—ইহাও বাংলা কাব্যে কাব্যকলার এক নূতন ও অত্যাবশ্যক আদর্শ-প্রতিষ্ঠার মত। ইহা প্রকৃত সৃষ্টিশক্তিরও একটি অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ। সে যুগের আর কোনও কবির—হেম, নবীন, বিহারীলাল, কাহারও—কবিত্ব যে পরিমাণেই থাকুক—এই শক্তি ছিল না।

কিন্তু এই গঠন-পারিপাট্য সত্ত্বেও এ কাব্যের কল্পনা সর্ব্বত্র নিশ্ছিদ্র ও নির্দ্দোষ নয়, এ প্রসঙ্গে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। 'মেঘনাদবধ-কাব্য' পাঠকালে একটা কথা এই মনে হয় যে, কবির মূল প্রেরণা বা কল্পনা ভিতরে ও বাহিরে নানা বাধা ও বিরোধের সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইয়াছে; এবং সেই সংগ্রামে কবি জয়ী হইলেও, কাব্যের অঙ্গে তাহার আঘাত-চিহ্ন মুছিয়া যায় নাই। এজন্য 'মেঘনাদবধ-কাব্য' মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্যকীর্ত্তি হইলেও মনে হয়, তাঁহার কাব্য-সাধনা অসমাপ্ত রহিয়াছে। যে শক্তির পরিচয় ইহাতে আছে, এই সাধনায় আরও একটু অগ্রসর হইলে সে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ ঘটিতে পারিত। 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র পরে যেমন 'মেঘনাদবধ', তেমনই 'মেঘনাদবধে'র পরে আরও অন্তত একখানি এই ধরনের কাব্য মধুসূদনের লেখনী-অগ্রে অপেক্ষা করিয়াছিল; কবির খেয়াল কিন্তু ঐখানেই শেষ হইয়া গিয়াছে। 'মেঘনাদবধে'র ভাষা ও ছন্দসঙ্গীত শ্রেষ্ঠ কবিশক্তির নিদর্শন হইলেও তাহাতে যথেষ্ট অনভ্যাসের ত্রুটিও আছে। আবার, বিলাতী ও দেশী কাব্যরীতির সমন্বয়-সাধনে তিনি যতখানি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহাতেও স্বচ্ছন্দ কবিপ্রেরণার সঙ্গে সজ্ঞান অভিপ্রায়ের সংঘর্ষ বহুস্থলে লক্ষ্য করা যায়। এই সজ্ঞান অভিপ্রায়ের ফলেই কোথাও বা জবরদস্তি এবং কোথাও বা অনাবশ্যক অধীনতা-স্বীকারের দোষ এ কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদিকে য়ুরোপীয় কাব্য-ভঙ্গির অতিরিক্ত আকর্ষণে কবির সহজ কল্পনাস্রোত তটমৃত্তিকা-স্তূপে আবিল হইয়াছে; অপর দিকে তৎকালের একমাত্র উপযুক্ত পাঠক-সমাজের, সেই সংস্কৃত পণ্ডিতগণের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া ভাষায় ও অলঙ্কার-বিন্যাসে পুরাতন রীতির

আতিশয্য ঘটিয়াছে। আমি যে গঠন-পারিপাট্যের কথা বলিয়াছি—তাহারই শিল্পীজনসুলভ সংযম এই কাব্যের রসরূপ বজায় রাখিয়াছে; ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বপ্রকার বাধা সত্ত্বেও, নানা ত্রুটি বিদ্যমানেও, কবির কল্পনা-তরণী কূলে আসিয়া পৌছিয়াছে। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র প্রতি ছত্রে অনুভব হয়—এ কবির দুঃসাহস কতখানি এবং কেবলমাত্র প্রতিভার বলেই সেই দুঃসাহস কি অসাধ্যসাধন করিয়াছে! ইহাও মনে হয় যে, এ কাব্যের যত কিছু ত্রুটির কারণ—কবির শক্তির অভাব নয়, ধৈর্য্যের অভাব; নিজ শক্তির সহিত সেই শক্তির প্রয়োগক্ষেত্রের পরিচয় সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, কবি তাহাকে আক্রমণ করিয়া জয় করিতে চাহিয়াছেন; জয় যে করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের প্রমাণ রহিয়াছে। এই বলপ্রয়োগের আরও কারণ আছে। এ কাব্যের মূল প্রেরণা যে খাঁটি কবি-প্রেরণা, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বাংলা সাহিত্যের তদানীন্তন অবস্থা ও মধুসূদনের বিশিষ্ট শিক্ষা-দীক্ষার-কারণে—তাঁহার ব্যক্তিগত কাব্য-সংস্কার এবং জাগ্রত সাহিত্যিক বুদ্ধির বশে—সেই প্রেরণা কতকগুলি বহির্গত ধারণার দ্বারা পীড়িত হইয়াছে; তাঁহার সেই বিদ্রোহী রোমাণ্টিক কল্পনাও কতকগুলি বাঁধা রীতির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে; তাহাতে এক দিকে যেমন ফল ভাল হইয়াছে, তেমনই আর এক দিকে কোন কোন অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণাকে যেন জোর করিয়া সজ্ঞান অভিপ্রায়ের বশীভূত করা হইয়াছে। ইহাও একরূপ আত্মনিগ্রহ—কল্পনার স্বাভাবিক গতিকে ক্লিষ্ট করিয়া কেবলমাত্র শক্তির পরিচয় দিবার জন্য, কোথাও বা তাহার স্ফূর্ত্তির হানি করা হইয়াছে। এইবার ইহারই দৃষ্টান্ত দিব।

'মেঘনাদবধে'র দ্বিতীয় সর্গের নাম "অস্ত্রলাভ"। ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে লক্ষ্মণকে অমোঘ দিব্য অস্ত্রবলে বলীয়ান করিবার জন্য, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবদেবী-গণকে এই সর্গে অবতীর্ণ করা হইয়াছে—মূল কাহিনীর ঘটনা-অংশের সহিত এ সর্গের সম্পর্ক এইটুকু মাত্র। এইরূপ কল্পনা সঙ্গত বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই অস্ত্রলাভের প্রয়োজন আর থাকে নাই, এজন্য, এই সর্গে কবির অভিপ্রায় স্পষ্টতই অন্যবিধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হোমারের মহাকাব্যের নজির ও তথা য়ুরোপীয় কাব্যশাস্ত্রের বিধান অনুসারে, কবি এখানে স্বর্গ ও দেবদেবীগণের বৃত্তান্ত তাঁহার মহাকাব্যের অঙ্গীভূত করিতে চাহিয়াছেন—এবং সেই সুযোগে বাংলা কাব্যে, দেবদেবীগণের সহিত মানব-সংসারের একটা নূতনতর সম্পর্কের যে চিত্র,

তাহারই রস সঞ্চারিত করিয়া, কবি-কল্পনার নিরঙ্কুশতার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন। এখানে কবি, শুধুই কাব্যসৃষ্টি নয়, তাহারও অতিরিক্ত একটা প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন; তদানীন্তন বাংলা কাব্যের জড়তা মোচন এবং কবি-কল্পনার অধিকার বিস্তার করার একটা সংস্কারক-মনোভাব তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কবি সে কথা স্পষ্ট করিয়া ঘোষণাও করিয়াছেন, পত্রে বন্ধুকে লিখিতেছেন—

I would sooner reform the poetry of my country than wear the imperial diadem of all the Russias.

সেকালের বাংলা কাব্যের অবস্থা মনে করিলে, এ সর্গে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, সমুদ্র ও পৃথিবী লইয়া যে নূতন কবিত্বময় বর্ণনার বহু সুযোগ মিলিয়াছে তাহাতে, ইহার যে কোন মূল্য নাই, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু ইহাও অনুভব করি যে, কেবল বর্ণনার জন্যই বর্ণনা চলিয়াছে, কবি যেন এখানে তাঁহার কবিশক্তি অপেক্ষা কাব্যবিদ্যার দ্বারাই তাঁহার কল্পনার পক্ষ সংস্কার করিতেছেন। হিন্দুপুবাণ ও লোক-সাহিত্যের দেবদেবী-লীলার দৃষ্টান্তে তিনি গ্রীক পুরাণের দেবদেবীগণের চরিতাদর্শ তাঁহার কাহিনীতেও প্রতিফলিত করিতে সাহস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কল্পনা গ্রীক ও হিন্দু পুরাণের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই, অর্থাৎ গ্রীককে হিন্দু করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে মধুসূদনের কল্পনার পদস্খলনের আর একটা কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে, তিনি ভাবিয়াছিলেন সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণ, অর্থাৎ, আমাদের ক্লাসিক্যাল আদর্শের দেব-দেবী-কথাকে বাংলার গ্রাম্য-সাহিত্যের দেবদেবী-উপাখ্যানের সহিত মিলাইয়া লইলেই, গ্রীক-পুরাণ-সম্মত দেব-দেবী-চরিত্রকে সহজে বাংলার কাব্যভূমিতে রোপণ করা যাইবে। কিন্তু, ইহাতেই রসাভাস ঘটিয়াছে। গ্রীক ও সংস্কৃত দুই আদর্শ যেমন স্বতন্ত্র, প্রাচীন ভারতীয় ও খাঁটি বাংলা আদর্শও তেমনই স্বতন্ত্র। কালিদাসের কুমাবসম্ভবের হরপার্ব্বতী, ও অন্যান্য দেবতা, খাঁটি হিন্দু-সংস্কৃতিপ্রসূত উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার সৃষ্টি—তাহাদের মধ্যে যে মানবীয় গুণ আছে, তাহাতে হিন্দু-ভাবুকতার বৈশিষ্ট্য জাজ্জ্বল্যমান। গ্রীক দেবদেবীর উপাখ্যানে যে বিশিষ্ট কাব্য-সৌন্দর্য্য আছে, মধুসূদন সেই রসে তাঁহার নব্য কাব্য-কল্পনাকে উজ্জ্বল করিবার জন্য ঐ তিন আদর্শকেই মিলাইতে গিয়া কল্পনার সাম্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। হিন্দু ও গ্রীক পুরাণ সম্বন্ধে মধুসূদন তাঁহার মনোভাব পত্রাবলীর মধ্যে এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—

Though as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors.

এবং

It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own.

কিন্তু এ বিষয়ে কার্য্যত তিনি, হিন্দুপুরাণ নয়, গ্রীক পুরাণের দিকেই ঝুঁকিয়াছেন, এবং এই দুইয়ের মধ্যে কল্পনার স্বষ্টিধর্ম্মসুলভ সমন্বয়সাধন করিতে পারেন নাই। এ কাহিনী একেবারে গ্রীক হইবার প্রয়োজনও ছিল না—গ্রীক-কল্পনাভঙ্গিই যথেষ্ট হইত; হিন্দু দেবদেবীদের লৌকিক চরিত-চিত্রে আমাদের সাহিত্য ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই সাহায্যে গ্রীক আদর্শের মহাকাব্যীয় আখ্যান রচনা করা দুরূহ হইত না। কিন্তু কবির কল্পনা এই লোক-সাহিত্যের ভূমিতে বিচরণ করিবে না—সংস্কৃত কাব্যপুরাণের ছাপ না থাকিলে সে কল্পনার ক্লাসিক-কৌলীন্য নষ্ট হয়; অথচ সেই খাঁটি বাংলা লৌকিক দেবদেবী-চরিতই গ্রীক-কল্পনার উপযোগী। আমাদের শীতলা, মনসা, মঙ্গলচণ্ডীকেই একটু মাজিয়া ঘষিয়া লইতে পারিলেই ভাল হইত; তাহা না করিয়া তিনি সংস্কৃত কাব্যপুরাণকে এই উপপুরাণের সঙ্গে মিলাইতে গিয়া রসাভাস ঘটাইয়াছেন। ইহার কারণ, তাঁহার ধৈর্য্যের অভাব, এখনও তিনি তাঁহার কবিশক্তিকে সম্পূর্ণ বশে আনিতে পারেন নাই।

এমনই, আর একটি সর্গে, প্রায় একই কারণে, মধুস্থদনের কল্পনা কেবলমাত্র বলশালিতার পরিচয় দিয়াছে, স্বষ্টির সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। অষ্টম সর্গে তিনি যে "প্রেতপুরী'র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কেতাবী কাব্য-বিদ্যার পরিচয় যতটা আছে—নানা কবিচিত্তফুলবনমধু আহরণ করিবার পটুতা তাহাতে যেমন প্রকাশ পাইয়াছে—কল্পনার স্ফূর্ত্তি তেমন ঘটে নাই। এ সর্গের বর্ণিত বিষয় কাব্যের মূল ঘটনার সঙ্গে অতি সামান্য স্থত্রে যুক্ত হইয়াছে। তথাপি, কাব্যরসের বৈচিত্র্য-সম্পাদনের জন্য কবি-কল্পনার এইরূপ স্বাধীন-বিচরণ বাঞ্ছনীয়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে বিচরণ স্বচ্ছন্দ হয় নাই। বেশ বুঝিতে পারা যায়—কবির নিজস্ব প্রকৃতি যাহার অনুকূল নয়, তাহাকেই একটা দুরূহ অথচ অত্যাবশ্যক কর্ম্ম মনে করিয়া, কবি যেন একটা কঠিন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবার অমানুষিক উদ্যম করিয়াছেন। বিদেশী সাহিত্যের রূপ বাংলা-ভাষায় ধরিয়া দিবার সফল চেষ্টা এই সর্গের অনেক স্থানে আছে—নব্য বাংলাভাষার শক্তি-পরীক্ষা হিসাবে এই উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু মধুস্থদনের প্রেতপুরী-বর্ণনা ঘনঘটায় যতটা চমকপ্রদ,

রসপ্রেরণায় তাহা তেমনই নিষ্ফল হইয়াছে। পাশাপাশি খ্রীষ্টীয় নরক ও গ্রীক প্রেতপুরী, এবং তাহার সঙ্গে হিন্দুপুরাণের ছিটা-ফোঁটা মিশাইয়া তিনি যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকের চিত্তে একটা সমূলক কল্পনার আবেশ সৃষ্টি করে না। নরকবর্ণনাও যেমন একটা কৃত্রিম বীভৎস রসের উদ্রেক মাত্র করে, তেমনই, গ্রীক 'ভূত-দেশ' বা 'ছায়াপুরী'র অনুকরণে বর্ণিত বীরলোক অথবা পিতৃগণের পুণ্যলোক, পাঠকের মনে কিছুমাত্র সম্ভ্রম উদ্রেক করে না—সমস্তটাই বালকপাঠ্য রূপকথার মত হইয়াছে। নরক-বর্ণনায়, দান্তের কাব্য তাঁহার আদর্শ থাকা সত্ত্বেও, তিনি যে দান্তের নরক ও প্রায়শ্চিত্ত-নরকের সেই হৃদয়স্তম্ভনকারী, অপূর্ব্ব ত্রাস-সঞ্চারী কল্পনার কণামাত্র আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ, তাঁহার কবি-প্রকৃতিই তাহার বিরোধী ; তাই একটা বহির্গত অভিপ্রায়সিদ্ধির তাড়নায়—কাব্যে একটা সম্পূর্ণ নূতন কিছু সমাবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষায়—কেবল কাব্যকলা-কুতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি এই সর্গে একটু দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। কবি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন—তিনি যে এ সর্গে, কাব্যরসের পরিবর্ত্তে একটা বিদ্যারসের সৃষ্টি করিয়াছেন, পাশ্চাত্য মহাকাব্যগুলি হইতে কতকগুলি চিত্র কোনরূপে একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন, এবং তাহাতে একরূপ কাব্য-কসরতের গরিমাই আছে, তাহা স্বীকার করিয়া বন্ধুকে এই সর্গ সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"There is an intellectual treat in store for you, my boy"। ইহার ঠিক পরের ছত্রটি বড়ই অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয়, যথা—"I shall never again attempt anything in the heroic line"—একই নিশ্বাসে এ কথাও বলিবার যে কারণ, তাহার উল্লেখ আমি করিয়াছি। এই দুইটি সর্গ ভিন্ন এ কাব্যে মধুস্দনের কল্পনার শৈথিল্য আর কোথাও নাই। তথাপি এই সকল কারণে মনে হয়, প্রতিভার আকস্মিক জাগরণে—শক্তির প্রাবল্য ও প্রাচুর্য্যে—তিনি যেন অতিশয় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, নিজ শক্তি-পরীক্ষার কৌতূহলই তখন কাব্য-প্রেরণাকেও বিচলিত করিতেছে। তাই এ কাব্য পাঠ করিবার সময়ে সেই শক্তির অসামান্যতায় যেমন বিস্মিত হই, তেমনই কাব্যসৃষ্টিতে সেই শক্তির সাধনা যে এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহাও অনুভব করি।

এই প্রসঙ্গে আমি এ কাব্যের পাশ্চত্য প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই পাশ্চাত্য প্রভাব সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলিবার, তাহা এই আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে বহুবার বলিয়াছি—পরে, 'মেঘনাদবধে'র কবি-ভাষা ও কবিত্ব-লক্ষণ

সম্বন্ধে আলোচনাকালে আরও কিছু বলিবার অবকাশ হইবে। এক্ষণে, কবি তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ছাঁচ ও তাহার কল্পনায় গ্রীক আদর্শ অনুসরণের যে কথা নিজেই একাধিক বার প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব। তাঁহার একটি উক্তি এইরূপ—

I shall not borrow Greek stories, but write, rather try to write—as a Greek would have done.

'পদ্মাবতী'-নাটকে তিনি যেমন গ্রীক উপাখ্যানকেও কাজে লাগাইয়াছেন, 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' সেরূপ কিছু করেন নাই, ইহা সত্য; এবং এই কাব্যের কল্পনাভঙ্গিতে তিনি যে কিছু কিছু গ্রীক আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার অপর একটি উক্তি—এই কাব্য যে three-fourths Greek, অর্থাৎ বার-আনা গ্রীক—ইহা সত্য নহে। তাঁহার কবি-প্রকৃতিতে একটা healthy paganism বা চিন্তালেশহীন সুস্থ দেহাত্মবাদ ও আধ্যাত্মিকতাবর্জ্জিত জীবন-রস-রসিকতা ছিল, তাহা খাঁটি ভারতীয় সংস্কারের বিরোধী হইলেও বাঙালীত্বের ও স্বভাব-কবিত্বের বিরোধী নয়। সেই জন্মগত প্রবৃত্তির বশে তিনি গ্রীক-কাব্যরসে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু সে আকর্ষণে, তাঁহার কবিচিত্ত হোমারের কাব্য-কল্পনা অথবা গ্রীক নাটকের ট্র্যাজেডি-ভাবনা, কোনটারই বশীভূত হয় নাই, তিনি হোমারের মত মহাকাব্য লিখিতে প্রয়াস পান নাই—'মেঘনাদবধে'র কাহিনীও সেরূপ কল্পনার উপযোগী নয়। মধুসূদন নিজেই তাহা স্বীকার করিয়া তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন—"Homer is nothing but battles"। আমিও 'মেঘনাদবধে'র কাহিনী ও তদন্তর্গত কল্পনার যে পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, এ কাব্যের প্রকৃতিতে বিদেশীর উপরে দেশীয় ভাবই জয়ী হইয়াছে। কেবল দেব-দেবীগণের চরিত্রকল্পনা ও মনুষ্যঘটিত ব্যাপারে তাহাদের সাক্ষাৎ সহযোগিতা—এইটুকু বাদ দিলে, হোমারের মহাকাব্যের সহিত এ কাব্যের আর কোন সাক্ষাৎ সগোত্রতা নাই। হিন্দু পুরাণের ছাপ যাহা আছে, তাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; দেবতাদের রূপ-কল্পনাতে বা তৎসম্পর্কিত বর্ণনায়, এবং বিশেষ করিয়া মনোগ্রাহ্য বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে চিত্রিত করিবার ভঙ্গিতে, গ্রীক কল্পনার যে অনুসরণ কোথাও কোথাও আছে, তাহাও কাব্যকলার বহিরঙ্গেই সীমাবদ্ধ, তাহাতে একটি নূতনতর রসের উদ্রেক হইলেও, সেজন্য সমগ্র কাব্যখানির প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য ঘটে নাই।

আর একটি বিষয়ে এই গ্রীক প্রভাব বিচার করিবার আছে। মধুসূদনের কাব্যে যে অদৃষ্টবাদের একটি প্রবল ভাবধারা প্রায় আদ্যোপান্ত রহিয়াছে দেখা যায়, তাহার নজীর সম্ভবত গ্রীক কাব্য হইতেই কবি লইয়াছিলেন; এবং ট্র্যাজেডি-কল্পনায় ইহার উপযোগিতা-বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য কবিদের নিকটেই ঋণী। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, তাঁহার অদৃষ্টবাদ প্রাচ্য সংস্কার ও বিশেষ করিয়া হিন্দু মনোভাবের ফল; এ অদৃষ্টবাদে খ্রীষ্টীয়ান পাপ-তত্ত্ব অথবা আদি গ্রীক-চিন্তার অহেতুক দৈব-স্বেচ্ছাচার—এ দুইয়ের কোনটাই নাই। মধুসূদনের দেবদেবীগণও এই অদৃষ্টের শাসন মানে, ইহার উপরে তাহাদেরও কর্তৃত্ব নাই। এ অদৃষ্ট এতই দুর্জ্ঞেয় যে, শেষ পর্য্যন্ত ইহা হিন্দুরই কর্ম্মবাদে আসিয়া দাঁড়ায়; এখানেও মধুসূদনের মজ্জাগত হিন্দুসংস্কারই জয়ী হইয়াছে। আবার, অষ্টম সর্গের নরকবর্ণনায় পাপ ও তাহার শাস্তির যে বর্ণনা আছে, তাহা গ্রীক-ভাবনার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে হিন্দুর পৌরাণিক কল্পনা মিশিয়াছে, এবং অনুতাপ বা অনুশোচনার জ্বালাই সে শাস্তিকে ভীষণতর করিয়াছে। এরূপ কল্পনায় অদৃষ্টবাদ অপেক্ষা স্বকর্ম্মফলভোগের নীতিবাদই প্রধান হইয়া উঠে, এবং তাহাই এই সর্গে কাব্যের রসহানির কারণ হইয়াছে। অদৃষ্টবাদ ও এইরূপ নীতিবাদের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য করিতে হইলে যতখানি তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, এবং তাহাকে কাব্যরসমণ্ডিত করিতে হইলে কল্পনার যে অধ্যাত্ম-গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আবশ্যক, মধুসূদনের কবিপ্রকৃতিতে তাহা ছিল না; তাই তাঁহার কাব্যে মূল অদৃষ্টবাদের বিরোধী ও বহির্ভূত এই তত্ত্ব নিতান্ত আগন্তুকের মতই কবির ভিন্নতর অভিপ্রায়-সিদ্ধির প্রয়োজনে আসিয়া পড়িয়াছে। তথাপি সহজাত হিন্দু মনোভাবের ফলে এ কাব্যের অদৃষ্টবাদে গ্রীক-অদৃষ্টবাদ যতটুকু প্রশ্রয় পায় নাই ততটুকুতেই, এ কাব্যের কল্পনা আধুনিক বা রোমাণ্টিক ভাবাপন্ন হইয়াছে।

অতএব সব দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, এ কাব্য যে বারো-আনা গ্রীক, মধুসূদনের এ দাবি স্বীকার করা যায় না; কেবল,—"I shall try to write as the Greek would have done"—এই উক্তির কথঞ্চিৎ সমর্থন করা চলে। এ কথারও অর্থ করিলে দেখা যাইবে, কবির অভিপ্রায় শুধুই গ্রীক কবির কল্পনা বা দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ নয়; সেই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে কাব্যের রূপ বা বাণী-রচনাতে—তাহার উপমা-অলঙ্কারেও—তিনি গ্রীক কাব্যরীতিকে আদর্শ করিবেন। গ্রীক ভাষার সহিত আমার কোন পরিচয় নাই—সে কাব্যের বাণীরচনার বৈশিষ্ট্য ইংরেজ

কবিদের কাব্যে যেখানে যতটুকু প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহারই সামান্য জ্ঞান আমার সম্বল ; অতএব এ প্রশ্নের সম্যক বিচার আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। মধুসূদনের ভাষায় যেখানে যেটুকু নবত্বের চিহ্ন আছে, তাহা প্রকাশভঙ্গিতে, এবং কোথাও কোথাও ভাবনা-ভঙ্গিতেও বটে। কিন্তু বাক্যগঠনে তিনি খাঁটি বাংলা ইডিয়ম ও সংস্কৃত শব্দ-যোজনারীতিই রক্ষা করিয়াছেন—এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। বাক্যগঠনে যেটুকু বিদেশী প্রভাব তাহার প্রায় সবটুকুই ইংরেজী। ভাষার লালিত্য বা ছন্দমাধুর্য্য বিষয়ে তিনি ল্যাটিন কবি ভার্জিলের আদর্শে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এ কথা নিজেই বলিয়াছেন। তাছাড়া, এই কাব্যে এত বিভিন্ন কবি ও কাব্যের প্রভাব আছে যে, গ্রীক প্রভাবও সেই প্রভাবের একটা দিক মাত্র। তথাপি এই প্রসঙ্গে ইহাও স্বীকার্য্য যে, মধুসূদনের কবিপ্রকৃতির সঙ্গে গ্রীক প্রকৃতির সগোত্রতা আছে—এ কথা আমি এ আলোচনায় বহুপূর্ব্বে বলিয়াছি। য়ুরোপীয় ভাব-কল্পনার অনুকরণ ও অনুসরণ এ কাব্যে যতটুকু আছে তাহা আকৃতিগত ; তাহার প্রকৃতিতে যে প্রভাব আছে তাহা গ্রীক নয়—আধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাব ; এবং সে প্রভাব সত্ত্বেও এ কাব্য খাঁটি বাংলা কাব্য হইয়াছে—পাশ্চাত্ত্য বা গ্রীক কাব্য হয় নাই।

মধুসূদনের সহজাত প্রতিভাকে পুষ্ট ও পরিণত করিয়াছিল নানা উৎকৃষ্ট দেশী ও বিলাতী কাব্যের গভীর ও দীর্ঘ অনুশীলন। মনে হয়, এ বিষয়েও তাঁহার সাক্ষাৎ আদর্শ মিল্‌টন। মিল্‌টন যেমন প্রাচীন য়ুরোপীয় ভাষায় ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং সেই বিদ্যাবত্তার ফলে তিনি তাঁহার প্রতিভাকে একটি অতি উচ্চ ও প্রশস্ত সারস্বত ভিত্তির উপরে স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, মধুসূদনের শক্তি ও বিদ্যা তদপেক্ষা যতই ন্যূন হউক—তিনি তাঁহার সেই বিদ্যা-সাধনার বলে বাংলা কাব্যে, যতদূর সম্ভব একটা উদার অথচ সুদৃঢ় চত্বর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মিল্‌টন প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের আত্মাটিকে পর্য্যন্ত যেমন করিয়া আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন—তাঁহার গ্রীক, ল্যাটিন বা ইটালীয় কাব্য-সংস্কার যেমন খাঁটি ছিল, মধুসূদনের সেরূপ ছিল না ; তাঁহার পক্ষে তাহা সম্ভবও নহে। প্রাচীন য়ুরোপীয় কাব্যের প্রভাব তাঁহার পক্ষে মাত্র সাহিত্যিক প্রভাবই ছিল—অর্থাৎ কাব্যরচনার রীতি ও আদর্শ তিনি অনেক পরিমাণে সেই সকল কবির নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই মূল কাব্য-সংস্কারকে তিনি আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই—অনুকরণ করিয়াছিলেন মাত্র। গ্রীক

প্রেতপুরীর কল্পনায় তিনি যে কবি-ভাবেও পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন নাই তাহার একটি কৌতুককর দৃষ্টান্ত দিব। ঐ সর্গে, পৃথিবীর তলদেশে যে "ভূত-দেশ" কল্পিত হইয়াছে, সেখানে পৌঁছিয়া রাম যখন মায়াদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—লঙ্কার যুদ্ধে হত রাক্ষস-বীরগণ ও সদ্যোনিহত মেঘনাদকে সেখানে তিনি দেখিতে পাইতেছেন না কেন, তখন মায়া তাঁহাকে বলিলেন—

> অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
> নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি !
> নগরবাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী
> যতদিন প্রেত-ক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
> যতনে ,—বিধির বিধি কহিনু তোমারে।

ইহাতে আমরাও বুঝিলাম যে, অন্ত্যেষ্টি শেষ হইলে মেঘনাদও এই ভূতলস্থ প্রেতলোকে বীরপল্লীতে আসিয়া বাস করিবেন। কিন্তু স্বর্গ সম্বন্ধে কবির নিজস্ব সংস্কার যে অন্যরূপ—এখানে তিনি হোমার ভার্জিলের অনুসরণ করিতেছেন মাত্র, তাহার প্রমাণ তিনি শেষ সর্গে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টি-বর্ণনায় দিয়াছেন। সেখানে অন্ত্যেষ্টি-শেষে বীর দম্পতী যে লোকে গমন করিল, তাহা গ্রীক-প্রেতপুরী নয়—হিন্দু-পুরাণের শিবলোক। কারণ,—

> আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী—
> "পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে
> আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষস-দম্পতী।

এবং—

> ইরম্মদবেগে অগ্নি ধাইলা ভূতলে !
> সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
> দেখিলা আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ-আসনে
> সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
> দিব্যমূর্ত্তি ! বামভাগে প্রমীলা রূপসী,
> অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে ,
> চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে !

তারপর—

> উঠিল গগনপথে রথবর বেগে ,

অতএব, মায়াদেবী-কথিত "বিধির বিধি" আর সত্য রহিল না। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, মধুসূদনের পক্ষে পাশ্চাত্য কাব্য-সংস্কারে পূরাপূরি দীক্ষিত হওয়া

অস্বাভাবিক বলিয়াই অসম্ভব। ইংরেজী কাব্যেও প্রথমে মিল্‌টন ও পরে ল্যাণ্ডর (W. S. Landor) যে ভাবে সেই ক্লাসিক্যাল কাব্য-কল্পনাকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তেমন আর কেহ পারেন নাই। কবি কীট্‌সের Hellenism-ও তাঁহার রোমাণ্টিক কবিচিত্তের পরকলার মধ্য দিয়া ভিন্ন রঙে রঙিন হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহার কবিতাও গ্রীক নহে। কিন্তু মিল্‌টনের কাব্যে যেমন এইরূপ সর্ব্বতোমুখী সাহিত্যিক সাধনার ফলে, হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালীয় ও ইংরাজী এই চারি কাব্য-ধাতুর মিশ্রণ হইয়াছে, মধুসূদনের কাব্যেও তেমনই সংস্কৃত ও য়ুরোপীয় ক্লাসিক এবং বাংলা এই তিন কাব্য-ধাতুর মিলন ঘটিয়াছে এবং সে কাব্যের মূল ধাতু যে বাংলা, তাহাতেও সন্দেহ নাই। মধুসূদনের কবি-প্রকৃতি ছিল রোমাণ্টিক, কিন্তু রচনাগত আদর্শ ছিল ক্লাসিক্যাল; তাহার কারণ, সেই প্রকৃতির উপরে ঐ জাতীয় সাহিত্য-চর্চ্চার ফলে একরূপ সংযম ও সুষমাবোধের শাসন আসিয়া পড়িয়াছিল। তৎসত্ত্বেও এই শাসন যে তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করিতেছিল, তাহার আভাস এই কাব্যেই যেমন আছে, তেমনই, তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যেও, একাধিক উক্তিতে, সেই ক্লান্তি ও পীড়াবোধ ধরা পড়িয়াছে। একটি উক্তি ইতিপূর্ব্বে প্রসঙ্গান্তরে উদ্ধৃত করিয়াছি—"I shall never again attempt anything in the heroic line"। আরও একবার লিখিয়াছেন—"I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after this"। "After this"-অর্থে 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র পর। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, 'মেঘনাদবধ-কাব্য' যদি বারো-আনা গ্রীক হয়, তবে তাহার কত-আনা খাঁটি।

এ কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ যেমনই হউক, তাহাতে যে কুফল অপেক্ষা সুফলই অধিক হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মধুসূদন এই পাশ্চাত্য প্রভাবের বশ্যতাস্বীকারে এক দিকে যেমন সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তেমনই অপর দিকে, সেই প্রভাবের জন্য দেশীয় রুচি-সংস্কারে আঘাত লাগার ভয়ও তাহার ছিল; সেই-জন্যই বোধ হয়, তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিনি তাঁহার কাব্যের অলঙ্কার-প্রসাধনে এত অধিকমাত্রায় সংস্কৃতের মন রক্ষা করিয়াছেন যে, তাহাতে অনেক স্থলে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। মহাকাব্যের সুবৃহৎ কলেবরে এই দুর্ব্বলতার চিহ্ন ততখানি দৃষ্টিকটু না হইলেও, সেগুলি না থাকিলেই এ কাব্য আরও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। মধুসূদন বার বার নিজেকে একজন বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিলেও, কাব্যরচনাকালে তিনি যে পাঠক-মণ্ডলীকে মনশ্চক্ষে সম্মুখে বিরাজমান

দেখিয়াছিলেন, তাহাদের ভয় সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই; ইহাই সেই "conscience" যাহা—"does make cowards of us all", এবং যাহার জন্য "the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought"। সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না—এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুই জনেই তাঁহার সহিত একমত। এই পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাবের পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটির মধ্যে আছে—বন্ধুকে এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন—

We, friend, are the men to turn away those beggars of pretenders, whom they call Pundits, but whom I call barren rascals !

এই পণ্ডিতদিগকে খুশি করিতে হইলে, কোন বিষয়ে নূতনত্ব করা চলিবে না, কারণ, (আর একখানি পত্রে)—

As for the old school, nothing is poetry to them which is not an echo of Sanskrit—they have no notion of originality.

আবার—

As for the new school, the poor devils do not know Bengali enough to understand what they read. [এখনকার নব্যসম্প্রদায় 'do not know Bengali enough to understand how they write।]

—এ যেন "ডাঙায়-বাঘ, জলে-কুমীর"। তথাপি জলের চেয়ে এই ডাঙার দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল—ঐ পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টির জন্য একটু বেশি করিয়া সংস্কৃত অলঙ্কারের মশলা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। তাহার জন্য সদ্য ফলপ্রাপ্তিও কিছু হইয়াছিল; কারণ 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হওয়ার পরে, তাহার ছন্দ লইয়া বড় বড় পণ্ডিতমহলে ধিক্কাররব উঠিলেও, এই সময়ে লিখিত তাঁহার পত্রে ইহাও জানা যাইতেছে যে—

Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say—হাঁ, উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয় নি।

কিন্তু সংস্কৃত কাব্যের রস-প্রেরণা এক জিনিস, আর সেই কাব্যের শাস্ত্রবিধির দাসত্ব সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। সংস্কৃত পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য যে বন্ধ্যা, এবং তাহাদের রসবোধ যে নির্ভরযোগ্য নয়, তাহা বুঝিয়াও, সে যুগের সেই প্রথম বিদ্রোহী কবিকে সেই পণ্ডিত-মনোভাবের সঙ্গে সন্ধি করিতে হইয়াছিল; নহিলে, তাঁহার কাব্যের

অর্থবোধ করিতে পারে এমন পাঠক-সমাজও মিলিত না। অতিশয় কৃত্রিম রীতির উপমা-অলঙ্কার তাঁহার মত কবির পক্ষে উপাদেয় না হইবারই কথা, এবং কাব্যে আদিরসের ছড়াছড়িও তাঁহার আদর্শসম্মত ছিল না; এ বিষয়ে তিনি তাঁহার বন্ধুকে আশ্বস্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন—

In the present work (মেঘনাদবধ-কাব্য) you will see nothing in the shape of "erotic similes" ; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon ; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha".

—কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এমনও হইতে পারে যে, দেশী ও বিলাতী প্রাচীন কাব্যগুলির উপমা-বিলাস, এবং তাহার প্রয়োগে যে একটি রীতি-নিষ্ঠা তিনি সর্ব্বত্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা কতকটা তাঁহারও রুচির অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল,—বিশেষ করিয়া মহাকাব্য-রচনায় ভাষার এইরূপ প্রসাধন অত্যাবশ্যক মনে করিয়া তিনি সেই শাস্ত্রশাসন মানিয়া লইয়াছিলেন। তথাপি এ বিষয়ে দেশীয় রুচিকে একটু অধিক প্রশ্রয় দিয়া তিনি তাঁহার নিজস্ব কল্পনার বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। মহাকাব্যের স্টাইল বজায় রাখিবার আগ্রহে তিনি যেমন প্রতিপদে বর্ণনার সাদৃশ্য যোজনা করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, তেমনই সেকালের সেই পাঠকবর্গের চিত্তে অতি সহজে ভাবোদ্রেক করিবার আশায়, জোর করিয়া, অতিশয় সুলভ, এমন কি, অনেক স্থলে রসহানিকর, উপমাও তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণের মনস্তুষ্টির জন্য যেমন বিশেষ বিশেষ অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত সন্নিবেশ করিয়াছেন, বাক্যার্থের নানা ভঙ্গিমাও দেখাইয়াছেন, তেমনই, যেখানে বাঙালী পাঠককে একটু মজাইবার বা কাঁদাইবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেইখানেই সুবিধামত একটু বৃন্দাবনী আবীর-কুঙ্কুম ছিটাইয়া দিয়াছেন—এটুকু দুষ্টবুদ্ধি তাঁহার ছিল, তিনি জানিতেন, মাঝে মাঝে একটু ব্রজের ভাব না মিশাইলে তাঁহার কবিত্ব মাঠে মারা যাইবে। আজিও মধুসূদন যে 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' লিখিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার কবিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, এবং তাহারই উল্লেখ করিয়া স্মৃতিসভার বক্তাগণ কীর্ত্তনাবেশে বিবশ বিহ্বল হইয়া পড়েন। তাই, এই কাব্যেরও একটি অতিশয় সঙ্কটময় স্থানে উদ্ধার পাইবার আশায় কবি আর কোন উপমার শরণাপন্ন হইলেন না—মেঘনাদের মৃত্যু-বর্ণনাকে করুণ-রসের চূড়ান্ত করিবার জন্য লিখিলেন—

মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি

ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি
আঁধারি সে ব্রজপুর গেলা মধুপুরে।

—কারণ, তখন অক্রূর-সংবাদই বাঙালীর চোখে বন্যা আনিবার সবচেয়ে বড় অস্ত্র, সেকালের tear gas। এমন দৃষ্টান্ত এ কাব্যে আরও আছে।

অতএব দেখা যাইবে, 'মেঘনাদবধ-কাব্য'রচনায় কবির নিজস্ব কল্পনা ও কবিভাব, নানা কারণে ও প্রয়োজনে, স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত হইতে পারে নাই। তথাপি, এত ত্রুটি সত্ত্বেও এ কাব্য বাংলা সাহিত্যে যে স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা চিন্তা করিলে মনে হয়, কেবলমাত্র প্রতিভার যে শক্তি, তাহা আমাদের সাহিত্যে এমন আর কোথাও দেখা যায় নাই। এই শক্তির সাধনায় কবি যদি আর কিছুকালও নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে, 'মেঘনাদবধ', 'বীরাঙ্গনা' অপেক্ষা আরও সুসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতর কাব্য যে বাংলা ভাষার সম্পদ ও গৌরব বৃদ্ধি করিত তাহাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। তাই ভাবিতে দুঃখ হয় যে, এতবড একটা প্রতিভাও এক হিসাবে, "Inheritor of unfulfilled renown" হইয়া রহিল!

আর একটি বিষয়ে কিছু বলিয়া আমি এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। 'মেঘনাদবধে'র কবি কাব্যারম্ভে "মধুকরী কল্পনা"কে আবাহন করিয়া তাঁহার কাব্যরচনা-রীতির পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাহারই ফলস্বরূপ গৌড়জনকে সুধাপান করাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়াছেন। সেই রীতিতে এইরূপ কাব্য সৃষ্টি করিয়া, মধুসূদন শুধু তাহাতেই সুধাপানের ব্যবস্থা করেন নাই—সে যুগের মৃতপ্রায় বাংলা কাব্যের পুনরুজ্জীবন-পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি যে একেবারে নব্য রোমাণ্টিক কাব্যের আদর্শ—যে কারণেই হউক—গ্রহণ করেন নাই, তৎপরিবর্ত্তে প্রাচীন মহাকবিগণের পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সে যুগের কাব্য-প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল; নতুবা অত্যধিক নবত্বের জন্য তেমন কাব্য-সৃষ্টি বিফল হইত। এই রীতির দ্বারাই যেমন বাংলা ভাষার বলাধান হইয়াছিল, তেমনই সাধু বাংলার ধ্বনি-প্রকৃতি হইতেই খাঁটি ছন্দসঙ্গীত সৃষ্টি হওয়ায় বাংলা কাব্যেরও নূতন করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ যে সম্পূর্ণ নূতন আদর্শে ও নূতন সুরে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহার ভাব, ভাষা, ছন্দের সেই অভিনবত্ব এইরূপ কাব্যের পূর্ব্বে দেখা দিলে, কেহ তাহা বুঝিত না—বাংলা কাব্যের সঙ্কট অবস্থা ঘুচিত না, সমস্যা যেমন তেমনই থাকিয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে যদিও মধুসূদনের সেই আদর্শের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গণ্য করা যায়, তথাপি বাংলা ভাষায়,

আধুনিক কাব্যরসের সহিত প্রথম পরিচয় সাধন করাইয়া দিয়া মধুসূদনই বাঙালী সমাজে যেটুকু রসগ্রাহিতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন—ছন্দে ও ভাষায় যে খাঁটি কাব্যকলা, এবং উদার স্বাধীন কল্পনায় যে নূতনতর রসবোধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আর কেহই এমনভাবে তাহা করেন নাই। অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায়, বাংলা কাব্যে আধুনিকতা অতঃপর যে পূর্ণস্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার আদি প্রবর্ত্তক মধুসূদন। রবীন্দ্রনাথ একেবারে ষোল আনা আধুনিক, বঙ্গসরস্বতীর অনবগুণ্ঠিত আধুনিক রূপ তাঁহার কাব্যে উত্তরোত্তর ফুটিয়া উঠিয়াছে—এ রূপ বাঙালী সহসা দেখিতে প্রস্তুত ছিল না, অনেক পরে দেখিয়াছে। মধুসূদন প্রাচীনকেই যতদূর সম্ভব আধুনিকরূপে সাজাইয়াছিলেন, তাহাতেই আধুনিক কাব্যমন্ত্রে বাঙালীর প্রথম দীক্ষালাভ হইয়াছিল; এবং যাহারা মধুসূদনের কাব্যের সেই রসরূপ যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল তাহারাই, সেই কাল্‌চারের ফলে, রবীন্দ্রপ্রতিভার অভিনবত্বে অভিভূত হয় নাই, এবং তাহারাই সর্ব্বপ্রথম সে প্রতিভা ও তাহার শক্তিকে বিশ্বাস করিয়াছিল। মধুসূদনের প্রধান কবি-ব্রত ছিল—পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় কাব্যসরস্বতীর মধ্যে মিলনসাধন করা, বাংলাভাষায় ও বাঙালীর "বাসনা"য় কাব্যের সার্ব্বভৌমিক রূপটিকে ধরাইয়া দেওয়া। এই কার্য্যসাধনে বাধা ও ত্রুটীর কথা বলিয়াছি, সে বিষয়ে সাফল্যের পরিচয়ও ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে দিয়াছি। এই সাফল্যের আর একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র নবম বা শেষ সর্গ। যে কল্পনায় পাশ্চাত্য ও ভারতীয় কাব্যবস্তু এমনভাবে মিলিয়া একটি অখণ্ড রসরূপ ধারণ করিয়াছে—একই স্থান-কাল-পাত্রে অভারতীয় আদর্শের শ্মশান-যাত্রা ও একান্ত ভারতীয় সংস্কারের সহমরণ-দৃশ্য এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে—সে কল্পনার মূলে আছে উৎকৃষ্ট সৃষ্টিশক্তি। বিষাদের এ হেন শৌর্য্যরূপ—মহানিপাতের তামসিক অশৌচ-অবস্থায় এমন রাজসিকতার আড়ম্বর,—আমাদের সংস্কারে ও সাহিত্যে ইহার মত অপরিচিত আর কিছুই নহে। তথাপি মধুসূদন তাহাকে কি সৃষ্টিসৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছেন! পাশ্চাত্ত্য কাব্যের সেই বিশিষ্ট বীররস—যোদ্ধ-হৃদয়ে অবসাদের পরিবর্ত্তে গর্ব্ব সঞ্চার করিবার জন্য, মৃতবীরের শববাহী শোভাযাত্রার সেই যে শোক-গম্ভীর ঔদ্ধত্য-গাথা—মধুসূদন তাহাতে এমন একটি সুর যোজনা করিয়াছেন যে, হিন্দুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সকল অঙ্গ এবং বাঙালী কুলবধূর অনুমরণ-দৃশ্যের নিখুঁত অনুলিপিও তাহার তালভঙ্গ করে নাই; তাহাতে বীরের বীর-অভিমান ও স্নেহ-দুর্ব্বল মানব-হৃদয়ের বিয়োগবিধুরতা যেন ঐক্যতানে

মিশিয়া গিয়াছে। সর্ব্বশেষে একই অনলমুখে চিতাধূমের সঙ্গে বিবাহধূম মিলিয়া যে রাগিণীর সৃষ্টি করিল তাহাই অতঃপর সেই শ্মশানপ্রান্তবর্ত্তী সিন্ধুজলকে অকূল অশ্রুরাশির মত অনন্তকাল ধরিয়া তরঙ্গিত করিতে লাগিল। এই নবম সর্গে যেমন কাব্যেরও সমাপ্তি হইয়াছে, তেমনই, আমি যাহাকে মধুসূদনের বিশিষ্ট কবিশক্তি বলিয়াছি—বিভিন্ন কাব্যধাতুকে গলাইয়া একই ছাঁচে ঢালিবার সেই শক্তি—এই শেষ সর্গেই চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

নবম অধ্যায়

মেঘনাদবধ-কাব্যের ভাষা ; তাহার কয়েকটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ , এই ভাষা এ কাব্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ; এ ভাষা কি অর্থে খাঁটি বাংলা ভাষা।

'মেঘনাদবধে'র ভাষা সম্বন্ধে সেকালের সমালোচনায় বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না—যেটুকু প্রশংসা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাহাকে আবেগের প্রশংসা বলা যাইতে পারে, সমালোচনার প্রশংসা নয়। সে-কালে কোন কাব্যকে উৎকৃষ্ট বলিতে হইলে, তাহার ভাষাও একই রকম ছিল, যথা—'এরূপ অলঙ্কারের ছটা, এরূপ শব্দের ঘটা, এরূপ ছন্দের বৈচিত্র্য, এরূপ ভাবের প্রস্রবণ, এরূপ কবিত্বের সাগর একত্র আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না'। কাজেই ভাষা সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা করিবার প্রয়োজন বা অবকাশ ছিল না ; বরং মধুসূদনের ভাষা সম্বন্ধে দুইটি অখ্যাতিই সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া উঠিয়াছিল ; প্রথমত, অভিধান হইতে অতিশয় দুরূহ ও শ্রুতিকটু শব্দের সঙ্কলন ; এবং দ্বিতীয়ত, বাক্যের গঠনে সরলতার অভাব ; তা ছাড়া, ব্যাকরণ-লঙ্ঘনের কথা তো আছেই। আমি এ সকল দোষের সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ভাষায় যে কবিশক্তির নিদর্শন আছে, তাহাতে খাঁটি কবিভাষার যে লক্ষণ আছে, তাহারই আলোচনা করিব ; কারণ ভাষাই কাব্যসৃষ্টির প্রধান উপাদান ; এবং এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ভাবে নয়—ভাবের প্রকাশ-সুষমাতে, অর্থাৎ ভাষার কারুশিল্পেই, প্রকৃত কবিশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। যে কবির ভাষায় সে লক্ষণ নাই, তাঁহার কাব্যে ভাবের একরূপ বিকাশ থাকিতে পারে—প্রকাশ নাই ; কারণ সে ভাব রসরূপ ধারণ করে নাই ; অতএব সে কবি সত্যকার কবি নহেন। মধুসূদনের কাব্যে আমরা যে শক্তির পরিচয় সর্ব্বাধিক পাই, তাহা তাঁহার ভাষার এই কবিত্বলক্ষণ ; ছন্দে ও বাক্যে তিনি বাংলা কাব্যের ধাতুকেই পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন ; বাক্যের সঙ্গীতগুণ, শব্দের নূতনতর প্রয়োগ ও মিলন-কৌশলে (phrase-making) সে ভাষার যে অপূর্ব্বত্ব—ভিন্ন ধরনে বিহারীলাল ব্যতীত সে যুগের আর কোন কবি বাংলাকাব্যের ভাষাকে তেমন শিল্প-কৌলীন্য দান করিতে পারেন নাই। সেকালের কাব্যরসিকেরা কাব্যের সমালোচনা করিতেন বিচার-বুদ্ধির দ্বারা ; সেই বিচারে, কাব্যের কাহিনীগত কল্পনার মনোহারিত্ব, ভাবের অর্থ-সঙ্গতি এবং

ভাষার ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-শুদ্ধি—মুখ্যত এই তিনটির দিকেই লক্ষ্য থাকিত, এবং ভাষা, কেবল গম্ভীর বা ললিত-মধুর এই দুইটি গুণের দ্বারা, প্রশংসার্হ বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের শাসন বা তজ্জনিত সংস্কার এড়াইবার মত স্বাধীন রসদৃষ্টি তাঁহাদের ছিল না; কাব্যের ভাষা যে শুধুই আলঙ্কারিক কবিভাষা নয়, সে ভাষাও যে কবির নিজেরই সৃষ্টি, তাহাতে মৌলিক ভাবকল্পনার ছাপ থাকে বলিয়াই সে ভাষা একটি বিশেষ কাব্যের বিশেষ রস আস্বাদনের উপায়স্বরূপ হইয়াছে—এরূপ ভাবনাই সে সমালোচনার বহির্ভূত ছিল। কোন সত্যকার প্রতিভাশালী কবি, আর পাঁচজন কবির মতই আর একজন কবি হইয়া, কেবল কবি-সমাজের সংখ্যা-বৃদ্ধিই করেন না, পরন্তু, একজন স্বতন্ত্র কবিরূপে কবিত্বের একটি নূতন দেশ জয় করিয়া, কাব্য-রাজ্যে সেই ভাষার অধিকার বিস্তার করেন, এই বোধ বা বিচার সেকালে রসশাস্ত্রীদের প্রয়োজনই হইত না। তাই, 'মেঘনাদবধের' ভাষা সম্বন্ধে—কাব্যের যাহা মুখ্য পরিচয় তাহার সম্বন্ধে—আমরা কোন বিশেষ আলোচনা এ পর্য্যন্ত হইতে দেখি নাই; শুধু 'মেঘনাদবধ' কেন, একালেরও কোন কাব্য-বিচারে কাব্যের সেই বাঙ্ময় রসরূপ সম্বন্ধে উপযুক্ত আলোচনা হয় না। আসল কথা, সাহিত্য-সৃষ্টিতে স্রষ্টার স্রষ্টৃত্বের প্রধান লক্ষণ যে স্টাইল—কাব্যের বাক্‌ভঙ্গির সেই বিশিষ্ট রূপ সম্বন্ধে সচেতন হইবার মত কাব্যরসজ্ঞান আমাদের সমাজে এখনও বিরল। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ভাষাই আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম কবিভাষা; অর্থাৎ, ভাষা এখানে সর্ব্বপ্রকারে কবির নিজস্ব প্রয়োজনের অধীন হইয়াছে; ছন্দে ও বাগ্‌বন্ধে, ধ্বনি ও রূপব্যঞ্জনায় তাহাকে কবির কল্পনা অনুযায়ী যে বেশবিন্যাস করিতে হইয়াছে, তাহাতে তাহার অভ্যস্ত রুচি ও রীতি-সংস্কারকে অনেকাংশে বর্জ্জন করিতে হইয়াছে, তাহার নিজের প্রকৃতিকেই যেন কাব্যের প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইতে হইয়াছে; তাহার ফলে, ভাষা শুধুই ভাষামাত্র নাই, একটি স্বতন্ত্র কবিভাষায় পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন-পন্থীরা হয়তো ইহার মর্ম্ম বুঝিবেন না, বলিবেন, ইহা আর নূতন কথা কি? এক এক কবির শব্দযোজনা-ভঙ্গি এক এক রূপ হয়, এজন্য আমাদের শাস্ত্রে কয়েকটি রীতি তো নির্দ্ধারিত করাই আছে; কবির ভাষা যেমনই হউক, তাহাকে এই-গুলির একটির মধ্যে পড়িতেই হইবে। অথচ ঠিক সেই কারণেই এইরূপ রীতি-সম্মত ভাষা কোন কবির বিশিষ্ট-কবিভাষা বা স্টাইল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; সেই রীতি-অনুযায়ী ভাষার যে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা অভিনব কবিভাষা নয়;

তাহাতেও ভাবের উপরে ভাষাই আধিপত্য করে—কল্পনার প্রকৃতি অনুসারে ভাষা আপন ধাতুতেই গলিয়া নূতন ছাঁচে ঢালাই লইয়া উঠে না; সেখানে ভাষাকে পৃথক করিয়া লইয়া তাহার লক্ষণ বিচার করা সম্ভব হয়। আমি অলঙ্কারশাস্ত্রের কথাই বলিতেছি, সংস্কৃত কাব্যের কথা বলিতেছি না। উৎকৃষ্ট কাব্যমাত্রেরই স্টাইল স্বতন্ত্র, তাহার ভাষার যে একটি রূপ আছে, তাহা সেই কাব্যেরই রূপ, অর্থাৎ তাহা সেই কাব্যের অন্তর্গত কবি-মানসেরই প্রতিমূর্ত্তি। সেই উৎকৃষ্ট কাব্যের ভাষাও যেমন আর সাধারণ কবিভাষা থাকে না, তেমনই যে ছন্দে সেই কাব্য রচিত হয় তাহা যদি একটি প্রচলিত সাধারণ ছন্দ হয়, তথাপি সেই ছন্দেও একটি স্বতন্ত্র সুর বাজিয়া উঠে—সেই কবিতার ভাব, ভাষার মত ছন্দকেও আপনার ছাঁচে ঢালিয়া লয়। কবির কল্পনা যদি তাঁহারই বিশিষ্ট রসকল্পনা হয়, অর্থাৎ (যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে হইয়া থাকে), যদি তাহা বাহিরের পূর্ব্ব-প্রচারিত ভাবকল্পনা হইতে সংক্রামিত একটা বীজের অঙ্কুর না হইয়া, কবির নিজের অন্তর হইতেই উদ্ভূত হয়, তবে তাহা ভাষায় যে কলেবর ধারণ করে, তাহা আকারে-আয়তনে, গঠনে-বর্ণে, চলনে-বলনে, চাহনিতে ও কণ্ঠস্বরে অনন্যসাধারণ হইবেই, এবং সেই সকলের মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী সুষমার সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিবে। কাব্যের ভাষা কাব্যের কলেবর বলিয়া, এবং তাহাতে এই সকল গুণ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে বলিয়া, কেবল শব্দযোজনার রীতিটিকে পৃথক করিয়া, সেই রীতির দোষগুণ বিশ্লেষণ করিলেই কবিভাষার সম্যক বিচার হয় না। কবিভাষার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিতে হইলে, বাণীবিন্যাস-ভঙ্গিই লক্ষ্য করিতে হয়, এবং সেজন্য, শব্দ-চয়ন ও তাহার প্রয়োগচাতুর্য্য, বাক্যগঠন-কৌশল, ও শব্দযোজনায় অ-পূর্ব্বপ্রচলিত পদ্ধতি —এ সকলই গণনীয় বটে, তথাপি তাহাতে কোন রীতির সন্ধান চলিবে না; কারণ সে সকল গুণও যদি ঐ কাব্যের বিশিষ্ট গুণ না হইয়া কাব্য-সাধারণের গুণ বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা হইলে সে ভাষাও যেমন স্টাইল নয়—রীতি মাত্র, তেমনই সে কাব্যও সৃষ্টি নয়—রচনা মাত্র।

মধুসূদনের ভাষার এই বৈশিষ্ট্য কোন রসজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবে না। এ ভাষা যে কোন্ অর্থে কবিভাষা, তাহা সেকালের অপর মহাকাব্যগুলির ভাষার সঙ্গে তুলনা করিলেই, বুঝিতে পারা যাইবে। গদ্যের ভাষাকে ছন্দোবদ্ধ করিলেই তাহা যে কবিতার ভাষা হয় না, তাহার প্রমাণ আমরা একালের অনেক ছন্দসর্ব্বস্ব কবিতায় পাইয়া থাকি। আবার, ভাবের উচ্ছ্বাসপূর্ণ অথবা বক্তৃতার উদ্দীপনাপূর্ণ

ভাষাও যে কবিতার ভাষা নয়, তার প্রমাণ—খাঁটি গদ্যেও উহা সম্ভব। মধুসূদনের সমসাময়িক কবিদিগের একটা সুবিধা এই ছিল যে, তখনও এখনকার মত একটা কৃত্রিম কবিভাষার সৃষ্টি হয় নাই; তখন নূতন গদ্যের ভাষাই যথেষ্ট চমকপ্রদ ছিল, তাই তাঁহারা সরল গদ্যের ভাষাতেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আমি এখানে সেকালের সেই ভাষার একটু নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।—

(১) মহানন্দে শচীনাথ নিরখি দম্ভোলি
তুলিলা দক্ষিণ হস্তে, করিলা উদ্যম
পরখিতে অস্ত্রবরে, বিশ্বকর্ম্মা ভয়ে
করযোড়ে পুরন্দরে নিবারি কহিলা;—
'না নিক্ষেপ অস্ত্র দেব এ মর-আলয়ে
এখনি উৎসন্ন হবে এ বিশাল পুরী,
বহু পরিশ্রমে প্রভু করেছি সঞ্চয়
এ সকল; হবে ভস্ম বজ্রের নিক্ষেপে।

* * *

লহ বিশ্বকৃৎ, অস্ত্র গঠ অচিরাৎ,
কহিলা পিনাকী ইথে যে অস্ত্র গঠিবে
সংহার-ত্রিশূলতুল্য তেজ সে আয়ুধে,
প্রলয়-বিষাণ-শব্দে হুঙ্কারিবে সদা;
ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত,
বজ্রনামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত।
('বৃত্রসংহার'—১৯শ সর্গ)

বাজিল দুন্দুভি রণনাদে,
অসুর অমর উন্মত্ত সে নাদে
ছাড়ে সিংহনাদ ছাড়ে হুহুঙ্কার,
চলে দৈত্য সেনাদল অনিবার,
তরঙ্গ যেমন তরঙ্গ কাছে।

* * *

ধূলিধূমজালে গগন আচ্ছন্ন,
রথচক্র অশ্ব-ক্ষুরেতে উৎসন্ন,
অমরা-নগরী ঘোর অন্ধকার,
দৃষ্টি নাহি চলে দীপ্ত অস্ত্রধার
চমকে চমক নয়ন ধাঁধে।
(বৃত্রসংহার—২০শ সর্গ)

(২) ধন্য আশা কুহকিনী! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন!
দুর্ব্বল-মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না সৃজিত বিধি, হায়! অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে,

শোক, দুঃখ, ভয় ত্রাস, নিরাশ, প্রণয়
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির-শোভা। পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস,
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস।
('পলাশীর যুদ্ধ',—২য় সর্গ)

ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর
ওই তব সৈন্যগণ
দাঁড়াইয়া অকারণ!
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির?
দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব—কি দেখিছ আর?
* * *
মূর্খ তুমি! মাটি কাটি লভি কোহিনুর
ফেলিয়া সে রত্ন হায়!
কে ঘরে ফিরিয়া যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর?
কিম্বা যেই পাপে বঙ্গ করেছ পীড়িত,
হতভাগ্য হিন্দুজাতি
দহিয়াছ দিবারাতি,
প্রায়শ্চিত্ত-কাল বুঝি এই উপস্থিত!
(পলাশীর যুদ্ধ—৪র্থ সর্গ)

'বৃত্রসংহারে'র ভাষা শুধুই গদ্য নয়—তাহা সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীতবর্জ্জিত, এবং শব্দের সৌষ্ঠবই নাই ; স্থানে স্থানে কবির ভাব-অর্থ-প্রকাশের তাড়নায় ভাষা যেন ছেকডা-গাড়ির ঘোড়ার মত গলদঘর্ম্ম হইয়া রাস্তার উপর হাঁটু ভাঙিয়া পড়িয়া যাইতেছে! নবীনের ভাষাও ছন্দোবদ্ধ গদ্য, তবে ভাবের আবেগযুক্ত হওয়ায় সেই ছন্দ স্বরযুক্ত হইয়াছে। এ ভাষায়, ভাবের রসরূপ কোথাও কাব্য হইয়া উঠে নাই, অর্থাৎ বাক্য রসাভিলাষী হইলেও, রসাত্মক নহে। ইহাদের যে ছন্দ তাহা বর্ণ বা মাত্রাধ্বনিকে লীলায়িত করে না, কেবল আবেগময়ী বক্তৃতার ভঙ্গিতে কম্পিত করে মাত্র। খাঁটি রস-প্রেরণায় কবিচিত্তে ভাবের অনুভূতি এমনই রসার্দ্র হইয়া উঠে যে, তাহা যেন বাক্যের বর্ণবিন্যাসেও রূপময় হইতে চায় ; ভাব, কেবল বাক্যের অর্থ ও ছন্দের ধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া কোনরূপে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, ভাষার যত কিছু উপাদানকে স্ববশে আনিয়া আপনার রূপটিকেও প্রকাশ করিতে চায়। এইজন্যই, গদ্যভাষা ও কবিভাষা উভয়ের পক্ষেই স্টাইলের সংজ্ঞা এক হইলেও,

কাব্যের কল্পনামূলে বস্তু অপেক্ষা ভাবের আধিপত্য অধিক বলিয়া—যাহা অনুভূতি-গোচর, কিন্তু সহজে বাক্যগোচর নয়, তাহাকেই বাগর্থের সাহায্যে মূর্ত্তিমান করিতে হয় বলিয়া, কাব্যই বাণীশিল্পের পরাকাষ্ঠা—কবিগণই বাণী-বরপুত্র; কবিরাই ভাষাকে ভাবের অধীন করিয়া তাহাকে ক্রমাগত ভাঙিয়া গলাইয়া, ঢালিয়া মিলাইয়া, তাহার প্রকাশক্ষমতা ও রসাস্বাদমাধুর্য্য নিরতিশয় বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। যে ভাষা ইতিপূর্ব্বে হয়তো সাহিত্যগুণবর্জ্জিত ছিল, সেই ভাষাই সহসা একজনমাত্র শক্তিশালী কবির আবির্ভাবে একেবারে যেন নব কলেবর ধারণ করিয়াছে। এমন ঘটনা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নয়। আমাদের নবযুগের সাহিত্যেও মধুসূদন সেই কবি—যাঁহার প্রতিভায় সেকালের সেই নিতান্ত শ্রীহীন ভাষাই এক অভিনব কবিভাষার রূপ ধারণ করিল; সেকালের অন্যান্য কবিগণ যে ভাষার গদ্যত্ব ঘুচাইয়া তাহার রসসংস্কৃতি সাধন করিতে পারেন নাই—মধুসূদন তাহার সেই নূতন গদ্যচ্ছন্দকেই যেমন অমিত্রাক্ষরের সঙ্গীত-সুরধুনীতে পরিণত করিয়াছিলেন, তেমনই তাহার সেই গদ্য বাগ্‌বৈভবকেই রসসিঞ্চিত করিয়া তাহা হইতে নব্য বঙ্গসরস্বতীর বীণাপাণি-মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমি অতঃপর মধুসূদনের সেই ভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

'মেঘনাদবধে'র ভাষার প্রকৃতি, কাব্যের যে-কোন অংশ পড়িলেই বুঝা যাইবে; এবং পাঠমাত্রেই মনে হইবে, ইহা এক স্বতন্ত্র ভাষা—আমরা এক নূতন কবি-পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিতেছি। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি-পর্ব্ব ও বিচ্ছিন্ন পংক্তিগুলিতে কবিভাষার যে লক্ষণ আছে, তাহাকে ভাষার আলঙ্কারিতা বলিলেই চলিবে না; কারণ এ ক্ষেত্রে অলঙ্কার নামটাই ভুল। যাহা ভাষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, লতায় পুষ্পের মত যাহা ভাষার দেহে আপনি বিকশিত হইয়া উঠে, যাহা তাহার নিজেরই রস-শ্রী বা ভাব-লাবণ্য, তাহা বাহিরের ভূষণ নয়, সে সৌন্দর্য্য তাহার নিজেরই কাব্যযৌবনজনিত অনঙ্গ অঙ্গ-শোভা। এখানে বৈয়াকরণ-বুদ্ধি লইয়া কেবল অলঙ্কার নিরূপণ করিলে, তাহা ফুলের বাগানে উদ্ভিদ-বিদ্যার মাহাত্ম্য ঘোষণা করার মতই হইবে। আমি যে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে সর্ব্বত্র কেবল অলঙ্কার-শোভাই নয়—কবিভাষার বহু বিচিত্র গুণও লক্ষণীয়।—

এই যে লঙ্কা হৈমবতীপুরী
শোভে তব বক্ষস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভরতন যথা মাধবের বুকে,...

* * *

এতেক কহিলা রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃকুলবালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূলবসনা। রুণু রুণু মধু-বোলে
বাজিল কিঙ্কিনী, করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়ন-রঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে!

*　　　*　　　*

নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি,
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ হে রাজসুন্দরী,
তোমার!

*　　　*　　　*

অনম্বর-পথে সুকেশিনী
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে,
সোনার প্রতিমা যথা বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে।

*　　　*　　　*

দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী মেঘাবৃত যেন
ঊষা!

*　　　*　　　*

বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে, গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র চূর্ণি মেঘদলে।

*　　　*　　　*

শোভিছে আনন্দময়ী বন-রাজী-ভালে
মণিময় সিঁথীরূপে জোনাকির পাঁতি।

*　　　*　　　*

এই ত তুলিনু
ফুলরাশি, চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা,

*　　　*　　　*

এতেক কহিয়া বামা শির নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত)
বন্দে নোমাইয়া শির মন্দ সমীরণে।

*　　　*　　　*

বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে।

*　　　*　　　*

তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,

দমনিয়া ভবদম দুরন্ত শমনে
অমর !

*   *   *

আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা ! এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ ?

*   *   *

পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি !

*   *   *

দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী···

*   *   *

শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব-পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে ।

*   *   *

ধিক্ তোরে, রক্ষোরাজ ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম, এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে ?

*   *   *

অনম্বর পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি ।

*   *   *

চিত্র-পুত্তলিকা সম চারু চিত্রলেখা !

*   *   *

কিংবা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ পার্ব্বণে ।

*   *   *

বাড়ে যথা রবিকরজালে
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দনকাননে ।

*   *   *

অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে ।

*   *   *

উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম ।

*   *   *

উত্তরিলা রাণী
মুছিয়া নয়নজল রতন-আঁচলে ।

*   *   *

ধীরে ধীরে রথিবর চলিলা একাকী
কুসুমবিবৃত পথে যজ্ঞশালা মুখে।
* * *

উচ্চ অবরোধে
কাঁদিলা উর্ম্মিলা বধূ...

আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
* * *

শৃঙ্গধর সম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ, প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলী রূপে!
* * *

সর্ব্বহর কাল তাহে পারে না হরিতে।
* * *

রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
* * *

বাসবীয় চমূ রমা দেখিলা চমকি
* * *

তেঁই শুকাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে!
* * *

হে রাঘবকুলচূড়া, তব কূলবধূ
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়? না শাস্তি' সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি?
* * *

শুনিনু সভয়ে
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন,
দৃঢ় বীর-পদভরে; দেখিনু আকাশে
অগ্নিশিখাসম শর, দিবা-অবসানে
জয়নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।

এ ভাষার মৌলিকতা বুঝিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা এ যুগের অর্থাৎ রবীন্দ্রোত্তর-কাব্যযুগের ভাষা নয়। তথাপি, এ ভাষায় এখনও বাংলা কবিতার একটি অভিনব রূপ অম্লান হইয়া আছে। যেমন উৎকৃষ্ট বসনের

বয়ন-কৌশল বুঝিবার জন্য তাহার যে কোন প্রান্ত পরীক্ষা করিলেই চলে, তেমনই, আমি এই সুদীর্ঘ কাব্য-দুকূলের বাণীবয়নচাতুর্য্য বুঝাইবার জন্য, ইহার শুধুই কলহংসলক্ষণ প্রান্তটিই নয়—যে কোন স্থান হইতে বুনানির নমুনা তুলিয়া ধরিয়াছি। এ বস্তুর মহার্ঘতা বুঝিবার জন্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই—তাহা সম্ভবও নয়; কারণ সূতাগুলিকে পৃথক করিয়া দেখিলে বুনানির পারিপাট্য চোখে পড়িবে না। অতএব পাঠকের শুধু শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেই চলিবে না—কাব্যভাষার স্বাদ ও সৌরভ-বোধও থাকা চাই; যাঁহাদের সেই অনুশীলন আছে, তাঁহারা উপরি-উদ্ধৃত বাণীখণ্ডগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, উহাদের রচনায় বাণীপ্রতিভার কোন্ লক্ষণ আছে। কাব্যের রস-আস্বাদন করিতে যেমন ভাষাকেই আস্বাদন করিতে হয়—তেমনই ইহাও মনে হয়, কবিও যেন শব্দগুলিকে, রচনাকালে, নিজের রসনায় আস্বাদন করিয়াছেন। কাব্যের কবিত্ব বিশ্লেষণ যে দুরূহ, তাহার কারণ—কবিভাষার এই যাদুগুণ; কবিত্বের বারো আনা—বারো আনা কেন, ষোল আনা নির্ভর করে ভাষার এই বাণী-লাবণ্যের উপরে। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, রস-ব্রহ্ম ও বাক্-ব্রহ্ম এক। তথাপি, সেরূপ বিশ্লেষণ সম্ভব না হইলেও, আমি এই ভাষার দুই চারিটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিব।

মধুস্দনের ভাষার সবচেয়ে বড় লক্ষণ তাহার সঙ্গীত-গুণ—যে প্রতিভার বলে তিনি এতবড় ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ভাষার এই শব্দ-সঙ্গীতও (phrasal music) সেই প্রতিভার পক্ষেই স্বাভাবিক। কেবল ভাবকেই কোন প্রকারে বাক্যার্থের দ্বারা প্রকাশ করিবার যে আবেগ, তাহাতে ভাষার এই সঙ্গীত-সংযম ঘটে না; সেরূপ আবেগ কবিত্ব-প্রবণতা মাত্র—তাহা সত্যকার কবিত্বের লক্ষণ নয়। কাব্যসৃষ্টির আদিতেই শব্দসৃষ্টি; বক্তার পক্ষে যেমন বাক্পটুতা, কবির পক্ষেও তেমনই শব্দনির্ম্মাণ-পটুতা—বক্তাকে কেবল আহরণ করিতে হয়, কবিকে সৃষ্টি করিতে হয়। কবি কেবল বাক্যের অর্থের দ্বারাই ভাব-সঞ্চার করেন না, শব্দের রূপ ও ধ্বনির দ্বারাও সেই ভাবকে যেন চক্ষু-কর্ণের গোচর করাইতে হয়। ইহার মধ্যেও ধ্বনিই প্রধান—কারণ উহাই শব্দ-রসের একমাত্র অনুপান। মধুস্দনের ভাষার ধ্বনি-মাধুর্য্য অধিকাংশস্থলে—বাহ্যত, যমক-অনুপ্রাসের সাহায্যেই ঘটিয়া থাকিলেও সেরূপ শব্দালঙ্কার মূল-শব্দকে অতিক্রম করে নাই—যে শব্দগুলিকে তাহারা আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাদের

নিজস্ব ভাব-ব্যঞ্জনাও অল্প নহে। যদি কেবল যমক-অনুপ্রাসই তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য-লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, মধুসূদনের বহুপূর্ব্বে বাংলা কাব্যভাষার চরম উৎকর্ষ হইয়া গিয়াছিল। মধুসূদনের ভাষায় যে সঙ্গীত আছে, তাহা রসবিগলিত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গীত—বিশেষতঃ, সঙ্গীতের যাহা শ্রেষ্ঠ উপাদান—সেই স্বর-ধ্বনির অপূর্ব্ব লীলা। উপরি-উদ্ধৃত প্রথম উদাহরণটির প্রথম পংক্তিতেই ইহার আভাস পাওয়া যাইবে। এ সঙ্গীত কাব্যরচনাকালে প্রাণ হইতেই কানে বাজিয়া উঠে, এবং তাহা হইতেই কবির রসনায় শব্দসৃষ্টি হয়। যে মাদকতা হইতে ইহার সৃষ্টি, ভাষায় তাহা সঞ্চারিত না হইয়া পারে না; এবং তাহাই সঙ্গীতরূপে—ছন্দোবন্ধে, যমক-অনুপ্রাসে—বাক্যের ব্যঞ্জন ও স্বর-ধ্বনিতে পর্য্যন্ত প্রবাহিত ও স্পন্দিত হইয়া উঠে। কাব্যের ভাব ও কল্পনাবস্তু —অর্থাৎ, কাব্যের প্রকৃতি অনুসারে—কবিভাষার যে পার্থক্য ঘটে, তাহার মূলে আছে এই সঙ্গীত; প্রাণের স্পন্দনভেদেই শব্দ-স্পন্দনেও প্রভেদ ঘটিয়া থাকে; তাই সকল কবির ভাষা এক নয়। উপরের পংক্তিগুলিতে এই শব্দগত সঙ্গীতের নানা রূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে; এবং পাঠ করিবার সময়ে ইহাও অনুভব হইবে যে, এই সকলের মূলে আছে সেই এক মন্ত্র—সেই অমৃতচ্ছন্দের অমিত্রাক্ষর; তাহারই যতিবিন্যাস-সুষমায় পদগুলি যেন আপনা হইতে এমন সুডৌল ও সঙ্গীত-মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এইখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। মধুসূদনের ভাষার যমক-অনুপ্রাস প্রভৃতি সাধারণত ভাষার শ্রুতি-মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিলেও, তাহারা যেমন ছন্দকেও ধারণ করিয়া আছে, তেমনই অনেক স্থলে, ভাবের সুর-অনুযায়ী ছন্দ-সঙ্গীতেরও বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছে। 'পিকবর-রব নব-পল্লব-মাঝারে'—এখানে অনুপ্রাস কেবল শব্দালঙ্কারই নয়,—ভাবের ধ্বনিরূপ বজায় রাখিবার জন্য, অমিত্রাক্ষরের গতিচ্ছন্দকে পরিবর্ত্তন করিয়া, ভাষায় গীতি-সুর যোজনা করিয়াছে। 'সর্ব্বহর কাল তাহে পারে না হরিতে'—এখানে যেটুকু যমক বা অনুপ্রাসের টান আছে, তাহা কেবল ভাষার অলঙ্কার-বৃদ্ধির জন্যই নহে। এই অনুপ্রাসে যে বিশিষ্ট ব্যঞ্জন-ধ্বনির সমাবেশ হইয়াছে, তাহাতে ভাষায় ভাবানুরূপ গাম্ভীর্য্যের সঞ্চার হইয়াছে। আবার, 'সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে'—এই চরণের নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রাসও, Tennyson-এর "Immemorial elms and murmur of innumerable bees"-এর মত নিকৃষ্ট শব্দালঙ্কার মাত্র নয়; কারণ, তাহাও সেই 'মধুকর-নিকর-করম্বিত'-জাতীয়

অনুপ্রাসেরই ইংরেজী সংস্করণ ; যে স্থানে যে ভাবে উহা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা যেমন অতর্কিত তেমনই স্বাভাবিক। যে ক্ষণে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক মেঘনাদ হত হইল, সেইক্ষণে—

যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনকমুকুট খসি, রথচূড়া যথা
রিপুবর্থী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে!

অনুপ্রাসের দ্বারাই ভাবের এমন অপরোক্ষ অনুভূতি সঞ্চার করার দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল। পূর্ব্বপংক্তিগুলির পরে সহসা ঐ পংক্তিটিতে আসিয়া পাঠকের চিত্তেও একটা কম্পন-শিহরণ জাগে—রাবণের প্রাণেও যেমন সহসা একটা অমঙ্গলের ভীতি-শিহরণ জাগার সংবাদ ঐ শব্দ কয়টি জ্ঞাপন করিতেছে। এখানে কেবল বর্ণের সমধ্বনি নয়—বিশিষ্ট ধ্বনিতেই, সেই শিহরণ-উদ্রেকের গুণ আছে। অতএব, 'মেঘনাদবধে'র ভাষায় যমক-অনুপ্রাসের যে প্রাচুর্য্য প্রায় সর্ব্বত্র আছে, তাহার কারণ শুধু শব্দালঙ্কারপ্রীতি নয়—অব্যর্থ শব্দধ্বনির দ্বারা ভাবের যথাযথ রূপসৃষ্টিও তাহার অভিপ্রায়। মহাকাব্যের বস্তুপ্রধান বর্ণনার ভাষাকে—নানা শব্দের রুক্ষ কঠিন উপলরাশিকে—মসৃণ করিবার, এবং সর্ব্বোপরি অমিত্রাক্ষর-ছন্দের প্রবাহকে তরঙ্গিত করিবার জন্যও, কবির পক্ষে এই উপায় অবলম্বন স্বাভাবিক ; শেষের বিষয়টি পরে ছন্দের প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

'মেঘনাদবধে'র ভাষার দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ—যাহা উৎকৃষ্ট কবি-ভাষার অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ—তাহা এই যে, ইহাতে কবির নূতন শব্দ-সৃষ্টির যে শক্তি লক্ষিত হয়, তাহা সেকালে আর কাহারও ছিল না বলিলেই হয়। কবির পক্ষে এই শব্দনির্ম্মাণ-শক্তি যেমন স্বাভাবিক, তেমনই অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক বড় কবির ভাষায় আমরা যে একটি নবীনতার ভঙ্গি লক্ষ্য করি তাহা এই কারণেই হয়—শব্দের সেই নবীনতার জন্যই নব-ভাবের রসাস্বাদে আমাদের চিত্ত আরও উৎসুক ও সজাগ হইয়া উঠে। আমি 'মেঘনাদবধ' হইতে যে বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে শব্দচয়ন ও শব্দযোজনার এই নবীনতা রসপিপাসু পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টিগোচর হইবে। যাহাকে ভাষার শব্দমন্ত্র বলে, তাহা এতই সূক্ষ্মভাবে অতিশয় স্বল্পাক্ষর শব্দেও নিহিত থাকে যে, সমগ্র বাক্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলে, তাহা অনেক সময় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে। তথাপি, আমি কয়েকটির

উল্লেখ করিব; তাহাতে অন্তত, আমি, ভাষার কোন্ লক্ষণের কথা বলিতেছি, এবং সেই লক্ষণ ভাষায় কেমন করিয়া প্রকাশ পায়, তাহার কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে। মধুসূদন শুধুই নূতন শব্দ ব্যবহার করেন নাই, অনেক সময়ে ব্যাকরণ-অভিধানকে ক্ষুণ্ণ করিয়াও শব্দের ধ্বনি-সৌন্দর্য্য ও ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি করিয়াছেন; ছন্দ ও ভাবের সুর বজায় রাখিবার জন্য, অপরিচিত ও অতি-পরিচিত উভয়বিধ শব্দকে এক বন্ধনে বাঁধিয়াছেন, খাঁটি বাংলা শব্দকে প্রচলিত অর্থ ত্যাগ করাইয়া সংস্কৃত অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন; সামান্য একটু আকার পরিবর্ত্তন করিয়া পুরাতনে নূতনত্ব দান করিয়াছেন;—এ সকল হইতে তাঁহার কবিচিত্তের বাণীরস-লোলুপতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কৃশ কটিদেশে', 'নিতম্ব-বিম্বে', 'হৈমবতী পুরী', 'অনম্বর পথে', 'নোমাইলা', 'অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে', 'কুসুম-বিবৃত পথে', ('বিবৃত' এখানে অন্য অর্থে), 'উচ্চ অবরোধে', 'জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে'. 'ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলী রূপে,' 'সর্ব্বহর', 'বাসবীয় চমূ', 'অকম্প চামর' প্রভৃতি অসংখ্য প্রয়োগ তাঁহার বাক্-ব্রহ্মচর্য্যার সাক্ষ্য দিতেছে। আমি ভাষার যে সূক্ষ্মতর যাদুগুণের কথা বলিয়াছি, তাহাও এই পংক্তিগুলির মধ্যে অনেক স্থলে অনুভব করা যাইবে; আমি এখানে দুই একটি মাত্র পুনরুদ্ধৃত করিব।—

> শোভিছে আনন্দময়ী বন-রাজী-ভালে
> মণিময় সিঁথীরূপে জোনাকির পাঁতি।
>
> *　　*　　*
>
> 　　　　　দেখিতাম তরল সলিলে
> নূতন গগন যেন, নব তারাবলী—
>
> *　　*　　*
>
> ধীরে ধীরে রথিবর চলিল একাকী
> কুসুম-বিবৃত পথে যজ্ঞশালা মুখে।

—ইহার কোনটিতেই ভাববস্তুর মৌলিকতা, অথবা অর্থগৌরব এমন নাই যে, তাহা মনকে বিশেষ করিয়া নাড়া দেয়—শব্দালঙ্কারেরও অতিরিক্ত শোভা নাই, বরং অপর পংক্তিগুলির অনেকস্থলে সে শোভা আরও অধিক আছে; তথাপি কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে, এইরূপ পংক্তি মনের মধ্যে কেবলই ঘুরিতে থাকে; ইহাকেই বলে ভাষার শব্দমন্ত্র। কিন্তু এ বিষয়ে যাঁহাদের কোন সংস্কার নাই, তাঁহারা ভাষার এ গুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ভাষায় আর যে বৈশিষ্ট্য-লক্ষণ আছে, তাহার সম্বন্ধে

সাধারণভাবে কিছু বলিব। মধুসূদনের সাহিত্যিক দীক্ষা, ও তাহার ফলে, তাঁহার রুচি ও কবিপ্রকৃতির কথা পূর্ব্বে সবিস্তারে বলিয়াছি। এক দিকে হোমার, ভার্জিল ও মিল্টনের, এবং অপর দিকে বাল্মীকি ও কালিদাসের কাব্য তাঁহার মনে ভাষার সম্বন্ধে যে একটি নিষ্ঠার উদ্রেক করিয়াছিল, শুচিতা ও শোভনতার সঙ্গে, ভাষার কঠিনোজ্জ্বল দীপ্তির প্রতিও তাঁহার যে আসক্তি জন্মিয়াছিল, তাহারই ফলে এ কাব্যের ভাষায় একটি ক্লাসিক্যাল আভিজাত্যের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে; সেকালের সেই প্রায়-গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট, শ্লথ ও শিথিল ভাষার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ—এ ভাষার—সংহতি-সুষমা ও কৌলীন্য-গরিমা বাংলা কাব্যেরই জাতিরক্ষা করিয়াছে। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, 'মেঘনাদবধ' শুধুই একটা কাব্য নয়—সে একটা ভাষা; তাহার যাহা কিছু দোষ-গুণ সব লইয়া সে এতই অনন্যসাধারণ যে, তাহার দূরতম প্রতিধ্বনি, বা সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি বাংলা কাব্য-সাহিত্যে আর কোথাও নাই। মধুসূদনের কাব্য-কীর্ত্তির পরিমাণ অতিশয় অল্প বলিয়া—এই স্টাইল ওই একখানি কাব্যেই সীমাবদ্ধ বলিয়া—ভাষার এই রূপ আরও প্রেক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। আবার, রবীন্দ্র-যুগে ভাষার যে আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে 'মেঘনাদবধে'র ভাষা ইতিমধ্যেই প্রাচীনতার সৌরভ ও সৌন্দর্য্যে অধিকতর বিচিত্র ও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে—আধুনিক স্থাপত্য-রীতির পাশে ভুবনেশ্বর-কণারকের মত—আধুনিক বাংলা কাব্যের পাশে 'মেঘনাদবধ-কাব্য' অতীতযুগের বিস্ময়কর কীর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ভাষার সেই ক্লাসিকাল ভঙ্গির নিদর্শন পূর্ব্বোদ্ধৃত পংক্তি-গুলির মধ্যেই পাওয়া যাইবে।—

(১) নয়নে তব হে রাক্ষসপুরী
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি,
(২) বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে
(৩) পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি।
(৪) সর্ব্বহর কাল তাহে পারে না হরিতে!

—ইহাদের কোথাও ভাষার উচ্ছলতা নাই—বর্ণনায়, চিত্রাঙ্কণে, অথবা অর্থ-নির্দ্দেশে, বাক্য যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনই সরল; ইহাকেই বলে বচন-রচনার গাঢ়বন্ধতা; অথচ এ ভাষার ঐশ্বর্য্যও অল্প নহে। আবার—

আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর, করিলে আজ্ঞা সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা।

—এখানে ভাষা প্রায় কথ্য-ভাষার মতই, কিন্তু তথাপি তাহাতে এমন একটি শালীনতা আছে, এমন একটি সংযম ও স্বচ্ছতা আছে যে, তাহাতেই উহা অনায়াসে কবিভাষার আভিজাত্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত উদাহরণগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, 'মেঘনাদবধে'র ভাষার মূল ধাতু কি। এই পংক্তিকয়টির ভাষায় যে অতিশয় সরল অনাড়ম্বর শব্দযোজনা এবং বর্ণনার যে বাক্‌সংযম ও ছন্দের যে মৃদুমন্থর গতি রহিয়াছে, তাহাতে ভাষা সম্বন্ধে মধুসূদনের অতিশয় সুমার্জ্জিত রুচি ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, নিরন্তর উৎকৃষ্ট কাব্য-ভাষার সহিত পরিচয় থাকাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। উৎকৃষ্ট ষ্টাইলের প্রধান লক্ষণ—সংযম; মধুসূদনের কাব্যে যেখানেই অবকাশ হইয়াছে, সেখানেই এই সংযমের পরিচয় আছে; মনে হয়, এই দিকেই তাঁহার কবিমানসের স্বাভাবিক আকর্ষণ। এ কাব্যের যত কিছু শব্দালঙ্কার বা বাক্যের ঘনঘটা, তাহারও মূলে আছে সজ্ঞান প্রয়োজন-বোধ—ভাষার ঐশ্বর্য্য-বিধান এবং ছন্দের শক্তি-পরীক্ষা, এ কাব্যের কবির একটি পৃথক অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, মধুসূদন ভাষার ক্লাসিকাল আদর্শ সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ ছিলেন; তাই একটু ভিতরে দৃষ্টি করিলেই দেখা যাইবে, 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ভাষায় অসংযম অপেক্ষা সংযমই অধিক; ইহার বাগ্‌বন্ধ নিরতিশয় যত্নকৃত, এবং স্থলবিশেষে সেই লক্ষণই আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। 'হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়' ইত্যাদিতে ভাষার যে গুণ, অন্যত্র অশোকবনে বন্দিনী সীতার মুখে, দূর হইতে দিনব্যাপী যুদ্ধের কোলাহল শুনিয়া, ক্লিষ্ট ক্লান্ত কণ্ঠে তাহার সম্বন্ধে যে ভাব যে ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে তাহার গুণও সেই একই; সেখানেও যেমন ভাষা ভাবকে অতিক্রম করে নাই, এখানেও তেমনই সীতার উৎকণ্ঠা অতিশয় পরিমিত ও যথোপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। উপরন্তু, যখন পড়ি—

> শুনিনু সভয়ে
> রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে…
> জয়নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে
> বাজিল রাক্ষস-বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে!

তখন মনে হয়, কৃত্তিবাসী বা কাশীদাসী পয়ার ও তাহার ভাষা, কোন্ মন্ত্রবলে এত সামান্য পরিবর্ত্তনে, এতখানি রূপান্তর লাভ করিল!

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ভাষার সম্বন্ধে আলোচনা বাকি রহিল, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা শেষ করিব।

দশম অধ্যায়

মেঘনাদবধ-কাব্যের কবি-ভাষা—শব্দচয়ন ও শব্দযোজনার কাব্য-কলা ও কবিত্ব, ভাষার প্রধান দোষ—নাম ধাতুর আতিশয্য, অভিনব শব্দ-ব্যবহার, তাহার গুণ ও দোষ।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ-কাব্য' এ যুগের সাহিত্য-চর্চ্চায় প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে; স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে এক-আধটুকু যাহা উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তাহাতেই বাল্যাবস্থায় যে সামান্য পরিচয়লাভ, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবশ্যপাঠ্য-হিসাবে যেটুকু নিগ্রহভোগ, তাহার অধিক সম্বন্ধ তাহার সহিত আর কাহারও নাই। তথাপি সে কাব্যের সহিত পরিচয় যেমনই থাক—তাহার একটা দুর্নাম অনেকেই জ্ঞাত আছেন। তাহার ভাষা যে অতিশয় কৃত্রিম—দুরূহ ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের দ্বারা কণ্টকিত, অতএব তাহা খাঁটি বাংলা ভাষা নয়—এমন মত রবীন্দ্রনাথের মুখেও ব্যক্ত হইয়াছে। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ভাষা নিত্য-ব্যবহার্য্য ভাষার মত সরল ও সহজ নয় বলিয়া উহা কৃত্রিম, এবং সেইজন্য এক হিসাবে উহা বাংলাসাহিত্যের বহির্ভূত—সাহিত্য ও সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা ইহাই প্রমাণ করে যে, আমাদের সমাজে সাহিত্য-বিচারে মূল নীতির প্রতিষ্ঠা এখনও সুদূরপরাহত। ভাষা কোন্ যুগে কি রূপ ধারণ করিবে—সর্ব্বকর্ম্ম ও সর্ব্বজনের উপযোগী ভাষা কি হইবে, সে সমস্যা কোন মৌলিক প্রতিভাশালী কবির সমস্যা নয়। রবীন্দ্রনাথের মত একজন এতবড় সাহিত্যস্রষ্টাও তাঁহার নিজের রুচি-সম্মত বা শিল্পী-মনোমত কোন রীতিকে ভাষার একমাত্র রীতি-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না; তেমন রীতি একটা ফ্যাশন বা গড্ডালিকা-রীতিই হইতে পারে। ভাষার কোন ভঙ্গিমা নয়,—তাহার genius বা মূল ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া নব-নব কবির নব-নব বাণী মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করে। এই ধর্ম্মকে কেহ নিজেরই রীতির লক্ষণে চিহ্নিত করিতে পারে না, একটা বিশেষ প্যাটার্নে তাহাকে বাঁধিয়া দিতে পারে না। যত বড় প্রতিভাই হোক—তাঁহার স্টাইলের কৃতিত্ব এই যে, তিনি ভাষার সেই ধর্ম্মটিকে বজায় রাখিয়াই নিজস্ব বাণীকে গড়িয়া লইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার যে স্টাইল তাহা বঙ্কিমচন্দ্রেরই, তাহা আর কাহারও হইতে পারে না; সেই স্টাইল সত্ত্বেও বাংলা গদ্য-ভাষার যে ধর্ম্মকে তিনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই একটি সাধারণ রীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সে রীতির পরিমার্জ্জন ও পরিশোধন এখনও চলিতেছে,

এবং তাহাতে দেখা যাইতেছে, সেই রীতিতে ভাষার ধর্ম্ম এমন ভাবে ধরা পড়িয়াছে যে, তাহার বহিরঙ্গের সংস্কার যতই হোক, মূলে তাহাই বাংলা-গদ্যের যথার্থ রূপ। কিন্তু ইহাও গদ্যের ভাষা, কাব্যের ভাষায় কোন রীতির প্রশ্নই উঠে না। সকল কবির মতই, মধুসূদনের ভাষাও তাঁহার নিজস্ব—সে ভাষা আর কাহারও অভীষ্ট ভাষা হইতে পারে না, হইলে তাঁহার কাব্য কাব্যই হইত না। রবীন্দ্রনাথ ততটা না বলিয়া কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে, সে ভাষা খাঁটি বাংলা নয়; 'মেঘনাদবধ-কাব্য' খাঁটি বাংলা ভাষায় ও খাঁটি বাংলা ছন্দে রচিত হইলে সমান উপাদেয় হইত। কিন্তু, প্রকৃত কাব্য-সমালোচনার দিক হইতে, ইহারও অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে কাব্য সত্যকার কাব্য হয় নাই; কারণ, কাব্য ও কাব্যের ভাষা অভিন্ন। সে কাব্য যে আর কোন ভাষায় লিখিত হইতে পারিত, এবং হইলে কিছুমাত্র ক্ষতি হইত না—এমন কথা বলিলে সে কাব্যের কাব্যত্বকেই অস্বীকার করা হয়। যদি কেহ বলেন, 'মেঘনাদবধ-কাব্য' কাব্যই হয় নাই, সে কথার বরং একটা অর্থ হইতে পারে; কিন্তু 'মেঘনাদবধ-কাব্য' অন্যবিধ ভাষায় রচিত হইলেও, তাহা যেমন কাব্য তেমন কাব্যই থাকিত—এমন কথা সাহিত্য-ধর্ম্মেরই বিরোধী।

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ভাষা আর কোনরূপ হইতে পারিত না,—ওইরূপ যে হইয়াছে, তাহাও বাংলা ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনার প্রমাণ। মধুসূদন তাঁহার কল্পনার অনুযায়ী শব্দচয়নে কেবলমাত্র অভিধানের শরণাপন্ন হন নাই, সেই শব্দরাশির উপরে তিনি নিজের অসামান্য কবিশক্তি প্রয়োগ করিয়া, কাব্যেরই প্রয়োজনে, একটি বিশিষ্ট বাণীরূপের সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহাতে ভাষার শক্তিই বাড়িয়াছে—স্বভাবের বিকৃতি ঘটে নাই। কারণ, একটু পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে, সে-ভাষা, প্রয়োজনমত, প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে অনায়াসে উঠা-নামা করিতেছে, এবং তাহারও একটি মধ্যস্তর আছে—যাহা কাশীদাস, কৃত্তিবাস হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত, বাংলা কাব্যের যে খাঁটি সাহিত্যিক ভাষা, তাহারই একটি মার্জ্জিত রূপ। 'মেঘনাদবধ' হইতে আমি, এই আলোচনা ব্যপদেশে, বহু উদ্ধৃত করিয়াছি, তথাপি এই প্রসঙ্গে আরও দুইটি স্থান উদ্ধৃত করিব, তাহাতে আমার এই বিশেষ বক্তব্যটি বুঝাইবার সুবিধা হইবে। একটিতে প্রায় আদ্যোপান্ত সংস্কৃত বা সাধু—অর্থাৎ নিত্য-ব্যবহৃত নয়—এমন শব্দের সমাবেশ আছে, যথা—

> এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
> শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি

গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি
দেব-দৈত্য-নরত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হ'তে (বারিস্রোতঃসম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজিরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্! আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক-শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি, সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হ্রেষিল উল্লাসে,
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে,
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝন্ঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে!

এই যে ভাষা, ইহার জন্য কি কবির অকারণ অভিধান-প্রীতিই দায়ী? বাংলা ভাষার অনভ্যস্ত এই যে বর্ণনা কবি এইখানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা কি আর কোন উপায়ে, ওই ভাবমণ্ডল এবং ছন্দধ্বনি বজায় রাখিয়া—যথাযথ প্রকাশ করা যাইত? 'বক্রগ্রীব'এর পরেই 'চিবাইয়া রোষে মুখস্'—এই যে ভাষা, ইহা কি কবির অকারণ অভিধান-প্রীতিই প্রমাণ করে? এই সকল শব্দের মধ্যেই যখন 'কনক-শিরস্ক শিরে' 'আয়সী-আবৃত দেহ' প্রভৃতি পাঠ করি, তখন কি কবির শব্দনির্ম্মাণচাতুর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া শব্দের অনাবশ্যক আড়ম্বরে বিরক্ত হইতে হয়? বাংলাভাষার এই যে নূতন সজ্জা—রণসজ্জা—কবি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে সংস্কৃত শব্দকোষ বা শব্দযোজনা-রীতির যেটুকু সাহায্য লইয়াছেন, তাহা শুধুই কর্ত্তব্য নয়, প্রতিভা ব্যতিরেকে তাহা অসাধ্য। যদি স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ স্থানে ঐ ভাষাই একান্ত উপযোগী, তবে তাহা বাংলাও বটে; কারণ, এই কাব্যের

ভাষায় যে একটি মধ্যস্তরের কথা বলিয়াছি—যাহা বাংলা কাব্যের কুল-ভাষা—ইহা সেই মধ্যস্তর হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, এক ধাপ উপরে উঠিয়াছে মাত্র। এইবার সেই মধ্যস্তরের একটি উদাহরণ দিব।—

বন্দীসম শিলাবন্ধে বান্ধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরী, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে?
নির্ভয়-হৃদয়ে কহ, হনুমান্ আমি
রঘুদাস, দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি!
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ, ত্বরা করি;
কি হেতু আইলা হেথা? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।"

এ ভাষা যে খাঁটি বাংলা ভাষা—বাঙালীর পৈতৃক কবি-ভাষা, তাহা স্বীকার করিতে যাঁহার বাধে, আজিকার সেই আধুনিক বাংলাসাহিত্যিক নিজেই জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশটির ভাষা ও এই ভাষার মধ্যে ধাতুগত পার্থক্য নাই, থাকিলে—একই কাব্যে, একই কবির লেখনীমুখে, এক ছন্দস্রোতে একটি অপরটির অনুধাবন করিত না। আমি যে স্তরভেদের কথা বলিয়াছি, এই দুইটি নমুনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে; এই স্তরভেদ যেমন ভাষাভেদ নয়, তেমনই ভাব বা বর্ণনা-বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী ভাষার এইরূপ স্বচ্ছন্দ গতিশীলতা তাহার শক্তি ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। মধুসূদন যেমন পয়ারকে তাঁহার অমিত্রাক্ষরের উপাদান-রূপে লইয়াছিলেন, তেমনই পুরাতন বাংলা কাব্যের ভাষাকেই তাঁহার নূতন কাব্য-প্রেরণার প্রয়োজনে মার্জ্জিত ও শক্তিপূর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয়টির মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা শব্দচয়নের পার্থক্য মাত্র—এ পার্থক্য স্টাইলের পার্থক্য নয়, ইহাও বুঝিয়া লইতে হইবে। কাব্যের বিশিষ্ট ভাব-মণ্ডল—কবির নিজেরই অন্তরের সৃষ্টি; ভাষা ও বাণী-সঙ্গীতের মূলে সেই ভাব-মণ্ডলের প্রভাব থাকে, এবং তাহারই কারণে, কাব্যের যে স্টাইল ফুটিয়া উঠে—শব্দসঙ্কলন, শব্দচয়ন ও শব্দযোজনার ভঙ্গিতে ভাষার যে শ্রী, সৌন্দর্য্য ও মহিমা-লাভ হয়—তাহাতেই সেই ভাষা ধন্য হয়; তখন আর অন্য কোন প্রশ্নই থাকে না। এইজন্যই মিল্টনের মহাকাব্যকে 'the noblest achievement of the English tongue'—বলা হইয়া থাকে। তথাপি, মধুসূদনের এই স্টাইলও যে খাঁটি বাংলার ছাঁচে ও সুরে

গড়া, তাহার প্রমাণ ঐ দ্বিতীয় উদাহরণটিতে আরও স্পষ্ট পাওয়া যাইবে। যিনি এই পংক্তিগুলি অবহিত হইয়া পাঠ করিবেন, বিশেষ করিয়া প্রথম দুই পংক্তির শব্দধ্বনি কানে আস্বাদন করিতে পারিবেন, তিনিই বুঝিবেন কোন্ ভাষা মধুসূদনের আদর্শ ছিল। এই উক্তিটি কবি হনুমানের মুখে দিয়াছেন। প্রমীলার নারী-বাহিনী যখন রঘু-সৈন্য ভেদ করিয়া বীরদর্পে লঙ্কা-প্রবেশে উদ্যত, তখন রামের শিবির-দ্বারে প্রহরায় নিযুক্ত হনুমানকে প্রমীলার এক সখী রণরঙ্গিণী-মূর্ত্তিতে যুদ্ধে আহ্বান করিল। তখন সেই যুদ্ধোদ্যমের আস্ফালন-কোলাহলের মধ্যেই রামায়ণের আদর্শ-ভক্তবীর তাহার প্রভুর পরিচয় দিতে গিয়া ধীর স্থির কণ্ঠে যে রাম-বন্দনা গাহিয়া উঠিল, তাহার স্তোত্র-গম্ভীর শব্দবিন্যাসে এবং প্রতি পর্ব্বের যতি-তালে আমরা যে খঞ্জনি-ধ্বনি শুনিতে পাই—

> বন্দীসম শিলাবন্ধে বান্ধিয়া সিন্ধুরে,
> হে সুন্দরি. প্রভু মম রবি-কুল রবি,...

তাহার আত্মা যে খাঁটি বাংলা, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

অতএব 'মেঘনাদবধে'র ভাষা বাংলা ভাষা নয়—এমন কথা একটা স্বতঃসিদ্ধকে অস্বীকার করার মত। মিল্‌টনের Paradise Lost-এর ভাষা ইংরেজী নয় বলিয়া তাহা যে বরখাস্ত হইয়াছে, এ সংবাদ আমরা এখনও পাই নাই। সে ভাষা যদি ইংরেজী হয়, তবে 'মেঘনাদবধে'র ভাষা তাহার দশগুণ বাংলা। যাঁহারা দাশুরায় ও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একান্ত ভক্ত ছিলেন, সেযুগের সেই সহৃদয় বাঙালী-সমাজ 'মেঘনাদবধ-কাব্য'ও সমান উপভোগ কবিতেন। ইহার উত্তরে যদি বলা হয় যে, তাঁহারা—অর্থাৎ সেকালের সাহিত্য-রসিক বাঙালী, ভাষার সংস্কৃত ভঙ্গিতে অভ্যস্ত ও আসক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সংস্কারই ছিল অন্যরূপ, তবে ইহাই বলিব যে, তাঁহাদের মধ্যে বাঙালী-জাতির একমাত্র সংস্কৃতি তখনও লোপ পায় নাই। আজকাল যে ভাষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বাংলা ভাষার একটা অতি কুৎসিত ফিরিঙ্গী সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথের "খাঁটি বাংলা" এই ভাষাকেই জাতে তুলিবার বড় সুবিধা করিয়া দিয়াছে। অতঃপর মধুসূদনের ভাষা বাংলা কি না সে বিচারের প্রয়োজনই থাকিবে না; কারণ, আমরা ক্রমে সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ব্বের তুলনায় যেরূপ খাঁটি বাঙালী হইয়া উঠিতেছি, তাহাতে অনতিদূর ভবিষ্যতে আমাদের ভাষাও যখন সেই অনুপাতে খাঁটিতম হইয়া উঠিবে, তখন এ ভাষার আর অস্তিত্বই থাকিবে না—'মেঘনাদবধ' ও 'চিত্রাঙ্গদা' একই কবরে কবরস্থ হইবে।

তথাপি 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ভাষার উপরি-স্তরে সংস্কৃতের গাঢ় প্রলেপ থাকিলেও, মধুসূদন খাঁটি বাংলা বুলিরও যে অতিশয় অনুরাগী ছিলেন, তাহার প্রমাণ এ কাব্যের প্রায় সকল পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। কবি বিহারীলাল যেমন তাঁহার সেই সরল অথচ শুদ্ধ ও মার্জ্জিত ভাষায়,—যেখানে যেমন ইচ্ছা একেবারে 'মুখের বোল' ব্যবহার করিয়াছেন, মধুসূদনও তেমনই, তাঁহার সেই অতিশয় সাধু ও অলঙ্কৃত ভাষায়, প্রাচীন ও আধুনিক—কাশীদাস-কৃত্তিবাস এবং কবি-পাঁচালির—ভাষা মিশাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই; বরং অনেক স্থলে, ভাব-অর্থ ঠিক-ঠিক ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, এবং ভাষাকে একটি সহজ গতি দান করিবার আগ্রহে, নিতান্ত কথ্য-বুলিকে এমন প্রশ্রয় দিয়াছেন যে, তাহাতে স্পষ্ট রসভঙ্গ হইয়াছে। তথাপি, সাধারণত সাধুভাষার সঙ্গে এইরূপ প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণ এমনই স্বাভাবিক হইয়াছে—ভাষার সেই দুই ধাতু এমন সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহাতেই প্রমাণ হয়, মধুসূদনের ভাষা বাংলা ভাষার genius বা মূল-ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করে নাই। 'মেঘনাদবধে'র ভাষার ফাঁকে ফাঁকে এই যে খাঁটি বাংলার ভঙ্গিটি আপন অধিকার অটুট রাখিয়াছে, আমি এখানে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব—

পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে…
* * *
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
* * *
মজালে রাক্ষসকুলে মজিলা আপনি।
* * *
তখনি স্বজনি
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা?
* * *
হেন হরি-হারা হ'য়ে বাঁচিল যে রমা…
* * *
বিষম সঙ্কটে
ঠেকিবে, বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
* * *
যতদিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে…
* * *
মরি মা, সরমে আমি, শুনি লোকমুখে…
* * *

মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে…

* * *

তার তারে বিপদে তারিণি!

* * *

এতেক কহিয়া রতি সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।

* * *

এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী!
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই কহ লো, আমারে।

* * *

দিনু ছাড়ি, প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি।

* * *

দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।

* * *

না বুঝে পা দিনু ফাঁদে, অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি

* * *

দৈত্যদল আসি'
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে?

* * *

কি হেতু
সভয় হইলা আজি কহ, মা আমারে?
কি ছার সে রাম, তারে ডরাও আপনি?

* * *

নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমারে এ ঘরে তুই!

উপরের দৃষ্টান্তগুলি আমি কতকগুলি পৃষ্ঠা মাত্র উলটাইয়া যেমন চোখে পড়িয়াছে, তুলিয়া দিলাম। এইরূপ বাক্‌পদ্ধতি ছাড়া, এ কাব্যে খাঁটি বাংলা শব্দ যে কত ছড়াইয়া আছে তাহার সংখ্যা নাই। জাঙাল, ঠাট, সাপটি, এড়িলা, দেউল, দেউটি, বোল, বীরপণা, গুণনিধি, রাঙা পা'দুখানি, ছাদে দেখ, ভেটিব, খেদাইনু, ফাঁফর, ঘাঁটায়, তিতিয়া, স্বজনি প্রভৃতি—প্রাচীন এবং প্রচলিত ভাষার নানা ভঙ্গি ও নানা শব্দ, মধুসূদন তাঁহার কাব্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন; সে সকল শব্দের অধিকাংশই এখনকার খাঁটি-বাংলায় আর প্রচলিত নাই—যে খাঁটি-বাংলার দাপটে 'মেঘনাদবধে'র ভাষা জাতিচ্যুত হইতে বসিয়াছে। আসল কথা, এখনকার বাংলা ভাষা শুধুই বাংলা নয়—'বিশ্ব-বাংলা'; মধুসূদনের ভাষা তেমন ভাষা নয় বলিয়াই তাহার কোন মর্য্যাদা আর নাই।

মধুসূদনের পত্রাবলীর মধ্যে, ভাষা সম্বন্ধে কবির অতিরিক্ত সচেতনতার আভাস কিছু কিছু পাওয়া যায়। এক স্থানে তিনি যে লিখিতেছেন—

I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you.

তাহা যে কত সত্য, তার প্রমাণ আমি পূর্ব্বে দিয়াছি। Thoughts and images—অর্থাৎ, যাহা, ভাব ও চিত্র উভয়বিধরূপে, কবির অন্তরেন্দ্রিয়ের সমক্ষে আবির্ভূত হয়, তাহারা স্ব স্ব বাক্-দেহ কোন্ অনধিগম্য নিয়মের বলে আপনারাই স্থির করিয়া লয়, মধুসূদন ইহাই অনুভব করিয়া বলিতেছেন, 'Here is a mystery for you'। কবির এ সাক্ষ্য অতিশয় সত্য ও মূল্যবান। সত্যকার কবিভাষার সৃষ্টি এমনই করিয়া হয়; ভাষার বিষয়ে এই নিগূঢ় চেতনা যাহাদের নাই, তাহাদের কবি-প্রতিভাও সন্দেহস্থল। কিন্তু কাব্যের সর্ব্বত্র, সর্ব্ব অঙ্গে, এইরূপ প্রেরণার ক্রিয়া থাকে না। তাই, কবি যখন তাঁহার বন্ধুকে লিখিতেছেন —"You must weigh every thought, every image, every expression, every line"—কারণ তাহার প্রত্যেকটি নিখুঁত হওয়া চাই, তখন কবির সেই আকাঙ্ক্ষা সাধু বটে, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইবার নহে। এ কাব্যে সর্ব্বত্র কেবল সেই আবেশের অবস্থাই নাই, কবিকে কাব্যবিধির সজ্ঞান দাসত্বও করিতে হইয়াছে। কারণ, দুইটি বিষয়ে কবিকে অবহিত থাকিতে হইয়াছে; প্রথম, কাব্যখানি মহাকাব্য, অতএব তাহার রচনায় একটা পদ্ধতি মানিতে হইবে—উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য ব্যতিরেকে এ কাব্যের গৌরব-রক্ষা হইবে না; দ্বিতীয়ত, যমক অনুপ্রাস প্রভৃতিও ছন্দের ধ্বনিসৌষ্ঠব ও ভাষার লালিত্যবৃদ্ধির একটা বড় উপায়; এজন্য আলঙ্কারিক শব্দবিন্যাসে কবিকে বিশেষ যত্ন করিতে হইয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, 'মেঘনাদবধে'র ভাষার দোষ যে কারণে, গুণও সেই কারণে। এক দিকে কাব্যের বিধিবদ্ধ আদর্শ-রক্ষা, অপর দিকে ভাষার—বিশেষতঃ সেকালের সেই অপরিপুষ্ট ভাষার—পুষ্টি ও অভিজাত্য-বিধান, একসঙ্গে এই দুইটি প্রয়োজন-সাধন মধুসূদনের মত কবির পক্ষেও সুসাধ্য হয় নাই। তথাপি তিনি যে, (তাঁহারই ভাষায়) 'weak and nerveless expressions and rough lines' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তাহার প্রমাণ—'মেঘনাদবধে'র মত, ভাষার বন্যাস্রোতময় কাব্যেও—সর্ব্বত্র পাওয়া যাইবে। ছন্দধ্বনিকে তরঙ্গিত

করিবার জন্য যেমন অনুপ্রাস, তেমনই 'rough lines'-কে মসৃণ করিবার জন্য যমকের ব্যবহার তিনি যে ভাবে করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, উহা যেন তাঁহার ভাষারই স্বভাব, যত্নকৃত নয়; বাহিরের কৃত্রিম কলা-কৌশল তাহাতে যেমনই থাকুক, ভিতরের অকৃত্রিম বাক্‌সৃষ্টির প্রেরণা উহাদের মূলে রহিয়াছে। 'সমরে অমরত্রাস', 'হে দানবপতি ময়, মণিময়...' 'মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি, চন্দ্রাননা', 'মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি, অনন্ত বসন্ত বায়ু', 'কি ছার ইহার কাছে' 'কাল-পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা...' 'নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে'; 'ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু', 'কিম্বা বিম্বাধরা রমা'—এরূপ দৃষ্টান্ত আরও উদ্ধৃত করিতে হইলে সমগ্র কাব্যখানিই উদ্ধৃত করিতে হয়; এ যেন ভাষার অলঙ্কার মাত্র নয়—ইহাই এ কাব্যের ভাষা। 'Nerveless expression' অর্থাৎ নির্ব্বীর্য্য ভাষা পরিহার করিবার জন্যও কবি অনেক সময়ে অনুপ্রাসের শরণাপন্ন হইয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি দুইটিতে তাহার প্রমাণ মিলিবে।—

মূঢ় দক্ষদোষে যবে দেহ ছাড়ি সতী
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,—

এখানে প্রথম পংক্তিতে 'দেহ ছাড়ি,' এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে 'জন্ম গ্রহিলা'—ভাষার কি প্রভেদ! প্রথমটির আদর্শে 'গ্রহিলা'র স্থানে 'লইলা' হওয়াই উচিত। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, প্রথম পংক্তিতে অক্ষরের ধ্বনিসাম্যের জন্য 'ছাড়ি' কানে বাধে না। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে, 'গ্রহিলা' শুধুই অনুপ্রাস রক্ষা করে নাই, উহার স্থানে 'লইলা' বসাইলে, পংক্তির ঐ স্থানে ধ্বনি-দৌর্ব্বল্য ঘটে—তার ঢিলা হইয়া যায়। শব্দপ্রয়োগে কবির কান, সর্ব্বত্র সম্ভব না হইলেও, অনেক স্থলে এইরূপ সতর্ক আছে দেখা যায়; এবং যমক অনুপ্রাস কেবল যে অলঙ্কারপ্রীতির জন্যই নহে—কোথাও তাহারা ভাষার মসৃণতা, কোথাও বা ধ্বনিসাম্য রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; ছন্দের প্রয়োজনে তো বটেই। অতঃপর আমি 'মেঘনাদবধ-কাব্যের ভাষার কলা-কৌশলের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহাতে যে সকল দোষ আছে, তাহাদের উল্লেখ ও আলোচনা করিব।

'মেঘনাদবধে'র ভাষায় যে বহু ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ প্রয়োগ আছে তাহার সম্বন্ধে কোন তর্ক নাই; কিন্তু তাহাদের সকলগুলিই যে কবির স্বেচ্ছাচারমূলক নহে, অনেকগুলিই প্রয়োজনমূলক, এবং তাহাও যে কবি একটা দুঃসাহসিক পরীক্ষার ভাবে করিয়াছেন, ইহাও সত্য। এই পরীক্ষার ফলাফল তাঁহার কাব্যেরই

অঙ্গীভূত হইয়া আছে—মন্দ যাহা তাহা ঐ কাব্যেরই দূষণ, এবং ভাল যাহা তাহা বাংলা কাব্যমাত্রেরই ভূষণ হইয়াছে। অতএব এই দুঃসাহসের জন্য যে লাভ হইয়াছে, তাহার আনুষঙ্গিক ক্ষতির পূরণও অন্য দিক দিয়া হইয়াছে, বলিতে হইবে। আবার ইহাও দেখিতে হইবে যে, নিষ্ঠাবান বৈয়াকরণেরা যাহা আদৌ সহ্য করিতে রাজি নহেন, তাহার সবই কাব্যের ভাষার পক্ষে অমার্জ্জনীয় কি না। মধুসূদনের সবচেয়ে বড় দোষ—তাঁহার ক্রিয়াপদনির্ম্মাণের হঠকারিতা; কিন্তু আজ আমরা জানি ও মানি যে, ইহাতেও তাঁহার দুঃসাহস নিন্দনীয় নয়, বরং প্রশংসনীয়। কয়েকটি স্থানে কবির এই স্বাধীনতা সীমা অতিক্রম করিলেও [যথা, মুক্তিল, বৃষ্টিল, আয়াসিতে, স্তুতিল, কোপি (কোপ করিয়া, কুপিত হইয়া), নিকটয়ে (নিকটবর্ত্তী হয়)], মধুসূদন বাংলা ক্রিয়াপদগুলিকে কাব্যচ্ছন্দের শাসনাধীন করিবার জন্য যেভাবে ভাঙিয়া গড়িয়াছেন, তাহা ব্যাকরণসম্মত কি না সে বিচার অপেক্ষা, তাহা বাংলাভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োজনের অনুরূপ কি না, তাহাই ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। শেক্স্পীয়ারের সময়ে ইংরেজী ভাষায় যে অবস্থা, মধুসূদনের সময়ে, সাহিত্যের দিক দিয়া, বাংলাভাষার অবস্থা তদপেক্ষা মন্দ; সে অবস্থায় শেক্স্পীয়ার নিজ কল্পনা ও কবিভাবকে ভাষায় পূর্ণ মুক্তি দিবার জন্য ব্যাকরণ ও অভিধান সম্বন্ধে যেরূপ নিরঙ্কুশ হইয়াছিলেন, তাহার তুলনায় মধুসূদন অধিক কিছু করেন নাই। তাঁহার কাব্যের দীর্ঘপদযোজনায় বাংলা যৌগিক ক্রিয়াপদগুলির যে বাধা, এবং সেই সঙ্গে, ভাষার গাঢ়বন্ধতার জন্য সর্ব্ববিধ শৈথিল্য পরিহারের যে প্রয়োজন—এই দুই কারণেই, মধুসূদনকে বহু নূতন নামধাতুর সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল; এবং এ বিষয়ে তাঁহাকে কতক পরিমাণে ভবিষ্যৎ ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেও হইয়াছিল। আমি এখানে এ বিষয়ে ব্যাকরণঘটিত সমস্যার আলোচনা করিব না, কেবল সাহিত্যিক সৌকর্য্য ও প্রয়োজনের দিকটিই দেখিব। তথাপি বাংলা ভাষায় এই নামধাতুর প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। খাঁটি বাংলা বুলিতে বহু নামধাতুর ব্যবহার আছে, যথা—উঁচাইয়া, ঘনাইয়া, লতাইয়া, পোহাইল ('প্রভাত' হইতে), পিছাইয়া, ফেনাইয়া, গুঁড়াইয়া, বিষাইয়া, তলাইয়া, রাঙাইয়া, গুছাইয়া ('গুচ্ছ' বা 'গোছা' হইতে) প্রভৃতি; চাবকাইয়া ('বঁটাইয়া' এইমত—তবু হাস্যোদ্রেক করে না), ফাঁসাইয়া, কোদলাইয়া (কোদাল দ্বারা খুঁড়িয়া), বিনাইয়া ('বেণী' হইতে), এমন কি ভুলিয়া বা ভুলাইয়া প্রভৃতি, বহু ধাতু বাংলা ভাষার প্রয়োজন ও প্রবণতার সাক্ষ্য

দিতেছে। জন্মিল, আরম্ভিল, বাহিরায়, তেয়াগিয়া, চিকণিয়া, ফলিল (সংস্কৃতেও), জড়াইয়া ('জট' হইতে), মুঞ্জরিল ('মঞ্জরী' হইতে), বিউনিল (ব্যজনী হইতে), প্রসবিল প্রভৃতি বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে বহু পূর্ব্ব হইতেই আসন পাতিয়াছে। 'প্রসবিল' যদি চলে, তবে মধুসূদনের 'বিলাপিল', 'প্রতিবিধানিতে' 'দানিল' প্রভৃতি না চলিবার কারণ কি? প্রাচীন কাব্যে 'উজোরল' (উজ্জল করিল), 'দীপে' (দীপ্তি পায়), উমতায়ল (উন্মত্ত করিল—'উমতায়ল মন মোর') যদি ব্যবহার হইয়া থাকে, তবে সেই নজিরে নূতন বাংলা কাব্যে নূতন ক্রিয়াপদের সৃষ্টি নূতন বলিয়াই গ্রাহ্য হইবে না কেন? 'সান্ত্বনিল', 'বিলম্বিল' প্রভৃতি এমন কি দোষ করিয়াছে? 'বাঞ্ছে' (বাঞ্ছা বা কামনা করে) যদি চলিয়া থাকে, তবে 'ইচ্ছে' চলিবে না কেন? বিদাইনু, বিমুখিবে, সমরিব, উলঙ্গিল (অসি), বিনোদিয়া (চক্ষু) প্রভৃতি যদি ব্যাকরণে বাধে, তবে সে কোন্ ব্যাকরণ? মধুসূদনের সময়ে বাংলাভাষা যে রূপ ধারণ করিতেছে, সে রূপ পূর্ব্বে তাহার ছিল না—কারণ, আবশ্যক হয় নাই; এ ব্যাপারে কবির কাজ আগে—ব্যাকরণ পরে। মধুসূদন যাহা করিয়াছিলেন তাহারই ফলে, পরবর্ত্তী বাংলা কাব্যে আমরা অনেক নূতন প্রয়োগ পাইয়াছি, যথা—হিল্লোলিছে, কল্লোলিয়া, অঙ্কুরি' (অঙ্কুরিয়া), পুষ্পিয়া, ব্যথিয়া ('ব্যথিয়া উঠে নীপের বন পুলকভরা ফুলে'—রবীন্দ্রনাথ; 'ব্যথিয়া নয়ন মন'—বিহারীলাল), আকুলিয়া, আঁধারিল, নীরবিল, ধ্বনিছে, অঞ্জলিয়া, চঞ্চলি', মুকুলি', আশীষিল প্রভৃতি। সেকালে বঙ্কিমচন্দ্রও 'স্বনিল' 'নির্ঘোষিল'—মানিয়া লইতে পারেন নাই। একজন পরবর্ত্তী কবি 'নূপুরিয়া চরণে' (চরণে নূপুর পরাইয়া) পর্য্যন্ত লিখিতে দ্বিধা করেন নাই; ভারতচন্দ্রেও ইহার নজির আছে, যথা—'কুলুপিল কুলুপ কপাটে'। এ সকল হইতে প্রমাণ হয় যে, মধুসূদনের এই আচরণকে স্বৈরাচার না বলিয়া বীরাচার বলাই সঙ্গত; ইহা দ্বারা তিনি, ছন্দকে স্বচ্ছন্দ করার মত, ভাষারও স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিয়াছিলেন। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বক্তব্য এই যে, 'মেঘনাদবধে'র ভাষায় খাঁটি পুরাতন বাংলা ক্রিয়াপদের ব্যবহার যত আছে তাহার তুলনায় এইরূপ নামধাতুর প্রয়োগ অল্পই বলিতে হইবে—আমাদের অনভ্যস্ত চোখে এগুলি বেশি করিয়া লাগে বলিয়াই, মনে হয়, মধুসূদন ইহাদের উপরে প্রধানত নির্ভর করিয়াছেন; বরং এই সকল খাঁটি বাংলা ক্রিয়াপদের প্রাচুর্য্যেই 'মেঘনাদবধে'র ভাষা এমন জীবন্ত বলিয়া মনে হয়।

তথাপি, আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, 'মেঘনাদবধে'র ভাষায় এই ক্রিয়াপদের ব্যবহারে কোথাও অনাবশ্যক হঠকারিতা নাই ; নিয়মের সঙ্গে অনিয়মও আছে—অনেক স্থলে কবির মাত্রাজ্ঞানের অভাব লক্ষিত হয়। ইংরেজীর অনুকরণে ক্রিয়াপদ-সৃষ্টির ঝোঁকও তাঁহার ছিল ; যেখানে মাত্রাতিরিক্ত হইয়াছে, সেখানেই তাহার ফল ভাল হয় নাই। এইরূপ প্রয়োগের মধ্যেও 'আয়াসিতে' (আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ দিতে) যতটা অশোভন মনে হয়, নির্ব্বীরিবে' ('নির্ব্বীরিবে লঙ্কা আজি') ততটা নয় ; বরং 'নিঃশঙ্কিলা' অপেক্ষা সুন্দর ও সুষ্ঠু হইয়াছে। এ বিষয়ে 'টেবিলিল সূত্রধর, কাপড়িল তাঁতি'-র যে প্রতিবাদ তাহা আমরা অস্বীকার করি না ; কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, কবির এইরূপ দুঃসাহসিকতা ভাষার যে উপকার করিয়াছে—অতিশয় সংযমী, সুবোধ ও সাবধানী লেখকের দ্বারা তেমন উপকার কখনও হইতে দেখা যায় নাই। কবির স্বাধীনতাকে কোন ব্যাকরণের দ্বারা—বিশেষত যে ভাষাই তখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণাঙ্গ হয় নাই, সেই ভাষার একটা ব্যাকরণ ঠিক করিয়া লইয়া—তদ্দ্বারা সংযত করিতে চাহিলে, ভাষাই পঙ্গু হইয়া থাকে। আমরা যাহাকে ভাষার সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি বলি, তার অধিকার প্রতিভা-শালী শক্তিমান কবিরই আছে, এবং কবিকীর্ত্তির অপরাপর লক্ষণ দেখিয়া সে অধিকার সাব্যস্ত করিতে হয়। কবির ব্যক্তিত্বের মত তাঁহার ভাষায় যদি কোন বিশেষ লক্ষণ থাকে, তবে তাহা বৈশিষ্ট্য বলিয়াই পরিগণিত হয়—মধুসূদনের ভাষার এই লক্ষণও তেমনই। তাই, এই নামধাতুর মধ্যে কয়েকটিকে—যথা, 'সরস' (সরস কর), 'অযতনে' (অযত্ন করে), স্নেহেন (স্নেহ করেন) প্রভৃতি —আমরা মধুসূদনের নিজস্ব প্রয়োগ বলিব ; বাকিগুলি শুধুই মধুসূদনের কবি-ভাষা নয়—বাংলা কাব্যেরই ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এরূপ স্বেচ্ছা-প্রয়োগ অন্য কবিদেরও আছে—মধুসূদন যেমন 'ত্রাসে' (ত্রস্ত হয় অর্থে) লিখিয়াছেন, তেমনই রবীন্দ্রনাথও 'উদাসে' 'বিবশে' লিখিয়াছেন ; এমন কি, ঠিক ঐরূপ প্রয়োগই করিয়াছেন, যথা—'তব গৌরবে সকল গর্ব্ব লাজে যেন সদা লাজে গো' ; এখানে 'লাজে' অর্থ—'লজ্জা পায়'। 'লোভাতে' (লোভ পাওয়াইতে বা লুব্ধ করিতে) শব্দটিও একাধিক কবি ব্যবহার করিয়াছেন ; সম্ভবত ইহাও একটি প্রচলিত বুলি। অতএব নামধাতুই বাংলা ভাষার আসল ধাতু বলিয়া মনে হয়।

মধুসূদনের ভাষায় আরও দুই একটি ব্যাকরণঘটিত রীতি-বৈষম্য দেখা যায়।

কর্ম্মকারকে সাধারণত—কে, বা—রে-বিভক্তিচিহ্নের পরিবর্ত্তে কবিতায় এ-চিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে, যথা 'লক্ষ্মণকে দেখিলাম' স্থানে 'হেরিনু লক্ষ্মণে'। কিন্তু মধুসূদনের এ-চিহ্ন-ব্যবহারে একটু বিশেষত্ব আছে বলিয়া মনে হয়—যেখানে সাধারণত এ-চিহ্ন আবশ্যক হয় না, সেখানেও কতকগুলি স্থানে তিনি এ-চিহ্ন রাখিয়াছেন। প্রাচীন রীতির অনুযায়ী হইলে সর্ব্বত্র এইরূপ করাই সঙ্গত, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। 'মজালে রাক্ষসকুলে', 'জুড়াই নয়নে', 'শুনিলা ঘোর কোলাহলে', 'ভাঙিনু পিনাকে', 'খুলিবে পূর্ব্বাশার হৈমদ্বারে', 'আস্ফালিল শূলে'—এইরূপ বহু স্থানে আছে, অথচ সর্ব্বত্র এরূপ নহে। অতএব, ইহার পক্ষে বৈয়াকরণেরা কি সূত্র নির্ম্মাণ করিবেন জানি না—আমার মনে হয়, এরূপ স্থলে, কোথাও শব্দটির উপরে কোনরূপ অর্থের জোর দিবার জন্য, কোথাও বা ছন্দের ধ্বনি-সৌষ্ঠব রক্ষার জন্য, কবি এইরূপ করিয়া থাকিবেন। কারণ যাহাই হোক, ব্যাপারটি লক্ষ্য করিবার মত। 'রাক্ষসকুলে', 'ফুলকুলে', 'শিলাকুলে', 'সে সকলে', 'ফলকপুঞ্জে' প্রভৃতি সকল বহুবাচক শব্দে যেমন এই এ-বিভক্তি চিহ্ন দেখা যায়, তেমনই সমগ্রতা বা ব্যাপ্তি অর্থ যেখানে আছে, সেখানেও এইরূপ এ-কার যুক্ত হইয়াছে, যথা—'আঁধারি জগতে', 'আবরি অম্বরে'। আবার -টা, -টি, -খানির মত, বিশেষ-নির্দ্দেশের অভিপ্রায়েও এইরূপ এ-কার যুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, যথা—'রক্ষ নাথ লক্ষ্মণের দেহে' (দেহটা), 'পরিলা দুকূলে' (দুকূলখানি), আনিবে ঔষধে' (ঔষধটি)। মধুসূদন যে ভাষা সম্বন্ধে কত সতর্ক ছিলেন—শব্দচয়ন ও শব্দযোজনা, বাক্যসৃষ্টি ও বাক্যের গঠন, সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ সজাগ ছিলেন—তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি এই বিষয়টির উল্লেখ করিলাম। আরও একটি বিষয়ে মধুসূদনের ব্যাকরণ-নিষ্ঠার প্রমাণ আছে। বাংলা ক্রিয়া-বিশেষণগুলিতে সাধারণত এ-বিভক্তি-চিহ্ন থাকে, ইহাই পুরাতন রীতি; ভাষাতত্ত্ববিদেরা ইহাকে করণ-কারকের বিভক্তি বলিয়া থাকেন। এই রীতি অনুসারে, 'সত্বর গমন করিল' না লিখিয়া 'সত্বরে গমন করিল' লেখা উচিত, কিন্তু এই বিভক্তি-চিহ্ন এক্ষণে প্রায় খসিয়া যাইবার মত হইয়াছে। মধুসূদন কিন্তু এই বিভক্তি-চিহ্নটিকে একটু অধিক মান্য করিয়াছেন—'মন্দে মন্দে', 'দ্রুতে', 'ত্রস্তে' তাহার প্রমাণ। এইরূপ করিবার একটু কারণ ছিল। বাক্যের স্বল্পাক্ষরগাঢ়তার জন্য মধুসূদনকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল; এজন্য বিশেষণমাত্রকেই ক্রিয়া-বিশেষণ করিবার প্রয়োজনে তিনি এই রীতিটিকে সর্ব্বদা কাজে লাগাইয়াছেন। ইংরেজী বাক্যরীতির স্বাচ্ছন্দ্য বাংলায় কতকটা আনিবার

অভিপ্রায়ে, তিনি অনেক স্থলে বিশেষণকে কর্ত্তা বা কর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ করিয়া ক্রিয়ার সহিত যুক্ত করিয়াছেন ; ইহাতে বাক্য-সংক্ষেপ হয়, অর্থের একটু গাঢ়তাও হয়। 'নাদিল গম্ভীরে' (গম্ভীর নাদ করিল) 'উত্তরিল (প্রগল্‌ভতাপূর্ণ উত্তর করিল), 'দীপে উজ্জ্বলে' (উজ্জ্বল দীপের মত জ্বলে) 'চাহিল ত্রস্তে' (ত্রস্ত হইয়া চাহিল)—এ সকল স্থলে ক্রিয়াবিশেষণগুলির ক্রিয়া অপেক্ষা কর্ত্তা বা কর্ম্মপদের দিকেই আকর্ষণ বেশি। "উভয়ে যুঝিল ঘোরে" এখানে 'ঘোরে' ক্রিয়া-বিশেষণ হইলেও, আদৌ উহা যুদ্ধেরই বিশেষণ, অর্থ—উভয়ে ঘোর যুদ্ধ করিল। বাংলা ক্রিয়া-বিশেষণের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম এখনকার ভাষার বোধ হয় আর ঠিক করিয়া দেওয়া যাইবে না,—নানা স্থানে ইহার নানারূপ, এবং তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইবে; আমি এখানে সেই ব্যাকরণ-বিধির আলোচনা করিতেছি না। তথাপি, এই বিভক্তিচিহ্ন-ব্যবহারে, বাংলাভাষার রীতি সম্বন্ধে মধুসূদনের যে সজ্ঞানতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা, অন্য অনেক বিষয়ে নূতনত্বের প্রয়াস সত্ত্বেও যে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচায়ক, তাহাও উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ যেখানে অনায়াসে 'ত্রস্ত' লিখিয়াছেন ('কুটির হতে ত্রস্ত এস তাই'—কৃষ্ণকলি, 'ক্ষণিকা'), মধুসূদন সেখানে 'ত্রস্তে' লিখিতেই বাধ্য হইয়াছেন।

মধুসূদনের ভাষায় কোথাও কোথাও স্পষ্ট ইংরেজী প্রভাব আছে—তাহা সর্ব্বত্র দোষাবহ নয়। 'বারীন্দ্র' 'জলনাথ' 'জলদলপতি' 'জলদলেশ্বরী' প্রভৃতি শব্দ-নির্ম্মাণে ইংরেজীর ছায়া আছে, তাহাতে সৌন্দর্য্যহানি হয় নাই। আর এক প্রকার শব্দযোজনায় মধুসূদনের বিশেষ আসক্তি দেখা যায়, যথা—'রাঘব-বাঞ্ছা', 'কেশব-বাসনা', 'রাঘবকুল-মঙ্গল', 'দৈত্যকুল-মাৎসর্য্য' প্রভৃতি। এগুলিতেও ইংরেজীর স্পষ্ট প্রভাব আছে—ভাববাচক শব্দকে সেই ভাবের পাত্র বা আধার অর্থে ব্যবহার ইংরেজী সাহিত্যের একটি অলঙ্কার হইলেও, বাংলায় তাহা সুপ্রযুক্ত হয় না ; যদিও 'রাক্ষসকুল-ভরসা' (রবীন্দ্রনাথের 'ভুবন-ভরসা')—'ভরসার স্থল' অর্থে বাংলায় বাধে না ; এবং 'রাক্ষসকুল-কলঙ্ক' বা 'রক্ষোকুল-কালি' সম্পূর্ণ রীতিসম্মত—'বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না'র মত অলঙ্কার আমাদের ভাষার অনুপযোগী নহে। 'জগৎ-নয়নানন্দ' যদি নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে 'রঘুরাজগৃহ-আনন্দ'ও রীতিবিরুদ্ধ নয়। মধুসূদনের ভাষার আরও দুই একটি রীতি নূতন বলিয়া মনে হয় ; এখানেও বিদেশী রীতির প্রভাব আছে। আমি কেবল উদাহরণ মাত্র দিলাম।

(১) একই বাক্যে সমান কর্ত্তৃবাচক দুইটি পদ—

…কহিলা মহিষী চিত্রাঙ্গদা চাহি সতী
রাবণের পদে
* * *

মা আমার দাসী পাশে আসি দয়াময়ী কহিলা…
* * *

আপনি পার্ব্বতী, দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা…
* * *

হেথায় চেতন পাই (পাইয়া) মায়ার যতনে
সৌমিত্রি হুঙ্কারে ধনু টঙ্কারিল বলী।…
* * *

…চামুণ্ডা যেমতি রক্তবীজে নাশি দেবী
ফিরিলা নিনাদি…
* * *

সবিস্ময়ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত নেতৃনাথে,
সিন্ধুতীরে চলিয়া সুমতি—

[কর্ত্তৃপদের দ্বিতীয় শব্দগুলি—সতী, দয়াময়ী, সাধ্বী, বলী, দেবী, সুমতি—প্রায় সকলেই বিশেষণ-পদ হইলেও উহারা এখানে বিশেষ্যের মতই, এবং অন্যত্রও সেইরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।]

(২) বাক্যের মধ্যে বিশেষণ-পদের নূতন অন্বয়-রীতি—

চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্র শোকে বিকলা। (বিকলা হইয়া)
* * *

মোর বরে পশিবে দুজনে অদৃশ্য। (অদৃশ্য ভাবে)
* * *

কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে
চিরবন্দী। (চিরবন্দী-দশায়)
* * *

মৃগপাল যথা ধায় বেগে…উর্দ্ধশ্বাস! (উর্দ্ধশ্বাসে)
* * *

চিরপরিমলময় সমীর বহিছে বাসন্ত।
* * *

রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে…শোকার্ত্ত!
* * *

কাঁদে রক্ষোরথী,…হতজ্ঞান! (হতজ্ঞান হইয়া)

[একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে,—বিশেষণ-পদের এই দুরান্বয় ছন্দের জন্যই নহে। 'বাসন্ত' ও 'শোকার্ত্ত' এই দুইটি বিশেষণে জোর দিবার জন্য উহাদিগেকে ঐরূপ শেষে আনা হইয়াছে।]

ইংরেজী রীতির প্রতি মধুসূদনের এইরূপ পক্ষপাতের দুইটি অভিনব কৌতুককর নিদর্শন এ কাব্যে আছে। মধুসূদন 'নশ্বর' শব্দটি ইংরেজী 'mortal' অর্থে

ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—'নশ্বর শরে', 'নশ্বর রণে', 'নশ্বর দংশনে'। এমনই আর এক স্থানে, 'প্রতারিত রোষ'-এর অর্থ করিতে হইবে—'প্রতারণাপূর্ণ (pretended, feigned) রোষ'।

ব্যাকরণ লঙ্ঘন না করিয়াও মধুসূদন দুই একটি এমন শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা সুষ্ঠু বা শোভন হয় নাই ; ইহাদের মধ্যে 'গীতী' ও 'শোকী', 'দৈত্যকুলদল' ও 'রক্ষোবংশধ্বংস' (দলনকারী ও ধ্বংসকারী অর্থে) ব্যাকরণ ভিন্ন আর কিছুরই সাক্ষ্য দেয় না। 'শোকাকুল' বা 'শোকার্ত্ত' না লিখিয়া 'শোকী' লিখিবার প্রয়োজন হয়তো ছিল—'মিত্র শোকে শোকাকুল' না লিখিয়া কবি 'মিত্রশোকে শোকী' লিখিয়াছেন ; 'মিত্রশোকে আকুল' লিখিলে তেমন জোর হয় না, আবার, পূরা 'শোকাকুল' বড় হইয়া যায়—এই উভয় সঙ্কটে কবি 'শোকের' এক নূতন বিশেষণ সৃষ্টি করিলেন ; স্বল্পাক্ষরতার প্রয়োজনে তাঁহাকে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে। বাংলায় 'রোগ' হইতে 'রোগা' হয়, কিন্তু 'শোক হইতে 'শোকা' হয় না ; যদিও 'শোকা-তাপা মানুষ'—এমন ভাষা আমরা মায়েদের মুখে শুনি। লোভ হইতে 'লোভা'ও দেখা যায়—ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'কি কাজ মুক্তায়, হাড়ের মালায় কন্যার মা হবে লোভা' ; 'মনোলোভা'র তো কথাই নাই। কিন্তু মধুসূদনের ভাষায় খাঁটি বাংলা বুলির উপরে কোথাও হস্তক্ষেপ নাই—ভাষার সম্বন্ধে তাহার সংস্কার এমনই দৃঢ় ও অভ্রান্ত ছিল ; তাই নূতন সৃষ্টির জন্য তিনি সংস্কৃত শব্দ ও সংস্কৃত ব্যাকরণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

কিন্তু আরও কয়েকটি ব্যাপারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাকরণ-অভিধানের জ্ঞান এবং তাহার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকিলেও, মধুসূদন কবিহিসাবে কিছু স্বাধীনতার দাবি রাখিতেন—নিজস্ব কবিভাষা-নির্ম্মাণে একটু সাহস ও স্বেচ্ছাবৃত্তি উৎকৃষ্ট কবি-নীতি বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্যই বোধ হয়, প্রয়োজন না থাকিলেও, সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই তিনি ইচ্ছা করিয়া মাঝে মাঝে ব্যাকরণের শাসন লঙ্ঘন করিতেন ; নতুবা, 'দমনিয়া' 'দানিয়া' প্রভৃতির প্রয়োজন যে কারণেই থাক, 'নায়কী' বা 'গায়কী'র কোন প্রয়োজনই ছিল না ; 'কৌমুদিনী'র সার্থকতা যেমনই হোক, 'প্রফুল্লিত' চলে বলিয়া 'বিকচিত' চলিবার কোন কারণ নাই। 'রূপসী'র পুংলিঙ্গে 'রূপস' হাস্যোদ্রেক করে মাত্র, ইহার সংস্কৃত মূল যেমনই হোক (রূপীয়স—রূপীয়সী ?)। এ সকল ছাড়া, আরও কয়েকটি শব্দ খাঁটি আর্ষপ্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' এইরূপ অবাচকতা-দোষ তিনটি আমার

চোখে পড়িয়াছে।—(১) মধুসূদন 'রজত' অর্থে 'রজঃ' লিখিয়াছেন, যথা—'কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন'; (২) ভীষণ রব বা ঘোর কোলাহল অর্থে 'ভৈরব', যথা—'লঙ্কা পূরিল ভৈরবে'; (৩) কোষ বা পিধান অর্থে 'নিকষ', যথা—'নিকষে যথা অসি'।

ইহার পর, 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' যে কয়টি দাঁতভাঙা বা দুর্ব্বোধ্য শব্দ আছে তাহার একটি তালিকাও দিব: তাহা হইতে দেখা যাইবে, সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে এইরূপ শব্দের ব্যবহার এত অল্প যে, তজ্জন্য মধুসূদনের ভাষার যে দুর্নাম আছে, তাহা যথার্থ নহে। এরূপ শব্দ যে আদৌ কেন অছে, তাহার একটা কারণ আমি ইতিপূর্ব্বে অন্য প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি তাহাই—অর্থাৎ মধুসূদন সেকালের পণ্ডিতদিগের জন্য একটু ভাবনা না করিয়া পারেন নাই। "ঈশাক্ষের উষর্বুধে মারা গেল মাব। নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার॥"—তখনও একেবারে অপাংক্তেয় হয় নাই। সেইজন্যই সম্ভবত, এখানে ওখানে দুই চারিটি দুর্দ্দন্ত্য শব্দের প্রয়োগ তিনি অনাবশ্যক মনে করেন নাই। আমি এই কয়টি শব্দমাত্র আপত্তিকর মনে করি:—ইরম্মদ, কলম্ব, অবলেপে, যাদঃপতি, প্রক্ষেড়ন, মলম্বা, বামী, ওদন, আস্কন্দিত, অররু, হর্য্যক্ষ, প্রতিঘ, রয়, কাদম্বা। বাকি যে শব্দগুলি আধুনিক সাহিত্যিকবর্গের অরুচিকর অর্থাৎ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বর্জ্জনীয় মনে হইবে, সেগুলি মধুসূদনের কাব্যের স্টাইল-বিরুদ্ধ নয়; অতএব তাহাদের সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না। এই শব্দগুলির মধ্যেও, 'ইরম্মদ' স্থানবিশেষে ব্যবহারযোগ্য, 'প্রক্ষেড়ন' একটি অস্ত্রের নাম, এবং 'আস্কন্দিত' এমন একটি শব্দ যাহার প্রতিশব্দ বাংলায় নাই, এবং মধুসূদনের কাব্যে, অন্যান্য অনেক শব্দের মত ইহাও কাজে লাগিয়াছে—অশ্বের একটি বিশেষ গমন-ভঙ্গি (মন্দগতি অথচ নৃত্যশীল) বুঝাইবার জন্য তিনি ইহা ব্যবহার করিয়াছেন; 'ওদন' শব্দটি প্রাচীন বাংলা কাব্যেও আছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। মধুসূদনের ভাষায় বিদেশী শব্দ প্রায় নাই বলিলেই হয়, কেবল এই কয়টিমাত্র আমি লক্ষ্য করিয়াছি, যথা—'রবাব', 'সরম', 'মলম্বা', 'বারুদ'; 'সাবাসি' বা 'বিদায়' ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। এই কয়টিও বোধ হয় অনবধানতাবশত প্রবেশ করিয়াছে; কারণ, মধুসূদন যেন এইরূপ প্রয়োগ সর্ব্বত্র অতি সাবধানে বর্জ্জন করিয়াছেন। আমি 'বরজ' শব্দটিকেও ('বরজে সজারু পশি বারুইর যথা') এই শ্রেণীভুক্ত মনে করিয়াছিলাম—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে ইহা অরবী 'বুর্জ' বা 'বুরুজের'-এর অপভ্রংশ

বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কিন্তু পরে জানিয়াছি শব্দটি দেশী, সেন-রাজগণের আমলের একখানি তাম্রশাসনে ইহার উল্লেখ আছে। মধুসূদন তাহা না জানিয়াও খাঁটি বাংলা শব্দহিসাবে উহা ব্যবহার করিয়াছেন।

মধুসূদনের ভাষার যত কিছু ত্রুটি বা স্বেচ্ছাচার, এবং তাহার বাক্‌ভঙ্গি ও বাক্যগঠনে যেটুকু বিদেশী প্রভাব আছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিলাম। ব্যাকরণ বা প্রচলিত শব্দার্থরীতির সম্পূর্ণ বশ্যতা-স্বীকার কোন মৌলিক কবি-প্রতিভার পক্ষে সম্ভব নয়; কেবল, ভাষার প্রকৃতি ও কবির স্টাইল এই দুইয়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য থাকাই বাঞ্ছনীয়। অতিশয় মৌলিক প্রকাশ-ভঙ্গি বা অভিনব কবি-ভাষায় এই সামঞ্জস্য যত অধিক হয়, ততই কবির কবিশক্তির গৌরব। যাঁহারা আর কোন দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কবি-ভাষার বিচারে কেবল ব্যাকরণ খুলিয়া বসেন, তাঁহারা সাহিত্য-সমালোচনার অধিকারী নহেন। কবি-ভাষার প্রধান কৃতিত্ব ভাবকে রূপ দান করা, রসকে বাক্যের দ্বারা মানস-গোচর করা; এজন্য কাব্যের ভাষা সম্বন্ধে ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে—"It is not so much a triumph of language as a triumph *over* language"। মধুসূদনের ভাষার সর্ব্ববিধ ত্রুটিসত্ত্বেও, সেই ত্রুটি যে কারণে ঘটিয়াছে, ঠিক সেই কারণেই—কবির প্রতিভাজনিত আত্মপ্রত্যয় বা দুঃসাহসের ফলেই—'মেঘনাদবধ-কাব্যে'ই আধুনিক বাংলা কাব্যের ভাষা সর্ব্বপ্রথম রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে। আমি যে ত্রুটিগুলির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করিয়াছি, তাহাতে, কবির অভিপ্রায় ও সেই অভিপ্রায়সাধনে যে বাধা ছিল, প্রধানত তাহাই নির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছি। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই কাব্যরচনাকালেও মধুসূদনের কবিশক্তির পরীক্ষা চলিতেছে, এ কাব্যেও তাঁহার কবিশক্তির পূর্ণ পরিণতি ঘটে নাই—সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

একাদশ অধ্যায়

মেঘনাদবধ-কাব্যের কবি-ভাষার নবত্ব—দেশী ও বিদেশী কাব্যকলার অনুকরণ ; দেশী অলঙ্কারের প্রাধান্য, তাহার হেতু , কয়েকটি বিশিষ্ট অলঙ্কার , বিদেশী কাব্যকলা ও কল্পনা-ভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রভাব , কবির সর্ব্বাধিক কৃতিত্ব , শেষ কথা ।

অতঃপর 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ভাষার কবিত্ব বা কাব্যকলার পরিচয় দিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। আমি ইতিপূর্ব্বে মধুসূদনের কবিভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ বা স্টাইল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি ; এক্ষণে সেই ভাষার কলাকৌশল সম্বন্ধেও কিছু বলিবার প্রয়োজন এই যে, তাহাতেও, দেশী ও বিদেশী কাব্যকলার যে মিলন ঘটিয়াছে, তাহা আমাদের একালের এই প্রথম আধুনিক কবিভাষার আলোচনায় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমেই 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার-বাহুল্যের কথা বলিতে হয়। এই ধরনের আলঙ্কারিকতা প্রাচীন আদর্শের কবিকর্ম্ম বলিয়াই, বোধ হয়, মধুসূদন তাহাতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই—কোনরূপ নিয়মরক্ষাই করিয়াছেন ; অনেক স্থলে তাহা কবির ভাষা না হইয়া কাব্যের ভাষা হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন কাব্যে কালিদাস, ও আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, যে ধরনের উৎকৃষ্ট কবিশক্তির পরিচয় এই উপমাতেই দিয়াছেন, মধুসূদনের কবিশক্তি যে তাহার অনুরূপ নয় তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কালিদাস অলঙ্কারশাস্ত্রের গৌরববৃদ্ধি করিয়াই এইরূপ অলঙ্কারকে তাঁহার বিশিষ্ট কবিত্বে মণ্ডিত করিয়াছেন ; রবীন্দ্রনাথ অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়াই, স্বাভাবিক কবিবৃত্তির বশে, যে অত্যুৎকৃষ্ট উপমা তাঁহার রচনায় রাশি রাশি ছড়াইয়াছেন, তাহাতে কালিদাসকেও তিনি কোন কোন বিষয়ে অতিক্রম করিয়াছেন ; এবং উপমা যে কাব্যের অলঙ্কার নয়, কবিকল্পনারই একটি সহজ প্রকাশভঙ্গি—প্রাচীন ও আধুনিক সকল কাব্যেরই কবিত্বের উপাদান, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। মধুসূদন দেশীয় প্রাচীন কাব্য-কলারই মান রাখিয়াছেন—তজ্জন্য সংস্কৃত কাব্য-অলঙ্কার এবং প্রাচীন বাংলা কাব্য ভাল করিয়াই পাঠ করিয়াছিলেন। ইহার নিদর্শনস্বরূপ আমি প্রথমেই 'মেঘনাদবধ-কাব্য' হইতে একটি খাঁটি শাস্ত্র-সম্মত অলঙ্কার উদ্ধৃত করিতেছি। রাত্রিকালের একটি ঘটনার বর্ণনা এইরূপ—

বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান, সচকিতে জগৎ জাগিলা,

ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা, আর পাখী যত,
পুরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সঙ্গীতে।
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে।

ইহার নাম 'ভ্রান্তিমান' অলঙ্কার। মধুসূদন এ সকলের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই; এবং ইহারই পুরস্কারস্বরূপ সেকালের পণ্ডিত-গণের প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার পত্রে উদ্ধৃত সেই উক্তি, 'হাঁ, মন্দ হয় নাই, উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে'। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে, ইহাতেও একরূপ কবিশক্তির পরিচয় আছে; এবং আবশ্যকমত এইরূপ অলঙ্কার-রচনা মধুসূদনের প্রতিভার উপযোগী হইলেও, ইহার মধ্যে যে স্বচ্ছন্দ-কল্পনা ও মাত্রাজ্ঞান আছে, তাহাতে আধুনিক ও প্রাচীন রুচির সমন্বয়-সাধনে তাঁহার কৃতিত্ব অল্প নহে। এক্ষণে আমি এমন কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিব, যাহাতে কৃত্রিম কলাকৌশলের উপরে কবিত্বই জয়ী হইয়াছে।—

চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্র! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গার, পরশু
স্থানে স্থানে,—
পড়িয়াছে যন্ত্রিদল যন্ত্রদল মাঝে।

*　*　*

পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়!

*　*　*

পশিলা ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা, যথা গরুত্মতী তরী
তরঙ্গনিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল-সাগর-জলে ভাসে একাকিনী!

*　*　*

রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুমমাত্র অরণ্যে যেমতি।

*　*　*

হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষু বিনোদিয়া—

তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর।
* * *
জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হ'তে
করপদ্মসঞ্চালনে !
* * *
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।
* * *
নয়নজল, অবিরল বহি
ভ্রাতৃলোহসহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে
পড়ে তলে প্রস্রবণ !
* * *
উচ্ছ্বাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে,
মহীরুহব্যূহ যথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে,
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে।
* * *
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয় ? যে তরুবাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিন মুখ সেও হে সেকালে !
* * *
বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
রাবণ ,—বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে ,—
* * *
করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে !

উপরি-উদ্ধৃত কবি-বচনগুলি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন ও অবকাশ নাই ; আমি যতদূর সম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্তগুলির দিকেই দৃষ্টি করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে দুই জাতীয় উপমা আছে—কতকগুলিতে নিত্যপরিচিত ব্যাপারের সহিত সাদৃশ্য-যোজনা, তাহাতে বর্ণনার ভাবচিত্র নিমেষে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আর কতকগুলি আছে, তাহার রস বাস্তব-অভিজ্ঞতার ভাব-রস নয়—অনুভূতি-কল্পনার আয়ত্ত। 'তুলসীর মূলে সুবর্ণ-দেউটি', 'অশোকের ফুল—অশোকের তলে,' 'জননী যেমতি—মশকবৃন্দে' —এগুলির মধ্যে যে সহজ ও সুস্পষ্ট চিত্র আছে, তাহাই মহাকাব্যের বিশিষ্ট রস-

প্রকৃতির অনুকূল; ইহাই ক্লাসিক্যাল কাব্যরীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আবার, 'ত্বিষাম্পতি শান্তরশ্মি', 'উচ্ছ্বাসিল বীরবৃন্দ' এবং 'ধুতূরার মালা যেন'—এগুলি শুধুই বাস্তব অভিজ্ঞতা বা নৈতিক সৌন্দর্য্যবোধের পরিপোষক নয়; ইহারা—বস্তুর রূপ, অথবা উপমান-উপমেয়-সম্পর্কের সুষমাকেও ছাড়াইয়া, একটা ব্যাপকতর রসচেতনার নিমিত্ত বা সঙ্কেত হইয়া দাঁড়ায়। মরণাহত, ভূপতিত মেঘনাদকে দিগন্ত-আশ্রয়ী অস্তমান সূর্য্যের সহিত উপমিত করায়, উপমেয়কে যেমন বিশিষ্ট গৌরবদান করা হইয়াছে, তেমনই উপমানকেও এমন একটি করুণ মহিমায় নূতন করিয়া আমাদের চক্ষে ধরা হইয়াছে যে সমগ্র সৃষ্টিব্যাপী একই অখণ্ডনীয় নিয়তির লীলা সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই—আমাদের অনুভূতি, বিশেষকে অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিশেষের অভিমুখী হয়। গহন বিপিনে, নিশীথ-সমীরণে, মহীরুহ-ব্যূহের উচ্ছ্বাস—ইহা অতিশয় বাস্তব হইলেও, আমাদের জাগ্রত চেতনাকে অভিভূত করিয়া মনের মধ্যে একটা অবাস্তব মায়ালোক সৃষ্টি করে, এবং তাহা নিত্য-পরিচিত ও সুস্পষ্ট নয় বলিয়াই, তাহার রস আরও উপাদেয়। 'ধুতূরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে'—এমন উপমা এ কাব্যে আর দ্বিতীয় নাই—যদিও ইহার রস আস্বাদন করিতে হইলে, হিন্দু-পুরাণের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং তজ্জনিত ভাব-সংস্কার থাকা চাই। এই সকল উপমার মূলে যে কল্পনাবৃত্তি আছে, তাহাই উৎকৃষ্ট কাব্যরসের জনয়িতা—এ কল্পনাকে রোমান্টিক নাম দিলেও, এবং ইহাই বিশেষ করিয়া আধুনিক কাব্যের আদর্শ হইলেও, ইহাই কবিত্বের চিরন্তন উৎস—ইহাকে আর কোন নাম দিবার প্রয়োজন নাই।

আর এক ধরনের আলঙ্কারিক কবিভাষা আছে—তাহা একরূপ বাক্-নৈপুণ্য মাত্র; কোন একটি ভাব, চিন্তা বা তত্ত্বকে সংক্ষিপ্ত ও শাণিত বচনের সাহায্যে উজ্জ্বল বা স্ফুটতর করিয়া তোলাই তাহার সার্থকতা। সংস্কৃতে, বিশেষত কালিদাসের কাব্যে, এইরূপ উৎকৃষ্ট কবিবচন অনেক আছে; আমাদের ভারতচন্দ্রও ইহাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মধুসূদনের কাব্যেও এই বচন-রচনার দৃষ্টান্ত আছে। আমি এখানে দুই একটিমাত্র উদ্ধৃত করিব, তাহাতে দেখা যাইবে, মধুসূদন এখানেও বিশুদ্ধ বাক্-নৈপুণ্য অপেক্ষা উপমার উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছেন; যথা—

যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর তাহার পরশে।

* * *

বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।
* * *
ভুলিল স্বধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি!
* * *
সর্ব্বহর কাল তারে পারে না হরিতে।
* * *
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে।
* * *
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙালী
* * *
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আসনে!

এরূপ বচন-রচনার প্রধান গুণ—বাক্যার্থের গাঢ়তা। ভারতচন্দ্রের 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ ॥' অথবা, 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর'—এইরূপ বচন-রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। উপরি উদ্ধৃত বচনগুলির মধ্যে একটিমাত্র এইরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—'যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙালী'; তাহাও ইংরেজ কবির "To be a Prodigal's Favourite—than, worse truth, a Miser's Pensioner" স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং তুলনায় সে উক্তি আরও উৎকৃষ্ট। আলঙ্কারিক বচন-রচনায় মধুসূদন বিশেষ সাফল্য লাভ করেন নাই, ইহাই সত্য। যদিও তাঁহার ভাষার প্রাচীন কবিভাষার অনুকরণ যথেষ্ট আছে, এবং তাহাও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক, তথাপি শব্দালঙ্কারে—যমক অনুপ্রাস প্রভৃতিতে তাঁহার যেমন পটুত্ব, অর্থালঙ্কারে তেমন নহে; তার কারণ—একটি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, অপরটি কাব্যবিধির বাধ্যতামূলক। মধুসূদনের কবি-প্রকৃতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা হইতেও তাহার প্রমাণ মিলিবে।

অতঃপর, 'মেঘনাদবধে'র কাব্যকলায়, বিদেশীয় প্রভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। এ প্রসঙ্গে আমি সাক্ষাৎ ঋণ-গ্রহণের উল্লেখ করিব না—সে সকলের প্রমাণ ও পরিচয়, ইতিপূর্ব্বে এ কাব্যের একাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণে প্রদত্ত হইয়াছে; আমি কেবল ভাব-কল্পনা ও প্রকাশভঙ্গির দিকটিই লক্ষ্য করিব, তখনকার বাংলা কাব্যের পক্ষে যে সকল কলা-কৌশল নূতন তাহারই কিছু পরিচয় দিব।

ইংরেজ কবির কাব্যকৌশলও এককালে য়ুরোপীয় কাব্যশাস্ত্রের শাসন মানিত; মধুসূদন, তথাকার প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের মত, সেই কাব্যশাস্ত্রেরও পরিচয় রাখিতেন; তাই 'মেঘনাদবধে'র কয়েকটি অলঙ্কার পাশ্চাত্য কাব্যকলার অনুকরণে

রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান ও সুস্পষ্ট,—একটির নাম Personification ; অপরটির নাম, Apostrophe। প্রথমটির সহিত যদিও আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রের 'সমাসোক্তি' অলঙ্কারের মিল আছে, তথাপি মূলে এ দুইটি এক নহে। দেশীয় অলঙ্কারটিতে শব্দার্থের কূট-কৌশলই মুখ্য, কিন্তু বিলাতীর তাহা নহে; কারণ সে অলঙ্কার কবিকল্পনাঘটিত—অতিশয় স্বাভাবিক ও ব্যাপক। প্রাকৃতিক বস্তু সকলের উপরে মানুষী-চেতনার আরোপ কবিতার জন্মকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে—বিদেশী কাব্যে ও পুরাণে যেমন, আমাদের কাব্যে ও পুরাণেও তেমনই ইহার অজস্র রূপ ফুটিয়াছে ; বরং, আমাদের শুধুই সাহিত্যে নহে, ধ্যান-ধারণাতেও, এইরূপ কল্পনার প্রসার আরও অধিক, ইহা হইতেই বহু আধ্যাত্মিক ভাব-বিগ্রহের জন্ম হইয়াছে। অতএব আমাদের সাহিত্যে এইরূপ অলঙ্কারের কোন নূতনত্ব নাই বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু মধুসূদন যে ভঙ্গিতে এই অলঙ্কার তাঁহার কাব্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা আমাদের কাব্যপদ্ধতিতে নূতন, এবং তাহাতে বিদেশী কাব্যকলারই স্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। আমি দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

কি সুন্দব মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি ?

*　　　*　　　*

নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি,
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরী,
তোমার !

*　　　*　　　*

ফুল-কুল-সখী উষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশাব হৈমদ্বারে পদ্ম-কর দিয়া
কালি,......

*　　　*　　　*

উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন-ভাবে
চাহিলা মহীর পানে ! উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।

*　　　*　　　*

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট, রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে

দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব।

দ্বিতীয়টি যে ধরনের অলঙ্কার, তেমনটি আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রেও নাই ; ইহার দ্বারা, অনুপস্থিতকে উপস্থিত বা অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষবৎ সম্বোধন করা হয়। মধুসূদন তাঁহার কাব্যে ইহারও যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছেন ; যথা —

কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি, তুষিতে পৌরবে ?

*　　*　　*

বিহারিছে বীরবব, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা , রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে , কিংবা, রে যমুনে,
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি···

*　　*　　*

উল্লাসে শুষি
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব···

*　　*　　*

গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবী, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি !······

*　　*　　*

···বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাসগিরি, তব উচ্চ-চূড়ে ?

কিন্তু এইরূপ নানা অলঙ্কার-যোজনাই 'মেঘনাদবধে'র কাব্যকলার মুখ্য গৌরব নয় ; এ কাব্যে প্রাচীন কাব্যভঙ্গির যে পরিবর্ত্তন, বা নূতনতর প্রকাশরীতির প্রবর্ত্তন দেখা যায়, তাহার সন্ধান না লইলে কাব্যপাঠ অসম্পূর্ণ থাকিবে। ইংরেজী ও তথা য়ুরোপীয় কাব্যের যে বিচিত্র কল্পনাবিলাস, এবং বাক্যেকে রসাত্মক করিবার যে নানা কৌশল, বাংলা ভাষায় আয়ত্ত করিতে না পারিলে, নবযুগের নূতন বাংলা কাব্যরচনা সার্থক হওয়ায় সম্ভাবনা ছিল না—মধুসূদন কিরূপ অবলীলাক্রমে ও অকুতোভয়ে সেই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহারই পরিচয়স্বরূপ, আমি এক্ষণে ভাব-কল্পনা ও প্রকাশরীতির সেই নবত্বসূচক কয়েকটি নমুনা এ কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিব—এবং তাহাতে আবশ্যকমত ক্ষুদ্রবাক্য ও বাক্যাংশ থাকিবে।—

(১) বিদেশী কাব্য-কল্পনা

যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা,…

*　*　*

লজ্জায় মলিনমুখী পলাইল দূরে
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
খদ্যোত ;

*　*　*

মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা !

*　*　*

চলিলা আকাশ-পথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি ; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে , সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে ।

*　*　*

ডাকিছে কূজনে
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখীকুল !

*　*　*

স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু রোগী-হাস্য যথা ।

*　*　*

কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে,
কৌমুদী নিশীথে যথা ! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,
মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণ-পদ্ম যথা !

*　*　*

…বসিতাম কভু দীর্ঘতরুমূলে
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় ।

*　*　*

সরসী আরসী মোর ।

*　*　*

…দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন নব তারাবলী ।

*　*　*

চলি গেলা স্বপ্ন দেবী ; নীল-নভঃস্থল
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে
তারা !

* * *

কালমেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারিদিকে ! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু !

* * *

শৃঙ্গানিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে,
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে।

* * *

...ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর-প্রার্থনে !

(২) পাশ্চাত্ত্য পুরাণের অনুসরণ

আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অবিন্দম
ইন্দ্রজিৎ।

* * *

...কোথা দেবী জলদলেশ্বরী
প্রিয়তমা সখী মম ? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে ?

* * *

স্বর্গের কনকদ্বারে উতরিলা মায়া
মহাদেবী, স্বনিনাদে আপনি খুলিল
হৈম দ্বার ! বাহিরিয়া বিশ্ব-বিমোহিনী,
স্বপন দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে,—

(৩) বিদেশী ভাব ও তদনুযায়ী ভাষা

পশ তুমি কৃতান্ত-নগরে,
সীতাকান্ত, দেখাইব আজি হে তোমারে
কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে।

* * *

বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।

* * *

নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা

*　　*　　*

দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদপুঞ্জে !

*　　*　　*

…যে দিন হরিল
পাপ-প্রাণ যম-দূত, সে দিন অবধি
রসনা-জনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।

*　　*　　*

রমার আশার বাস হরির উরসে—

*　　*　　*

নারিবে রজনী মূঢ় আবরিতে তোরে

*　　*　　*

চির কোলাহলময় পয়োনিধি-তীরে।

*　　*　　*

দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরী।
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ সম
জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ, পূজিবে ইহারে
প্রেতকুল, রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।

(৪) হোমার প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মহাকবিগণের কল্পনা, কাব্যরীতি ও অন্যান্য আদর্শ

বারীশ—পাশী, শূলীশম্ভুনিভ—কুম্ভকর্ণ; দেবাকৃতি—সৌমিত্রি; স্কন্দ—তারকারি সেনানী, বিভীষণ, বীরভদ্র—বলী,—প্রভৃতি নিত্যযুক্ত বিশেষণ। (বিভীষণ বলী—যেমন Tennyson-এর—'Bold Sir Bedivere')

*　　*　　*

…প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি; শীঘ্র দেহ ছাড়ি,
কারাবদ্ধ বায়ুদলে;…
উল্লাসে দেব চলিলা অমনি
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে। … … …
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারে বায়ুকুল বাহিরিল বেগে।

*　　*　　*

শব্দবহ আকাশ বহিলা
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে।

কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র। তা দেখি, সহসা
বায়ু বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা
তাহায়!

*　　　*　　　*

　　লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা
সুবর্ণ-ঘন-বাহনে ,

*　　　*　　　*

　　চলিলা আশু সৌরকররূপে
নীলাম্বর-পথে দূতী।

*　　　*　　　*

　　রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী
ধাইলা ধরিতে শবে।

(৫) বর্ণনীয়কে চাক্ষুষ করাইবার কৌশল

চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে
মেনকা……

*　　　*　　　*

　　　　　অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়কা ধরি' ড হড় হড়ে—
বজ্রশব্দে খোলে দ্বার;

*　　　*　　　*

পশ্চাতে সমুখে রাখি আলোকের রেখা
সিন্ধুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপসী
লঙ্কাপানে!

*

লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,
সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি।

(৬) বাক্যের পুনরাবৃত্তি দ্বারা ভাবের গাঢ়তা বৃদ্ধি

মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী!

*　　　*　　　*

"এবে কোথা সে রূপ-মাধুরী,
সে যৌবন-ধন হায়?"—অমনি বাজিল

প্রতিধ্বনি—"এবে কোথা সে রূপ-মাধুরী,
সে যৌবন-ধন হায় ?"···

[শেষেরটিতে পুনরুক্তির কারণও আছে। এ কাব্যে, কবি পাশ্চাত্ত্য গাথা এবং কাহিনী কাব্যের অনুকরণে, বহুস্থলে, দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত বাক্যের পুনরুক্তি দ্বারা ভাবকে রসঘন করিবার কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।]

উপরি-উদ্ধৃত উদাহরণগুলির সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, তাহা এই যে, বর্ণনা ও প্রকাশ-কৌশলের এই নূতনত্ব, আজিকার দিনে, উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে না হইলেও, আধুনিক বাংলা কাব্যের আদি-কবির ভাষায় ও কলা-কৌশলে এই নবত্বের লক্ষণ বাংলা কাব্যের ইতিহাসে অতিশয় মূল্যবান। আমি 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ভাষার যে বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা হইতে আশা করি, এ কাব্যের কবিকর্ম্মে যে দুরূহ সাধনা মধুসূদনের প্রতিভায় সম্ভব ও সফল হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ ধারণা হইবে। 'মেঘনাদবধ-কাব্য' যে যুগে যে অবস্থায় রচিত হইয়াছিল, তাহাতে, কেবল বাহির হইতে এ কাব্যের রূপ ও রস বিচার করিলে কবির কৃতিত্বের সম্যক পরিচয় লাভ হইবে না; কবি-কর্ম্মশালায় প্রবেশ করিয়া, সেখানে—যে উপকরণ উপাদান যে ভাবে কাব্য-নির্ম্মাণে নিয়োজিত হইতেছে; অতি সামান্য আয়োজনেই বৃহৎ অভিপ্রায়-সিদ্ধির উপায় হইতেছে; অতিশয় কঠিন আকারহীন ধাতুকে গলাইয়া পিটাইয়া রূপ দিবার অসাধ্যসাধন চলিতেছে—তাহা দেখিয়া লইতে না পারিলে, এ কবির কবিশক্তির পরিমাপও করা যাইবে না। মধুসূদনের প্রতিভার সর্ব্বাধিক কৃতিত্ব এই যে, তিনি বাংলা ভাষা ও বাংলা কবিতার সেই অবস্থায়—এত অল্প সময়ে, এমন আকস্মিকভাবে —সকল বাধা অতিক্রম করিয়া এমন একখানি কাব্য রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। সেই বাধাকে অতিক্রম করিবার সাহস ও শক্তি, এবং সেই বাধার দুরূহতার জন্যই যেন অধিকতর স্ফূর্ত্তি—'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র পরিচয়-প্রসঙ্গে, আমি সেই অদ্ভুত কাহিনী উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র সুদীর্ঘ আলোচনা শেষ করিলাম; ছন্দ সম্বন্ধে যে পৃথক প্রবন্ধ বাকি রহিল, তাহা এইরূপ আলোচনা নয় বলিয়া, 'মেঘনাদবধ-কাব্য'-পাঠ এইখানেই সমাপ্ত হইল। মধুসূদনের কাব্য শুধুই আধুনিক বাংলা কাব্যের

ইতিহাসগত নয়, তাহা শাশ্বত বাংলা সাহিত্যের সম্পদ—'a possession for ever'। এই কথাটাই একালের শিক্ষিত-সমাজের স্মরণে আনিবার জন্য, আমি বাংলা কাব্য-সাহিত্যের এই অতুলনীয় ক্লাসিকখানির নূতন করিয়া পরিচয় দিতে ব্রতী হইয়াছিলাম। গতযুগে বাঙালী-জাতির যে শক্তিস্ফুরণ হইয়াছিল—কর্ম্মে ও চিন্তায়, প্রতিভায় ও মনীষায়, মাত্র দুই পুরুষ পূর্ব্বেও বাঙালী যে কীর্ত্তিকুশলতার পরিচয় দিয়াছিল, আজ আমাদিগকে তাহার সকল দিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম, বিচার ও রসগ্রাহিতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি 'মেঘনাদ-বধ-কাব্য' আমাদের সেই অনতি-অতীত ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট গৌরব। কাব্যের আদর্শ যেমনই পরিবর্ত্তিত হউক, শক্তি ও প্রতিভার মানদণ্ড চিরদিন একই থাকিবে; যাহারা জীবিত বা জীবন-ধর্ম্মী, তাহারা সেই শক্তির সঞ্জীবনী প্রেরণা হইতে কখন বঞ্চিত হয় না; সম্পূর্ণ আত্মভ্রষ্ট না হইলে, কোন জাতি বা সমাজ পূর্ব্বগামী মহাপুরুষগণকে জানিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া, তাঁহাদের অমূল্য দান অগ্রাহ্য করে না। মধুসূদনের মহাকাব্য জাতির এমনই একটি সম্পদ; ইহাকে একালের কোন কৃতবিদ্য বাঙালী যদি বিস্মৃতি বা অবহেলার জঞ্জালস্তূপে ফেলিয়া রাখিতে চায়, তবে অমর কবির অমর ভাষায়, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সে ব্যক্তি এমন একজন—"whose hand like the base Judean threw a pearl away richer than all his tribe"। একজন আধুনিক ইংরেজ সমালোচক যে কথা বলিয়া মিল্টনের মহাকাব্যের আলোচনা শেষ করিয়াছেন, আমিও কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে সেই কথা বলিয়াই মধুসূদনের কাব্য-পরিচয় শেষ করিলাম—

What has made the poem live is not the story—nor the construction—nor the learning—nor the characterisation: not these things, though all are factors in the greatness of the poem—but the incomparaple elevation of the style, 'the shaping spirit of imagination,' and the mere majesty of the music.

দ্বিতীয় খণ্ড

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ

প্রথম অধ্যায়

মধুসূদন ও বাংলা কাব্যের তথা ছন্দের নবরূপ ; প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা ছন্দ ; বাংলা ছন্দের আদি ও মধ্য-রূপ।

মধুসূদনের ছন্দ একহিসাবে যেমন পয়ার, তেমনই আর একদিকে তাহা পয়ার হইতে অতিশয় বিলক্ষণ। এই পয়ার কেমন করিয়া অমিত্রাক্ষরের উপযোগী হইল—ইহার জাতিকুলশীলের মধ্যে এমন কি নিহিত ছিল, যাহার জন্য মধুসূদন ইহাকে এমন কাজে লাগাইতে পারিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন আছে। এই পয়ারের আদি রূপ বাংলা পদ্য-রচনার সঙ্গে সঙ্গেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—ইহার 'পদ-চার' বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক পদ-চারণ। অতএব মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ এই পয়ারকে আশ্রয় করায় খাঁটি বাংলা ছন্দেরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। এই পয়ারকে বাছিয়া লইতে মধুসূদনের কোনরূপ চিন্তা করিতে হয় নাই, ইহা তাঁহার হাতের কাছেই ছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, বাংলা যত বড় কাব্য সকলই এই পয়ার ছন্দে রচিত; প্রাচীন কবিগণ যখনই কোন ঢালাও বর্ণনা, কাহিনী বা পালা-গান রচনা করিতে বসিয়াছেন, তখনই পয়ারের ডাক পড়িয়াছে; আবার যখনই একটু বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে, বা একটু লিরিক ভাবের আমদানি করিতে চাহিয়াছেন, তখনই অন্য ছন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন। আর একটি বড় ইঙ্গিতও তিনি পাইয়াছিলেন, এই পয়ার ছন্দেই সহজ বাচন-ভঙ্গির অবকাশ আছে, বাংলা বাক্যরীতি এই পয়ারের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তথাপি মধুসূদনকে আরও ভিতরে দৃষ্টি করিতে হইয়াছিল; এ দৃষ্টিও তিনি কানের সাহায্যে লাভ করিয়াছিলেন,—পয়ারের অন্তর্নিহিত ছন্দশক্তিকে তিনি যেন এক আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বাংলা অমিত্রাক্ষরের মূল উপাদানগুলিকে, তিনি সেই দৃষ্টির দ্বারা, ঐ পয়ারের মধ্যেই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন; নতুবা, ইংরাজী অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখকের এই উক্তি বাংলার সম্বন্ধেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইত না।—

"And so was the music of the blank verse, or unrhymed five-stress lines of Marlowe and Shakespeare and Milton ; and as we listened, it was easy to believe that 'stiess' and 'quantity' and 'syllable,' all playing together like a chime of bells are concordant and not quarrelsome in the Modern English Verse."

বাংলা পয়ারের ঐতিহাসিক বিকাশধারা একটু লক্ষ্য করিলে, তাহার জাতি-কুলশীলের যে লক্ষণের কথা বলিয়াছি, তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাহাতে দেখা যাইবে, ভাষার সেই আদি রূপ হইতেই তাহার যে ছন্দপ্রবৃত্তি—শেষে যতই তাহার রূপান্তর হউক, ভাষার প্রকৃতি যতই স্বতন্ত্র হইয়া উঠুক—তাহার অঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ ঘোচে নাই; এজন্য—মাত্রা (Quantity), অক্ষর বা বর্ণ (Syllable), এবং শব্দের উচ্চারণ-ঘটিত যে স্বর-বৈষম্য (Stress), এই সকলকেই মিলাইয়া লইয়া, তাহাকে তাহার স্ব-প্রকৃতি ও কুলধর্ম্মের সমন্বয় করিতে হইয়াছে।

অতঃপব, আমি বাংলা পয়ারের সেই ইতিহাসগত প্রবৃত্তির একটু পরিচয় দিব, তাহাতে দেখা যাইবে, বাংলা ভাষাও যেমন ক্রমে একটি বিশিষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে, তেমনই তাহার ছন্দও উত্তরোত্তর স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতেছে। সে আর্টের ক্ষেত্রেও কোন শাস্ত্রশাসন মানিবে না, প্রাচীন ছন্দবিধির বাঁধা রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া সে মাঠেবাটে ঘুরিয়া বেড়াইবে; বীণা ফেলিয়া বাঁশের বাঁশীকে আশ্রয় করিবে। ফলে, প্রায় একই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া, সে তাহার জ্ঞাতি-ভগিনী হিন্দী হইতে এই ছন্দ-পথে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে!

ভারতচন্দ্রের পয়ারকেই যদি পুরানো রীতির শেষ পরিণতি বলিয়া ধরা যায়, এবং তাহার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ এইরূপ হয়—

লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ।
মেনকার কাছে গিয়া কহিছে নারদ॥
শুন ওগো এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও।
কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও॥
মেনকা নারদবাক্যে দুনা মনোদুখে।
পলাইয়া গোবিন্দের পড়িল সম্মুখে॥
দশনে রসনা কাটি গুড়ি গুড়ি যায়।
আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায়॥

তাহা হইলে কে বলিবে যে, এই ছন্দের আদি রূপের সন্ধান মিলিবে নিম্নের এই দুই পংক্তিতে?—

কাআ • তরুবর / পঞ্চ বি • ডাল।
চঞ্চল • চীয়ে / পইঠো • কাল॥ (চর্য্যাপদ)

দেখা যাইতেছে যে, ভঙ্গ-প্রাকৃত অবস্থায় এই আদি বাংলা ভাষার ছন্দে, বংশানুক্রমিক স্বভাব-ধর্ম্মে, সংস্কৃত লঘুগুরু মাত্রার নিয়ম প্রায় সম্পূর্ণ বজায় আছে, এবং

সে কারণে ছন্দস্পন্দ বা Rhythm-সৃষ্টি অতি সহজ হইয়াছে। তথাপি, এখন হইতেই ভাষার উচ্চারণপদ্ধতি ও ছন্দপদ্ধতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়াছে—শব্দকে ছন্দোবদ্ধ করিবার সময়ে অনেক স্থলেই স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ যথানিয়মে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ঐ একই কবিতার আর একটি পংক্তি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে, সেই আদিকালেই এ ভাষার ছন্দে মাত্রাবৃত্তের নিয়মনিষ্ঠা কিরূপ দুরূহ হইয়াছিল—

ভণই লুই আম্হে সানে দিঠা

—এই চরণেরও মাত্রাসংখ্যা ১৬, এবং পদভাগও সমান; কিন্তু ইহাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা কষ্টকর; চার মাত্রার পদচ্ছেদ বজায় রাখিলে পংক্তিটির ছন্দচিত্র এইরূপ দাঁড়ায়—

ভণই / লুই আম্হে / সানে / দিঠা।

তাহাতে দ্বিতীয় পর্ব্বটির মাত্রা বেশি হইয়া পড়ে—ঐ 'লুই'কে বাদ না দিলে ছন্দ রক্ষা হয় না। অতএব পড়িবার সময়ে, নিশ্চয়ই হ্রস্ব-দীর্ঘের নিয়ম রীতিমত ভঙ্গ করিয়া, ভাষার কথ্য-ভঙ্গির হসন্ত, এবং তজ্জনিত ঝোঁক প্রভৃতির সাহায্যে এই গহ্বরটি উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

উপরি-উদ্ধৃত বৌদ্ধ চর্য্যাপদটিই বাংলা ছন্দের আদ্যতম নমুনা কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় না থাকিলেও—ছন্দের প্রকৃতি হইতেই, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিকে ইহার পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইতিমধ্যে বাঙালী কবির কান যে তাহার ভাষার ধ্বনিচ্ছন্দে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেজন্য রীতিমত মাত্রাবৃত্তে পদ্যরচনা করিতে বসিয়াও তাহার নিজের ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ-প্রবৃত্তি যে তাহাকে বার বার নিয়মভ্রষ্ট করে, তাহার প্রমাণ ইহাতে আছে।—

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশঘাণ্ট করহুঁ বিআলী।

পদটি আরম্ভ হইয়াছে এইরূপ বৃত্তগন্ধী মাত্রা-ছন্দে, ইহাতে 'গণ'ভাগের আমেজ পর্য্যন্ত রহিয়াছে! কিন্তু তাহার পরেই—

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥

—পড়িলে সন্দেহ থাকে না, কবির রসাবস্থা যেমন একটু ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে—ভাবের ঘোরে কবি যেই একটু বেসামাল হইয়াছেন, অমনই ছন্দে ও ভাষায়

তাঁহার জাতি-কুল ধরা পড়িয়াছে; এ যেন সেই "শড়া-অদ্ধা"র অবস্থা। এই দ্বিতীয় শ্লোকটির ছন্দ প্রায় সম-চতুর্মাত্রিক; আধুনিক বাংলায় অনুবাদ করিলে, ভাষা বা ছন্দের অল্পই পরিবর্ত্তন হয়, যথা—

জোইনি / তঁই বিনু / খনহিঁ ন / জীবমি।

এবং—

তোমা বিনা / যোগিনী / ক্ষণেক না / বাঁচিব।

জয়দেবের—

চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং

—ঠিক এই চার মাত্রার চাল—কেবল অক্ষরগুলি সমমাত্রার নয়। শেষের পর্ব্বটিকে খণ্ডপর্ব্ব ধরিলে, ভারতচন্দ্রের—

কি বলিলি / মালিনী / ফিরে বল্ / বল্

যে ছন্দ, ঐ প্রাচীন পংক্তিটির ছন্দ তাহার ঠিক এক ধাপ মাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী। যথা,—জোইনি / তঁই বিনু = তোমা বিনা / যোগিনী — কি বলিলি / মালিনী।

এই যে পর্ব্বগুলি, শুধু চার মাত্রা নয়—চারিটি অক্ষরে, সমান মাত্রায়, বিস্তারিত হইতেছে, ইহার কারণ অবশ্য মাত্রার হ্রস্বদীর্ঘ-ভেদের লোপ; অতএব, ছন্দের উপরে ভাষার নিজস্ব ধ্বনি-প্রকৃতির প্রভাব যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্বরের দীর্ঘত্ব ঘুচিলেও প্রত্যেক বর্ণ স্বরান্ত; এজন্য এ ছন্দে মাত্রাধ্বনি অতিশয় স্পষ্ট; এবং ইহার লয় মন্থর নয়, দ্রুত। কিন্তু, আর একটি যে চর্য্যাপদের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে খাঁটি বাংলা পয়ারের ছাঁদটি যেন স্পষ্ট উঁকি দিতেছে—এজন্য এ পদটি যে কালহিসাবে বেশ একটু পরবর্ত্তী, তাহা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যায়।

নগর বারিহিরেঁ ডোম্বি / তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই যাইসো / বাহ্ম নাড়িয়া।

একটু সামান্য ঘষিয়া লইলেই ইহার চেহারা দাঁড়ায় এইরূপ—

নগর বাহিরে ডোম্বি (ডোম্‌নী) / তোমার কুঁড়িয়া
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও যে গো / ব্রাহ্মণ নাড়িয়া॥

দেখা যাইতেছে, এই পংক্তি দুইটিকে খাঁটি পয়ারের ছাঁদে যেমন সহজেই ফেলা যায়, তেমনই একটু সুর করিয়া পড়িলে যেখানে যেমন আবশ্যক অক্ষরের মাত্রা হরণ বা পূরণ করিয়া লওয়া যায়। অতএব খাঁটি বাংলা পয়ারের পূর্ব্বাভাস এইরূপ পংক্তিতে

এখনই দেখা দিয়াছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, খাঁটি মাত্রাবৃত্তের চারি মাত্রার পর্ব্বপ্রবাহে যে দ্রুততর গতি থাকে (যেমন পূর্ব্বোদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে), এখানে তাহা নাই; তাহার কারণ, এখানে মাঝের যতিটি আরও স্পষ্ট—পয়ারের ৮।৬ পদভাগের মধ্যস্থিত যতির মত; অর্থাৎ ছন্দ ক্রমে পর্ব্বভূমক হইতে পদভূমকে পরিণত হইতেছে।

ইহার পর প্রাচীন পয়ারের আর কয়েকটি উদাহরণ দিব, প্রথমটি 'শূন্যপুরাণ' এবং পরেরগুলি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' হইতে।

'শূন্যপুরাণ'—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥

—ইহার প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির সহিত দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির তুলনা করিলে দেখা যাইবে ছন্দ এখনও টলিতেছে, আট ও ছয়ের পদভাগ এখনও স্থির হয় নাই; অথচ, ৮।৬-এর পদভাগ অস্পষ্টও নয়। পয়ারের ক্রমপরিণতির একটা বড় চিহ্ন—মাত্রাবৃত্ত বা বর্ণবৃত্তের মধ্যে দোল খাইয়া শেষে বর্ণবৃত্তে আসিয়া স্থিতিলাভ করা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, এই ষোল মাত্রা যখন চৌদ্দটি সমান মাত্রার অক্ষরে দাঁড়াইল, তখনই বাংলা পয়ার ছন্দের জন্ম হইয়াছে। পয়ারের চরণ-শেষে স্বরের টান থাকিলেও তাহা মাত্রালোপের জন্য নয়। যখন এই চরণ মাত্রাবৃত্ত ছিল, তখন ৮+৮ পদভাগই ছিল; এবং চরণের মাত্রাসংখ্যা কম হইলে অক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া তাহা পূরণ করা যাইত; তাহাতে স্বরের টানের সঙ্গে মাত্রার টানও ছিল। পরে যখন ছন্দ মাত্রাবৃত্তের পরিবর্ত্তে একরূপ বর্ণবৃত্তে পরিণত হইল, তখনও স্বর অবশ্য রহিয়া গেল; কিন্তু তখনকার শেষের পদটি সমান মাত্রার ছয়টি অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়; পয়ারের চরণে ঐ চৌদ্দটি বর্ণের অতিরিক্ত আর কিছু নাই। যতদিন তাহাকে ষোল মাত্রা পূরণ করিতে হইয়াছে, ততদিন তাহার জাতিই ছিল ভিন্ন; ততদিন সে খাঁটি বাংলা পয়াররূপে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। ৮+৮ শেষে ৮+৬ হইয়াছে—পয়ারের জন্মের ইতিহাস তাহাই বটে; কিন্তু ঐ ছয় যে আট নয়, ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য, এবং ইহার জন্যই সে পরে অনেক কাজ করিতে পারিয়াছে।

ইহার পর, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' পয়ার যেরূপে দেখা দিয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে'র পয়ারে যে লক্ষণ দুইটি নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই ; প্রথম, অক্ষরের উচ্চারণে দীর্ঘ-স্বরের প্রয়োজন আর নাই বলিলেই হয় ; যেখানে সেরূপ আছে বলিয়া মনে হয়, সেখানে বস্তুতঃ তাহা দীর্ঘ-স্বর নয়—গানের স্বরের অবকাশ মাত্র। দ্বিতীয়, পদভাগের মধ্যে নানা আয়তনের শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে, ভাষারই প্রয়োজন অনুসারে, চার ছাড়াও, দুই ও তিন মাত্রার পদচ্ছেদ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—অর্থাৎ ছন্দের উপরে ভাষার প্রভাব দেখা যাইতেছে ; ইহারও কারণ ভাষা এতদিনে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দের নমুনা এইরূপ—

নিতম্ব জঘন ঘন পীন তন ভার।
দেহে তুলি দিল বিধি যৌবন তাহার ॥
* *
দধি দুধ ঘৃত ঘোল হাটে না বিকায়।
এবেঁ গোয়ালার গেল জীবন উপায় ॥
* *
সুন্দর কাহ্নাই তোর শুনিয়া যুকতি।
সদয় হৃদয় ভৈল রাধিকা যুবতী ॥

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পয়ারে ৬ + ৮ এবং ৭ + ৭ পদভাগও দেখা দিয়াছে।

কৃত্তিবাস-কাশীদাসের যুগে, পয়ারের আর বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই ; এই যুগে ভাষার উপরে সংস্কৃতের পালিশ আরম্ভ হইয়াছে ; তাহার ফলে, ছন্দের দুইটি দোষ দূর হইয়াছে। প্রথম, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ছন্দেও খাঁটি বাংলা শব্দেরও অন্তবর্ণ স্বরান্ত হওয়ায়, ছন্দ যেমন একটু আড়ষ্ট বোধ হয়, ভাষার শ্রীও তেমনই কতকটা নষ্ট হয় ; এখন ভাষার সাধু রীতির জন্য (আমি প্রচলিত পাঠের কথাই বলিতেছি) বর্ণের স্বরান্ত উচ্চারণ আর তেমন শ্রুতিকটু নয় ; দ্বিতীয়তঃ, যুক্তবর্ণের বহুলতর ব্যবহারে, এবং অনুপ্রাসের গুণে, ছন্দের ধ্বনিঝঙ্কার বাড়িয়াছে। আজিও এমন সকল পংক্তি পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়—

রতন রঙ্গিত তার পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংসগতি যেন, নূপুরের রব ॥
করে শঙ্খ-কঙ্কণ কিঙ্কিণী কটি মাঝে।
রতন নূপুর তার রুনুঝুনু বাজে ॥
পৃষ্ঠে লোটে স্পষ্টরূপে প্রবালের ঝাঁপা।
গৌর গায় গন্ধ করে গন্ধরাজ চাঁপা ॥

ছড়া ছড়া বাজুবন্দ অঙ্গের উপর।
যে অঙ্গে যে শোভা করে পরেছে বিস্তর॥

ভাষার এই রীতিসংস্কারের ফলে, সুর কিছু সংযত এবং পয়ারের দ্বৈমাত্রিক লয় আরও বিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ, পদের শব্দগত অক্ষর-সজ্জা যেমনই হউক, ছন্দের গতিভঙ্গিতে তুই মাত্রার পদক্ষেপ রহিয়াছে। এজন্য ছন্দের গতি যেমন মন্থর, তেমনই পদভাগের যতিও দীর্ঘতর হইয়াছে, এই যতির স্থানে থামিয়া, প্রথম পদের অন্তেও সুরের টান দেওয়া চলে। এইজন্য, পদভাগ যেখানে ৭।৭, যেমন—

করে শঙ্খ কঙ্কণ / কিঙ্কিণী কটিমাঝে

—সেখানে যতি স্থানভ্রষ্ট হওয়ায়, এই সুর বাধা পায় এবং ছন্দে বেশ একটু দোল লাগে।

ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর পয়ার। এই কালে ভাষা আর একটা মোড় ফিরিয়াছে—ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' তাহার প্রমাণ। এতদিনে ভাষার স্টাইলের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, রচনাকার্য্যে শিল্পী-মনোবৃত্তির উন্মেষ হইয়াছে। এখন হইতে কেবল শব্দ-চয়নের সাধু রীতিই নয়, আলঙ্কারিকতার দিকেও বিশেষ মনোযোগ লক্ষিত হয়। আরও এক লক্ষণ এই যে পদমধ্যে শব্দগুলি কেবল ছন্দের ছাঁচে ঢালাই হইতেছে না, পদচ্ছেদগুলি বাঁধা চার মাত্রার দিকে না ঝুঁকিয়া শব্দের আয়তনের উপরেই অধিকতর নির্ভর করিতেছে। ইহার একটি কারণ, শব্দের অন্ত্যবর্ণ হসন্ত হইলে, তাহার স্বরান্ত উচ্চারণ আর গ্রাহ্য হইতেছে না। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে এই সকল লক্ষণই আছে—

পরম পুরুষ বটে পিতামহ মোর।
হরিপদ-নব-বিধু-সুধায় চকোর॥

(দ্বিতীয় চরণ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের রচনা বলিয়া মনে হয়)

*　　　　*

অঙ্গের আভায় ভয় মানিল তিমির

*　　　　*

শোকে-জরা জননী সরণি-মুখ চেয়ে

*　　　　*

কিন্তু এই অসির অসীম গুণ আছে।
শঙ্কায় সবল শত্রু কাছে নাহি আসে॥

এ ভাষাও মার্জ্জিতরুচি শিক্ষিত সাহিত্যিকের ভাষা। "অঙ্গের আভায় ভয় মানিল তিমির" এই উচ্চাঙ্গের কবি-ভাষা, এবং "শোকে-জরা জননী সরণি-মুখ চেয়ে"

—পংক্তিটির ৭।৭ পদভাগ, ও তাহাতে মিলযুক্ত শব্দের অনুপ্রাস—বাংলা কাব্য-কলারও একটি বিশেষ স্তর নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয়, কেবল রচনার এই আলঙ্কারিকতাই নয়, সেই সঙ্গে ঘনরামের ভাষায় খাঁটি বাংলা-বুলির প্রাচুর্য্য। তাঁহার ভাষায় দুই স্তরের শব্দই সমান মর্য্যাদা ও প্রয়োগ-সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ, ভাষার রসবোধ থাকায়, তাঁহার রচনা স্টাইলহীন নয়। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে ভারতচন্দ্রের রচনারীতির পূর্ব্বাভাস আছে—

সমাপন রন্ধন যখন হইল মা।
বাবা কন গোঁসাই ভোজনে তোল গা॥
* *
ভ্রাতার বচনবাণে বিদরিছে বুক।
খেতে শুতে বসিতে উঠিতে নাই সুখ॥
* *
মোরে আঁটকুড়া বলে তোরে বলে বন্ধ্যা।
পাপ ঘাড়ে বদন দেখিলে তিন সন্ধ্যা॥

এই পংক্তিগুলিতে পয়ারের শেষ পরিণতির আভাসও পাওয়া যায়। ইহাতে নিয়মিত চার মাত্রার পদচ্ছেদ আর নাই, কারণ, পদের মধ্যে শব্দগুলি একটু পৃথক আসন দাবি করিতেছে, যথা—

খেতে, শুতে, বসিতে / উঠিতে, নাই সুখ

তেমনই, ছন্দমধ্যে বর্ণের হসন্ত-উচ্চারণ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এ ভাষায় বাংলা শব্দগুলি আর কেবল শব্দমাত্র নয়—সেগুলি খাঁটি বাংলা 'বুলি' হিসাবেই বিশেষ অর্থ ও বিশেষ রসের দ্যোতনা করিবার জন্য কবিকর্তৃক সজ্ঞানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবি যে 'হসন্ত'কে ভয় করেন না, তাহার প্রমাণ, তিনি উপায় থাকিতেও 'কন'-এর হসন্তবর্ণ বজায় রাখিয়াছেন। আসল কথা, বাংলা ভাষা এতদিনে সাবালক হইয়া বাঙালী কবির নিকটে সকল বিষয়ে পূরা অধিকার দাবি করিতেছে।

এইবার ভারতচন্দ্রের পয়ারের কথা বলিব। আমরা এতদূর পর্য্যন্ত পয়ার ছন্দের যে বিকাশধারা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতির সঙ্গে ছন্দের পূর্ণ সাযুজ্য ঘটে নাই, অর্থাৎ কাব্যচ্ছন্দের সঙ্গে ভাষার উচ্চারণপদ্ধতির যে সম্পর্ক না থাকিলে, ছন্দ একটা কৃত্রিম বস্তু হইয়া দাঁড়ায়—সেই সম্পর্ক সহজ হইয়া উঠে

নাই। ছন্দ যে একটা বাহির হইতে গড়া যন্ত্রবিশেষ নয়—যাহার ছাঁচে বাক্যকে ফেলিয়া একটা বাজনা বাজাইলেই হইল—ইহা আমরা এখন যেমন বুঝি (ছন্দ-শাস্ত্রীরা এখনও বুঝেন না), পূর্ব্বে, কাব্যে সেই অলঙ্কারপ্রিয়তার যুগে, কেহ তেমন বুঝিত না। আদি বাংলার সেই প্রাকৃত-গোত্র হইতে যে ছন্দের উদ্ভব হইয়াছিল—ভাষার রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও যে রূপান্তর হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছন্দের প্রয়োজন, ভাষার প্রয়োজন অপেক্ষা বড় হইয়া থাকায়, সেই আদি ছন্দের ভূত নূতন ভাষার স্কন্ধ হইতে নামে নাই; ভাষার প্রকৃতি যেমন হউক, স্বাভাবিক উচ্চারণ যেমন হউক—বর্ণের হসন্ত উচ্চারণ নিষিদ্ধ ছিল; কারণ, তাহা হইলে, ছন্দের নিয়ম ভালমত রক্ষা হয় না। ইহারই জন্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র অমন চমৎকার দেশী শব্দগুলি ছন্দের চাপে জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। কবিতা-পাঠ যেমন ছন্দের অনুযায়ী হইয়া থাকে, তেমনই ছন্দও পাঠভঙ্গির দ্বারাই স্পন্দিত বা তরঙ্গিত হয়, এবং তাহাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রুতিমাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে। ভাষা ও ছন্দ—দুইই ভাবের যথার্থ প্রকাশে সাহায্য করে; ভাষার প্রত্যেক বর্ণ তাহাদের বিশিষ্ট ধ্বনিসঙ্কেতে ভাবের কণ্ঠস্বরাশ্রিত রূপকে আমাদের শ্রুতিগোচর করে; এবং ছন্দ সেই ধ্বনির প্রবাহকে একটি সুবলয়িত সুষমা দান করে। কিন্তু ছন্দ যদি একটা পৃথক বাদ্যধ্বনি হইয়া, ভাষা, এবং—ভাষা যাহার রূপ সেই ভাবকে, একটা কৃত্রিম সুরযুক্ত করে, শব্দের কণ্ঠস্বরজাত কোন ধ্বনিবৈচিত্র্য তাহাতে ফুটিয়া উঠিতে না পায়, তবে কাব্যও যেমন রসোজ্জ্বল হয় না, ছন্দও তেমনই একটা শৃঙ্খল হইয়া দাঁড়ায়। ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির সঙ্গে ছন্দের অন্তরঙ্গতা না থাকিলে এমনই ঘটিয়া থাকে। এইজন্য বাংলা পয়ার শেষে সর্ব্ববিধ শিল্পগুণ হারাইয়া একটা রচনারীতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ভাব যেমন হউক, ভাষা যেমন হউক—বিষয়বস্তু যতই কবিত্ববর্জ্জিত হউক—এই পয়ার হইয়াছিল তাহাকে কোন রকমে লিপিবদ্ধ করিবার একটা ঠাট মাত্র; বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাক্যের পংক্তিগত মিল বা যতি-তালের দূরতম সম্পর্কও নাই, তথাপি ছন্দের ঐ কাঠামোটার বড় প্রয়োজন,—শব্দগুলাকে একটু সাজাইয়া দিবার উহাই একমাত্র উপায়, একটু সুর করিয়া পড়িবার মত হইলেই হইল।

ভারতচন্দ্রের ভাষার পরিচয় দিয়াছি; এই ভাষা যাঁহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য

—এই ভাষার রস যাহাকে রক্ষা করিতেই হইবে, তাঁহার হাতে ছন্দ এই ভাষার ধ্বনিধর্ম্মকে অস্বীকার করিতে পারিল না—

শুনিলি, বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল ?
আমি যদি কই, তবে হবে গণ্ডগোল !

কিংবা—

পরিচয় না দিলে, করিতে নারি, পার।
ভয় করি, কি জানি, কে দেবে ফেরফার ॥

এখানে পয়ারের বাঁধা-চালের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই, ছন্দের তলে তলে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিমা পর্য্যন্ত ফুটিয়া উঠিতেছে! ভারতচন্দ্রের ছন্দে, যথাস্থানে বর্ণের হসন্ত উচ্চারণ না মানিয়া উপায় নাই; এতদিনে ভাষার চাপে ছন্দ দোরস্ত হইয়া আসিয়াছে। স্বর এখনও আছে, কিন্তু তাহা ছন্দকে একটু দোল দেওয়ার মত, যেমন—

অন্নপূর্ণা উতরিলা—আ / গাঙ্গিণীর তীরে—এ

আমি স্বরের স্থানে কেবল চিহ্নস্বরূপ—'আ' এবং 'এ' বসাইয়াছি; এই স্বর দুইটি যতি-স্থানেই আছে—প্রথমটিতে একটু কম, দ্বিতীয়টিতে একটু বেশি; ভারতচন্দ্রের ভাষায় ইহার অধিক স্বরের অবকাশ নাই। এই স্বর ঈশ্বরগুপ্তের যুগে শিক্ষিত সমাজের কাব্যরচনায় আর ছিল না। ঈশ্বর গুপ্ত যমক-অনুপ্রাসের সম্মার্জ্জনী-প্রয়োগে এই স্বরকে কাব্য-ছাড়া করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত 'রোজ্' ফোটে ॥

* * *

আনা দরে আনা যায় কত আনারস।
অনায়াসে করি রসে ত্রিভুবন বশ ॥

অতএব, ভারতচন্দ্রের পয়ারকে—কেবল বাংলা-বুলির প্রাধান্য নয়, কথ্যভাষার বাচন-ভঙ্গিও, চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে; প্রত্যেক বাক্যে, ভাব ও অর্থের অন্বয়-রীতিকে আশ্রয় করিয়া শব্দগুলি স্ব স্ব মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে—ছন্দের মধ্যে কণ্ঠের স্বাভাবিক স্বরভঙ্গিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর পয়ারের পূর্ব্বাবস্থা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা পয়ার ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

সেকালের বাঙালী-সন্তান বলিয়া মধুসূদনের একটা সুবিধা হইয়াছিল—তিনি কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতির কাব্য বাল্যকালেই পড়িয়াছিলেন, এবং সেজন্য খাঁটি বাংলাও যেমন আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তেমনই তাহার ছন্দেও তাঁহার কান অভ্যস্ত ছিল। ইহার পর, ভারতচন্দ্রের কাব্যে সেই বাংলা ভাষা ও ছন্দের যতখানি শিল্পোৎকর্ষ হইয়াছিল, তাহা তিনি নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কার্য্যতঃ তিনি তৎকাল-প্রচলিত কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কাব্য হইতেই তাঁহার ছন্দের চরণ আহরণ করিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্র হইতে তিনি, ছন্দের মধ্যে বাংলা বাক্‌ভঙ্গির সমাবেশ সম্বন্ধে, বিশেষ ইঙ্গিতও পাইয়াছিলেন। চৌদ্দ অক্ষরের ওই চরণ, এবং ভাষার কথঞ্চিৎ মার্জ্জিত সাধুরীতি, এবং ছন্দের মধ্যে বাক্‌ভঙ্গির কিছু কিছু ইঙ্গিত—ইহার বেশি কিছু তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের নিকট হইতে পান নাই, এবং ইহাই সম্বল করিয়া তিনি বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে—'যে খেলিতে জানে সে কানাকড়িতেও খেলে', মধুসূদনকেও প্রায় সেইরূপ খেলিতে হইয়াছিল; তফাৎ এই যে, তিনি এই কানাকড়ির মধ্যেই স্বর্ণদ্যুতি দেখিতে পাইয়াছিলেন—যাহা সেকালে আর কেহ দেখিতে পায় নাই। মধুসূদন নিজে তাঁহার এই ছন্দের নির্ম্মাণকৌশল সম্বন্ধে বেশি কিছু বলেন নাই—যেখানে যেটুকু উল্লেখ করিয়াছেন, পরে তাহা বলিতেছি। তিনি যে মিল্‌টনের ছন্দের আদর্শেই এই বাংলা ছন্দ গড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? মিল্‌টনের পূর্ব্বে যেমন Marlowe, Shakespeare,—বাঙালী-কবির গুরুও তেমনই মিল্‌টন! বাংলা ছন্দের আদর্শ সন্ধান করিতে হইবে ইংরেজী কাব্যে! এমন কথা কে কবে শুনিয়াছে!

মিল্‌টনের সেই 'five-stress line'-এর মাপে বাংলা পয়ারের মাপ যে অনেকটা মেলে, তাহা বুঝি, কিন্তু তাহার সেই 'five-stress', আর এই একটানা সুরের এক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছন্দ—ইহাদের মধ্যে মিল কোথায়? তবু মধুসূদন তাহাতে হটিলেন না; তিনি নাকি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন—বাংলার পশ্চাতে তাহার জননী (বা মাতামহী) রূপে দাঁড়াইয়া

আছে সংস্কৃত; অতএব ফরাসী ভাষার মত ভাষাতেও যাহা সম্ভব হয় নাই, বাংলায় সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনায়াসে সম্ভব হইবে। ইহাতে, না হয় ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার—সুন্দর ও সুগম্ভীর শব্দরাজি আহরণ করিবার উপায় হইতে পারে; কিন্তু ইংরেজী 'five-stress line'-এর সেই rhythm কেমন করিয়া আমদানি করা যাইবে?

বাংলা ছন্দের ওই মাপটি বড়ই সুবিধাজনক হইয়াছিল এবং সম্ভবত এই মাপটিই তাঁহার সবচেয়ে বড় ভরসার কারণ হইয়াছিল। ইংরেজী blank verse-এর চরণে যে দশটি অক্ষর (syllable) আছে, তাহা বাংলা বর্ণমাত্রিক অক্ষর নয়, তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে যে একটি করিয়া হসন্ত বর্ণ থাকে, তাহার জন্য, কালের হিসাবে সে চরণের মাপ আমাদের পয়ারের মাপ অপেক্ষা বরং একটু বেশিই হইবে। অতএব এই মাপটি বড়ই ভাল পাওয়া গিয়াছিল। আমার মনে হয়, ঠিক ঐ চৌদ্দ অক্ষরের ছন্দ তৈয়ারি না থাকিলে, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ-রচনা সম্ভব হইত না। বাংলায় যে এই ছন্দ সম্ভব হইয়াছে, তাহার কারণ—ভাষার প্রকৃতিবশে পয়ার ক্রমে সেই ১৬ মাত্রার সকল উপসর্গ দূর করিয়া খাঁটি চৌদ্দবর্ণের চরণে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। এই চরণকে লইয়া মধুসূদন তাহার ছন্দকে তরঙ্গিত, এবং সেই তরঙ্গিত ছন্দপ্রবাহকে কূলপ্লাবী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ওই মাপ একটা বড় কথা; চৌদ্দ অক্ষরের তটসীমা লঙ্ঘন করিয়া যে স্রোত প্রবাহিয়া চলিয়াছে, তাহা ওই Rhythm বা তরঙ্গেরই স্রোতোবেগ। ছন্দ সেই তটবন্ধন স্বীকার করিয়াই এমন মুক্তগতি লাভ করে। ইহাই এ ছন্দের সবচেয়ে বড় রহস্য। ঐ মাপ যদি ঠিক না থাকে তবে, এ ছন্দের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়; তখন তাহা গদ্য, কিংবা অন্য কোন ছন্দ হইয়া দাঁড়ায়। মধুসূদন এসব কিছুই বলিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই, তিনি কেবল মিল্‌টনের ছন্দ পড়িতে বলিয়াছেন, এবং এ ছন্দও পড়িবার সময়ে সেইমত কেবল যতিগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, তাহা হইলেই আর সব ঠিক হইয়া যাইবে। তিনি যদি জানিতেন যে, একদিন তাঁহার এই ছন্দের নামকরণ হইবে "অমিতাক্ষর", তাহা হইলে বোধ হয় শিহরিয়া উঠিতেন। অথবা তাঁহার ছন্দ লইয়া এতবড় পাণ্ডিত্য যে কেহ করিবে, তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই, তাই এ বিষয়ে দেশবাসীর মাথা ঘামাইতে চান নাই, কেবল যাহাতে তাহারা একটু তাল-মান রাখিয়া পড়িতে পারে তাহারই জন্য চিন্তিত হইয়াছিলেন মাত্র। মধুসূদনের ছন্দে যতির স্থান নির্দ্দিষ্ট নয় বলিয়া, তাঁহার

ছন্দ 'অমিতাক্ষর'! অর্থাৎ তাহার অক্ষর-সংখ্যাও ঠিক নাই—সে চরণ মাপহীন! কোন ছন্দ যে অমিতাক্ষর হওয়া সত্ত্বেও গদ্য না হইয়া পদ্য হইতে পারে, এমন সিদ্ধান্ত মৌলিক বটে! কিন্তু কিছু বলিবার যো নাই, যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের বৈদিক শ্রাদ্ধ-হোম করিতে সুরু করিয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঋত্বিকগণেরই একজন এই অমূল্য তত্ত্বটি উদ্ধার করিয়াছেন। মিল্‌টনের ছন্দকে কেহ এখনও 'অমিতাক্ষর' বলিতে সাহস পায় নাই, তাহার কারণ বোধ হয়, সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও মিল্‌টনের কাব্য পাঠ্য হয় নাই। এই নামকরণের পক্ষে, সেই দুর্দ্দান্ত ছন্দপণ্ডিত যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা হইতে কেবল ইহাই বোধগম্য হয় যে, মধুসূদন তো কেবল ছন্দটাই সৃষ্টি করিযাছিলেন, কিন্তু ছন্দের যে নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই ছন্দোহীন, অর্থাৎ বেশ মোলায়েম নয়; অতএব, ঐ নামটা আর একটু 'তানপ্রধান' করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এ ছন্দে যতির কাজ যে স্বতন্ত্র, তাহার সঙ্গে চরণের অক্ষর-সংখ্যার যে কোন বিরোধ নাই, এবং যে কোন যতিস্থান পর্য্যন্ত পদচ্ছেদের মাত্রাসংখ্যা যেমনই হোক, মিল্‌টনের Iambic Pentameter বা five-stress line-এর মত এই ছন্দও যে মূলে পয়ারের ৮ + ৬ প্রকৃতিসম্পন্ন, এবং ওই চৌদ্দ মাত্রার মাপটিই যে উহার প্রাণ—ইহা যে না বুঝিয়াছে, সে কেন হেমচন্দ্র পর্য্যন্ত দৌড় দিয়াই ক্ষান্ত হইল না? মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দে যতির কাজ কি তাহা পরে বলিব; কিন্তু যাহার চরণগুলির ওই ৮ + ৬, এবং ১৪—Law of Gravitation-এর মতই একটা দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম, তাহাকেও 'অমিতাক্ষর' নাম দিতে বাধিল না! ইংরেজী 'blank-verse'-এব 'blank'-এর অর্থ কি? মধুসূদন তাহার যে বাংলা করিয়াছেন, তাহা কি তদপেক্ষা সার্থক হয় নাই? যে ছন্দতত্ত্ব অনুসারে ইহারও ভুল সংশোধন করিতে হয়, তাহাকেই ধিক!

তৃতীয় অধ্যায়

অমিত্রাক্ষর ছন্দের গঠন ও তাহার উপাদান, মধুসূদনের প্রথম প্রয়াস।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের চরণ কোনখানেই 'অমিতাক্ষর' নয়; অমিতাক্ষর হইলে, উহার ওই পয়ারের কাঠামোটার কোন প্রয়োজন হইত না। এই ১৪ অক্ষরের মাপটিই বাংলা অমিত্রাক্ষরকে যেমন সম্ভব করিয়াছে, তেমনই ওই পদভাগও (৮+৬) অনাবশ্যক হইয়া যায় নাই। চরণের ওই পদক্ষেপ—উহার অবয়বের ওই অঙ্গসন্ধিই—এ ছন্দের স্বাধীন গতিভঙ্গির একটা বড় সহায়; কারণ freedom-এর সঙ্গে ওই 'form' আছে বলিয়াই, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এমন মহিমা লাভ করিয়াছে। নূতনতর যতিবিন্যাস ইহার সঙ্গীতকে যেমন বৃহত্তর সঙ্গতি (larger harmony) দান করিয়াছে, তেমনই ওই ৮+৬-এর যতি-দুইটি ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিয়াছে। চরণমধ্যে বা চরণান্তরে ভাব-অর্থের স্বচ্ছন্দ গতিবেগ যেখানে আসিয়া যেমনই বিরাম লাভ করুক, ওই যতি দুইটি কখনও মুছিয়া যায় না। ইহাকেই আমি এ ছন্দের 'Law of Gravitation' বলিয়াছি। ওই মাপ এবং ওই যতি যদি ঠিক না থাকে, তবে ছন্দহিসাবে অমিত্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্যই লোপ পায়—গিরিশঘোষের মিলহীন doggerel তাহার দৃষ্টান্ত। এ জ্ঞান যে কাহারও নাই, তাহার প্রমাণ—একালের মহা মহা ছন্দ-ধুরন্ধরগণ, গিরিশঘোষের ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের ধাবমান (run on) পয়ার, এবং 'বলাকা'র ছন্দ, এই সকলকেই অমিত্রাক্ষরের সমধর্ম্মী মনে করিয়া তুলনায় তাহাদের তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এ জ্ঞান এখনও হইল না যে, এই অমিত্রাক্ষর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু—ইহার আত্মাই স্বতন্ত্র। আর সকল ছন্দই গীতিচ্ছন্দ; কেবল ওই একটি ছন্দ তাহা নহে। অমিত্রাক্ষরেরও একটা লিরিক রূপ আছে; উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবিগণের মত আমাদের রবীন্দ্রনাথও তাহার যথেষ্ট চর্চ্চা করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর লিরিক তো নহেই, এমন কি, উহা নাটক-গোত্রীয়-ও নয়—খাঁটি এপিকের অমিত্রাক্ষর; অর্থাৎ, উহা একেবারে নিকষ-কুলীন,—কিন্তু আমাদের দেশের নেড়ানেড়ীর দল তাহা কিছুতেই বুঝিবে না! চৌদ্দ অক্ষরের কম বা বেশি হইলে উহার জাত থাকে না; হয় কোমরে হাত দিয়া নাচিতে থাকে, বা কাঠি বাজায়; নয় তো স্বর-মূর্চ্ছনায় ঢলিয়া পড়ে। এইজন্যই ওই চৌদ্দ

অক্ষরের মাপটি এত মূল্যবান। ওই মাপের ওই চরণ, বাংলা কবিতায় দীর্ঘকাল কর্ষণের ফলে, শেষে স্বাভাবিক বাক্‌ছন্দের অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই, বাংলা কাব্যে ছন্দের এই সিংহাসন-রচনা আদৌ সম্ভব হইয়াছিল।

চৌদ্দ অক্ষরের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে মিলের কথা বলিব। সকল নামের মত 'অমিত্রাক্ষর' নামটিও এই ছন্দের একটি উপাধিমাত্র—চূড়ান্ত পরিচয় নয়। সেকালের—হেম, নবীন প্রভৃতি কবিগণ, উহার ওই মিলহীনতাকেই আসল লক্ষণ মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু বাংলা ছন্দের পক্ষে মিলহীন হওয়া যে কত দুরূহ—মিলের ঘুঙুর কাড়িয়া লইলে, তাহার পরিবর্ত্তে কোন্ দুর্লভতর ভূষায় ইহাকে ভূষিত করা প্রয়োজন, সে ধারণা তাঁহাদের ছিল না। আরও ঠিক করিয়া বলিতে হইলে, মিলের অভাব-পূরণ নয়—যেন সে ভাবনাই নয়,—মিলকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ অনাবশ্যক করিয়া তোলাই এ ছন্দের গৌরব। এইজন্যই স্বচ্ছন্দ যতি, বা অনিয়মিত পদবিন্যাস সত্ত্বেও, যে-ছন্দে মিলের লেশমাত্র প্রয়োজনীতা আছে, সে ছন্দ অমিত্রাক্ষরের হাজার মাইলের মধ্যেও আসিতে পারে না,—তুলনীয় হওয়া তো পরের কথা! ঠিক সেই কারণেই, আজকাল যে সব মিলহীন কবিতা রচিত হইয়া থাকে, তাহাদের সহিতও অমিত্রাক্ষরের দূরতম সম্পর্ক নাই—যেমন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার মিলহীন ছন্দ অমিত্রাক্ষর ছন্দ নয়; সে সকল ছন্দও গীতিছন্দ।

অতএব, আমরা এ পর্য্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের তিনটি বাহ্য লক্ষণ পাইতেছি;—(১) চরণ হিসাবে উহা সেই পুরাতন পয়ার; (২) উহাতে মিল নাই; এবং (৩) ৮+৬-এর সেই যতি ছাড়াও, ইহার নিজস্ব একপ্রকার যতি আছে। কিন্তু এহ বাহ্য; বাংলা ছন্দহিসাবে (ইংরেজী ছন্দে সে প্রশ্নই উঠে না) ইহার প্রথম বা প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য—ইহার Rhythm বা ছন্দস্পন্দ। এই Rhythm-সৃষ্টি মধুসূদন যে উপায়ে করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ আলোচনা পরে করিব; এখন কেবল ইহাই বলিয়া রাখি যে, এই সমস্যা মধুসূদনকে কখনও উদ্বিগ্ন করে নাই; ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! প্রথম হইতেই, মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল—ওই নূতন যতি-বিন্যাস বা ছন্দের গতি-স্বাচ্ছন্দ্যের উপরে। অতএব মনে হয়, Rhythm এবং যতি—অমিত্রাক্ষরের এই দুই প্রধান উপকরণের একটির সম্বন্ধে তিনি যেমন সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন, অপরটির (Rhythm) সম্বন্ধে তাঁহার কানই সজাগ ছিল, তাঁহাকে সজাগ থাকিতে হয় নাই; একটিকে নানা রকমে সাজাইয়া বার বার পড়িয়া কানের সম্মতি লাভ করিতে হইয়াছে, অপরটিকে, শব্দের ধ্বনিতরঙ্গে—কান আপনিই ঠিক

করিয়া লইয়াছে। নতুবা মধুসূদন তাঁহার নূতন ছন্দ সম্বন্ধে পাঠকগণকে (বন্ধুর মারফৎ) কেবল এই কয়টি কথা বলিতেন না—

> "So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse, that I have been obliged to think on the subject [ইহার পূর্ব্বে একবারও আবশ্যক হয় নাই!] and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 10th, 11th and 12th."

ইহাতেও দেখা যায় যে, তখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার অবকাশ বা প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই, এবং এক্ষণে ইহাই হইল তাঁহার বিশেষ চিন্তার ফল! ইহার পূর্ব্বে আর একবার তিনি এইমাত্র বলিয়াছিলেন—

> "If your friends know English, let them read the Paradise Lost, and they will find, how the verse in which the Bengali poetaster writes is constructed. Let your friends guide their voices by the pause (as in the English blank verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the language,"

—এই উক্তিটিতেই বরং—যতই অসম্পূর্ণ হউক—মধুসূদন তাঁহার ছন্দনির্ম্মাণ-কৌশলের একটা বড় সন্ধান দিয়াছেন; সেই সন্ধান অনুসারেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। মিল্‌টনের ছন্দের যতিবিন্যাস-পদ্ধতির কথাটাই কবি এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলেও, আসলে ইহার মধ্যে সব কথাই আছে; তিনি যে, কেবল যতিই নয়, ছন্দস্পন্দের সর্ব্ববিধ কৌশল উহা হইতেই আদায় করিয়াছিলেন, পরে আমি তাহাও দেখাইব। কিন্তু কবির সে বিষয়ে কোন সজ্ঞান চিন্তাই নাই—এমন একটা সম্পূর্ণ বিজাতীয় ভাষার ছন্দ-কৌশল বাংলা ভাষার উপযোগী হইল কি করিয়া, তাহার কোনও কৈফিয়ৎই নাই; এ যেন—"Let there be light, and there was light!" তথাপি, উপায় নাই, যেমন করিয়াই হউক—এ রহস্যের সমাধান আমাদিগকেই করিতে হইবে।

ইংরেজী ছন্দ পয়ারের মত পদভূমক নয়—পর্ব্বভূমক; তাহার চরণে যতি পড়ে foot বা পর্ব্বের পরে—পদচ্ছেদের পরে নয়। মধুসূদনের ছন্দে পদভাগেরও পদচ্ছেদ আছে, এই পদচ্ছেদের পরেই যতির স্থান হইয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া পদচ্ছেদগুলিই এক একটি 'foot' নয়। এসব বিচার তিনি করেন নাই। কাজ কি ওসব ব্যাকরণ-সমস্যার মধ্যে গিয়া? ছন্দটি কানে বেশ লাগিতেছে তো? ব্যস্, আর কি চাই? বাংলা পয়ারে ওই সকল হাঙ্গামা সত্যই নাই। পদ বা

metrical section আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে নিয়মিত পদচ্ছেদ বা পর্ব্ব নাই; প্রাচীন পয়ার একেবারে নিছক বর্ণবৃত্ত ছন্দই বটে, তাহাতে বর্ণগত কালাংশ (unit), এবং তাহারই মাপে প্রত্যেক শব্দের, তথা পদসমষ্টির কালপরিমাণই ছন্দের ছন্দত্ব বজায় রাখে। ইহাতে যেমন সংস্কৃত গণবৃত্তের মত কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণসজ্জা নাই, তেমনই হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বর-পরম্পরার ছন্দস্পন্দও নাই। মিল্‌টনের ছন্দে পদচ্ছেদের স্থানে foot আছে, এবং প্রধানত, অক্ষর-বিশেষের গুরু উচ্চারণে ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হয়। মধুসূদনের এসব বিচার করিবার প্রবৃত্তিও ছিল না, অবকাশও ছিল না; ছিল না বলিয়াই, তিনি যাহা অভাবনীয় তাহাকেও সম্ভব করিতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদন মিল্‌টনের ছন্দকে, ইংরেজী ছন্দসূত্রের সাহায্যে, কখনও বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই—তাই, ওই ছন্দের ধ্বনি-সঙ্গীত উপভোগ করিবার কালে, তাঁহার কান কিছুক্ষণের জন্যও ইংরেজী বাক্যরীতি বা বাক্যার্থ, এমন কি, শব্দের অন্বয় পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া, কেবল ধ্বনিটিকে মাত্র গ্রাহ্য করিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার অবকাশ পরে ঘটিবে, এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু বলিব; ইংরেজী অমিত্রাক্ষর বাংলা ছন্দে ছন্দান্তরিত হইল কোন্ মন্ত্রে, এখানে তাহার একটু আভাস দিব;

বাংলা অমিত্রাক্ষরের ভিত্তি যেমন পয়ার, তেমনই মিল্‌টনের ছন্দের ভিত্তিও —ইংরেজী পয়ার—Heroic Verse বা Iambic Pentameter। মিল্‌টন ইহাকেই অবলম্বন করিয়া, এবং ইহাকে যতদূর সম্ভব শিথিল করিয়া, তাঁহার অমিত্রাক্ষর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের কানে এই ইংরেজী পয়ারের ধ্বনি কি ভাবে ধরা দেওয়া সম্ভব, তাহা দেখাইবার জন্য, আমি, একেবারে মিল্‌টনের ছন্দে না গিয়া, একটি খাঁটি Heroic Verse-এর চরণ লইব, যথা—

The curfew tolls the knell of parting day

এই চরণটির ছন্দ-ব্যাকরণ এইরূপ—

The cúr—few tólls— / the knéll—of pár—ting dáy

মিল্‌টনের ছন্দ যাহার পড়া অভ্যাস হইয়াছে তাহার কানে, এই পংক্তিটির ছন্দধ্বনি অনায়াসে এইরূপ শুনিতে হইবে—

The cu″rfew—to′lls / the kne″ll—of pa″rting da′y

—অর্থাৎ, পদভাগ ঠিক রহিল, কেবল পর্ব্ব বা foot-এর পরিবর্ত্তে ওই পদভাগের মধ্যে বিভিন্ন আয়তনের পদচ্ছেদ মাত্র দেখা দিল। এখানে মাত্র চারিটি পদচ্ছেদ

আছে (অন্যত্র বেশি থাকিতে পারে), এবং তিনটি বড় stress আছে। ইংরেজী ছন্দের এইরূপ শ্রুতি-গুণ নির্ণয় করিয়া, এবং কানে কেবল তাহাই রক্ষা করিয়া, বাংলায় তাহার অনুরূপ ধ্বনিসৃষ্টি করা যে দুরূহ নয়, তাহা আমরা পরে দেখিব। ইহাতে যেমন পর্ব্বের গোলযোগ আর থাকে না, তেমনই ছন্দস্পন্দ-রীতিরও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। বাংলা ছন্দস্পন্দ বা Rhythm-এর কথাও পরে বলিব। তৎপূর্ব্বে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-রচনার প্রয়াসের একটু ইতিহাস দিব।

মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম তাঁহার 'পদ্মাবতী' নাটকের জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে কতকগুলি পংক্তি রচনা করিয়াছিলেন। সেই নাটকে এই পংক্তিগুলি আছে—

জন্ম মম দেবকুলে ;—অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর মন্থনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর, পরদুঃখে সদা আমি সুখী।

এখানে কবির একমাত্র লক্ষ্য—ভাষায় কথ্যভঙ্গিকে, এবং ছন্দে বাক্যরীতিকে প্রাধান্য দিয়া তদনুযায়ী যতিস্থাপন। কিন্তু এই প্রথম প্রয়াস প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে; মিলের পরিবর্ত্তে ছন্দস্পন্দ নাই—সেজন্য নূতনতর যতিবিন্যাসের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। রচনা প্রায় গদ্য হইয়া উঠিয়াছে—ওই 'জন্মিয়াছিল' ক্রিয়াপদটি সে পক্ষে কম বিপদজনক হয় নাই।

ইহার পর, 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র এই পংক্তিগুলিতে মধুসূদনের ছন্দ-সাধনা আর এক স্তরে উঠিয়াছে। যথা—

আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগনমণ্ডল
উজলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
ঠেলি' ফেলি' দুই পাশে তিমির তরঙ্গে
উঠিলা অম্বর পথে ; কিংবা ত্বিষাম্পতি
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্ররথে
উদয় অচলে আসি দরশন দিলা !

* * *

এ সুন্দর প্রভাকর-পরিধি মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই ?
কেমনে, কহ, মা শ্বেতকমলবাসিনী !
কেমনে মানব আমি চাব ওর পানে ?
রবিচ্ছবি পানে, দেবি ! কে পারে চাহিতে?
এ দুর্ব্বল দাসে কর তব বলে বলী।

—এখানে তেমন ছন্দস্পন্দ, অথবা পদমধ্যস্থ বিরাম-যতির কৌশল না থাকিলেও, মিলের অভাব আর একটা বস্তুর দ্বারা পূরণ হইয়াছে; নিপুণ শব্দযোজনার জন্য পংক্তিগুলির সুরঝঙ্কারে একটি সুললিত কাব্যচ্ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে; অর্থাৎ, ইহাই বাংলা কবিতার প্রথম Lyrical Blank Verse; এখানে speech-rhythm-এর পন্থাত্যাগ করিয়াই কবি কতকটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন। উপরি-উদ্ধৃত পংক্তি-গুলিতে ইহাই প্রমাণ হইল যে, মিল ত্যাগ করিয়াও বাংলায় ছন্দ-সঙ্গীত সম্ভব। কিন্তু এ অমিত্রাক্ষর Epic নয়—Lyric-এর উপযোগী; ইহাতে ভাবের সুরই আছে —প্রাণের সর্ব্ববিধ অনুভূতি ও আকূতির বিচিত্র কণ্ঠস্বর-সঙ্গীত নাই। তথাপি, ইহাই প্রথম খাঁটি মিলহীন বাংলা কাব্যচ্ছন্দ—ইহাতেই কবি-মধুসূদনের জন্ম হইল। আজ এতকাল পরেও, যখন এইরূপ পংক্তিপর্ব্ব পাঠ করি, এবং ইহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা ছন্দের তুলনা করি, তখন বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া পারি না। এই Lyric Blank Verse-ই পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে অপূর্ব্ব গীতিঝঙ্কার লাভ করিয়াছে। তথাপি, ইহার ছন্দগতিতে যে যতি-সংযম আছে—ইহার সুপরিমিত পদক্ষেপে যে একটি ধীর মাধুর্য্য আছে, রবীন্দ্রনাথের ছন্দে তাহা নাই; তাহার কারণ, দুই কবির প্রকৃতিই স্বতন্ত্র,—একজনের প্রকৃতি ক্লাসিকাল, অপরের রোমান্টিক।

কিন্তু মধুসূদন শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, গীতিসুরপ্রধান অমিত্রাক্ষর তাঁহার কাম্য নহে। 'তিলোত্তমা' তাঁহার প্রথম কাব্য, এখানে তিনি নিছক কাব্যপ্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া, ছন্দের মত, কল্পনারও একটা মুক্তিসুখ আস্বাদন করিতেই ব্যাকুল। ছন্দকে এই পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া তিনি সহসা মহাকাব্য-রচনার প্রবল প্রেরণা অনুভব করিলেন—দুঃসাহস বাড়িয়া গেল। কিন্তু পুরানো পয়ারের সেই লিরিক প্রবৃত্তিকে এরূপ প্রশ্রয় দিয়া মহাকাব্যের ছন্দসৃষ্টি করা যাইবে না—তাই তিনি মিল্‌টনের ছন্দধ্বনি বাংলায় প্রতিধ্বনিত করিবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিলেন। আমি পূর্ব্বে ইংরেজী ছন্দটিকে বাংলায় ধরিবার একটা সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিয়াছি—একটা স্থূল সাদৃশ্য-বোধ যে সম্ভব, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু আসল সমস্যা ওই ঝোঁকগুলি। সেইরূপ ঝোঁকের আভাস ইতিপূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের পয়ারে দেখা দিলেও —রীতিমত rhythmical accent হিসাবে তাহার পরীক্ষা তখনও হয় নাই। বাংলা উচ্চারণ-রীতিতে, শব্দ বা বাক্যাংশের আদ্য-অক্ষরে যেটুকু ঝোঁক পড়ে, তাহাও এই ছন্দের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ছড়ার ছন্দে, আদ্য-অক্ষরে যে ধরনের

স্বরবৃদ্ধি হয়, তাহা দ্বারাও ছন্দস্পন্দের বৈচিত্র্য-বিধান অসম্ভব; তাহাতে ছন্দ একরূপ স্পন্দিত হয় বটে, কিন্তু তাহার সেই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ছন্দের সুরকে কথার অনুকূল করে না। ঈশ্বরগুপ্তের সুরহীন পয়ারও একপ্রকার ছড়ার ছন্দের মত শুনিতে হয়—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে

—ইহার চার-চার পদচ্ছেদ লক্ষণীয়, এবং ইহাও পড়িবার সময়ে প্রতি পর্ব্বের আদ্য-অক্ষরে একটু ঝোঁক দিলে ভাল হয়; ইহাও যেন—

এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন এক কন্যা খান

—এইরূপ ছড়ার খুব নিকট-জ্ঞাতি। এইরূপ ছক-কাটা ছন্দ, ও নিয়মিত ঝোঁক অমিত্রাক্ষরের পক্ষে যে অচল, তাহার প্রমাণ—মিল্‌টনের ছন্দেও ইংরেজী Iambic foot-এর ঘন ঘন নিয়ম-লঙ্ঘন। মধুসূদনের কান বোধ হয় প্রথম হইতেই এই তত্ত্বটিকে আভাসে বুঝিয়া লইয়াছিল। বাংলা ছন্দে একটু ঝোঁকের অবকাশ আছে বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র আদ্য-অক্ষরের ঝোঁক। তথাপি সেই ঝোঁকের বলেই শব্দগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পদচ্ছেদের সৃষ্টি করে। এই পদচ্ছেদ অনুসারেই ঝোঁকগুলির স্থানসন্নিবেশ হইলে, ছন্দ প্রকৃত অমৃতাক্ষর-গুণোপেত হইতে পারিবে—ভাব-অর্থের বিচিত্র ধ্বনিময় অভিব্যক্তিকে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে, এই ধারণা তাঁহার মনে উদয় হইতে বিলম্ব হয় নাই। তথাপি 'তিলোত্তমা'র প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'মেঘনাদে'র মেঘনির্ঘোষ ধ্বনিয়া উঠা বিস্ময়কর বটে; ইহাতে প্রমাণ হয়, মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব দ্রুত হইয়াছিল; অর্থাৎ যে অসাধারণ শ্রম-শক্তিকে প্রতিভার প্রধান লক্ষণ বলা হইয়া থাকে, এই অল্প সময়টুকুতে মধুসূদনের ভিতরে সেই শক্তির পূর্ণ ক্রিয়া চলিতেছিল। তিনি যে এই সময়ে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের ভাষা, এবং ভারতচন্দ্রের পয়ার, এই দুইয়ের সহিত কানের ও মনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিতে-ছিলেন, তাহা খুবই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। ছন্দের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষারও আবির্ভাব হয়; তাই, খাঁটি বাংলা বাক্‌পদ্ধতি আরও ভাল করিয়া আয়ত্ত করার পর, তিনি সেই পদ্ধতিতেই প্রচুর পরিমাণে সাধু সংস্কৃত শব্দ যোজনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন—মিল্‌টনের কাব্যের ধ্বনিবৈভবও যে কেন খাঁটি Saxon ইংরেজী দ্বারা সম্ভব হয় নাই, তাহা তিনি জানিতেন। 'তিলোত্তমা'র যে পংক্তিগুলি আমি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা বাংলা কাব্যভাষার উপর

মধুসূদনের অসাধারণ অধিকারের সাক্ষ্য দিতেছে। সে ভাষা যেমন খাঁটি বাংলা ভাষা, তেমনই তাহাতে যে নূতন ছন্দধ্বনি যুক্ত হইয়াছে, তাহার রূপটিই নূতন—মূল প্রকৃতি নূতন নয়। ইহার পর, এই ভাষারই বাগ্‌বৈভব—তথা ধ্বনিগৌরব—বৃদ্ধি করিয়া, মধুসূদন যে কাব্যসঙ্গীত সৃষ্টি করিলেন, তাহারও মূলে রহিয়াছে সেই খাঁটি বাংলা বাচনভঙ্গি ও বাক্যরীতি; এতবড় কাব্যচ্ছন্দ—এমন সুমহান সঙ্গীতরব সহজ ও স্বাভাবিক বাক্যচ্ছন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইল। এইবার আমি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের ধ্বনিকৌশল যতদূর সম্ভব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

চতুর্থ অধ্যায়

মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষর, পুরাতন পয়ার-ছন্দের রূপান্তর, মাত্রা, অক্ষর, ও ঝোঁক; মিলটনের নিকটে মধুসূদনের ঋণ।

আমি পূর্ব্বে পয়ার ছন্দের যে ক্রমবিবর্ত্তন দেখাইয়াছি, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত চার অক্ষরের পদচ্ছেদ প্রকট বা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—ইহাই ছন্দের সেই আদি প্রবৃত্তির জের। এইরূপ চারের ছক-কাটা, এবং সুরযুক্ত ছিল বলিয়াই, পয়ারে ভাষার ধ্বনি-রূপটি কখনও আমল পায় নাই। শেষে ভারতচন্দ্রের যুগে আসিয়া বাংলা শব্দগুলির পৃথক ধ্বনিমূর্ত্তি এ ছন্দে কিছু কিছু দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে—পদগুলি চারের ছক-কাটা না হইয়া শব্দের আয়তন অনুসারে ভিন্নতর ছেদের সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, রচনা গীতিপ্রধান না হইয়া, বর্ণনা, বিবৃতি ও চিন্তাপ্রধান হওয়ায়, এবং তজ্জন্য, ভাবার্থকে মূর্ত্তিমান করা—শব্দ-ভাণ্ডারকে চিত্রকরের বর্ণভাণ্ডে পরিণত করা অত্যাবশ্যক হওয়ায়—ছন্দকেও 'গীতি' হইতে 'কথা'র অভিমুখী হইতে হইয়াছিল; কবিগণকে —শুধু ছন্দ নয়, শব্দকৌশলের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল। এজন্য এখন হইতে ছন্দের মধ্যে ২, ৩, ৫, ৬-অক্ষরের পদচ্ছেদ দেখা দিয়াছে। ভারতচন্দ্রের কবিতায় ছন্দের উপরে ভাষার কথ্যভঙ্গির প্রভাব আরও বাড়িয়াছে, এবং আবশ্যকমত, একই কবিতায়, পাশাপাশি 'গীতি' ও 'কথা'র সুর স্থান পাইয়াছে, যেমন—

> বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
> কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
> পাটনি বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
> পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে॥

ইহার প্রথম দুই পংক্তির গীতিসুর যেমন স্পষ্ট, তেমনই শেষের চরণ দুইটিতে কথার ছন্দই প্রবল। আমার বিশ্বাস, মধুসূদন এ সকলই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, অথবা অজ্ঞানে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল শব্দ-অনুযায়ী পদচ্ছেদের ভঙ্গিই নয়, মধুসূদনের প্রয়োজন আরও বেশি। নূতন বাংলা গদ্য হইতেই মধুসূদন তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির পক্ষে আরও সুস্পষ্ট সঙ্কেত পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সেই গদ্যের ভাষাও তাঁহার পরিকল্পিত মহাকাব্যের বাগ্‌বন্ধের প্রায়

সমধর্ম্মী। সেই গদ্যের বাক্যবিন্যাসে যে একটা ছন্দের আভাস ছিল, তাহা বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন। ইহার সেই বাক্যচ্ছন্দ নির্ভর করে প্রধানত দুইটি বস্তুর উপরে—(১) বাক্যের অঙ্গসন্ধির ছেদগুলি; (২) শব্দবিশেষের উপরে বাক্যরীতি-গত (syntactical) ঝোঁক। মধুসূদন ভারতচন্দ্রের কবিতাও যেমন পড়িয়াছিলেন, তেমনই বিদ্যাসাগর প্রভৃতির গদ্য-রচনাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। এই সামান্য সঙ্কেতগুলি হইতেই তাঁহাকে তাঁহার ছন্দের প্রাথমিক উপকরণ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। 'তিলোত্তমা' হইতে 'মেঘনাদে' পৌছিয়া তিনি এই ভাব-অর্থের বাক্যচ্ছন্দকেই পয়ারের কাব্যচ্ছন্দের সহিত মিলাইয়া, অমিত্রাক্ষরের সেই আদি রূপটির একটি বড় পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন, তখন—

এ সুন্দর প্রভাকর-পরিধি মাঝারে
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই?

এই গীতিচ্ছন্দের অমিত্রাক্ষর রূপান্তরিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তুতে পরিণত হইয়াছে,—

গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল, ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা, কিন্তু কোথা পাব,
(দীন আমি!) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।

[মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই, একই কারণে, রচনায় কমা-সেমিকোলন কিছু বেশি ব্যবহার করিতেন]

উপরের পংক্তিগুলি পড়িবার সময়ে, কেবল ভাব ও অর্থের অনুযায়ী, বাক্যচ্ছেদ করিলেই, এ ছন্দ যেন আপনিই চলিতে থাকিবে; অথচ, প্রত্যেক চরণের ছন্দ-যতিও (৮ + ৬) ক্ষুণ্ণ হইবে না। কিন্তু পড়িবার সময়ে, নূতন যতিগুলি ছাড়া, আর কি ঘটিতেছে—পদভাগের মধ্যে ভিন্নতর বিরাম-স্থানই শুধু নয়, পদচ্ছেদগুলি কি করিয়া হইতেছে, তাহা আমরা সব সময়ে লক্ষ্য করি না; কিন্তু কবির সেদিকে বিশেষ যত্ন ও দৃষ্টি ছিল। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে যে একটি কৌতুককর সংবাদ আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা সত্যই মূল্যবান। তিনি লিখিয়াছেন, মধুসূদন তাঁহার কাব্য পাঠ করিবার সময়ে, ধীরে ধীরে প্রত্যেক শব্দটির পৃথক উচ্চারণ করিতেন—তাই, তাঁহার পাঠভঙ্গি বড়ই অদ্ভুত বোধ হইত। আমার মনে হয়, ইহা মধুসূদনের কাব্যপাঠ নয়—ছন্দপাঠের

বর্ণনা ; কবি তখন নূতন ছন্দটিকেই তাঁহার শ্রোতৃবর্গের কানে ভাল করিয়া ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন—মিলহীন চরণগুলিকে স্পন্দিত করিবার রীতিটি বুঝাইবার জন্যই ওইরূপ করিয়া পড়িতেন। উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলি পড়িবার সময়ে, আমরাও—ততটা না হইলেও, কতকটা সেইরূপ করিয়াই পড়ি ; অথচ পড়িবার সময়ে তাহা লক্ষ্য করি না ; যথা—

গাঁথিব—নূতন মালা,—তুলি—সযতনে
তব—কাব্যোদ্যানে—ফুল ,—ইচ্ছা—সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে—ভাষা ,—কিন্তু—কোথা পাব,
দীন আমি ! রত্নরাজী ? তুমি—নাহি দিলে,
রত্নাকর ?—কৃপা—প্রভু—কর—অকিঞ্চনে।

উপরে যে ছেদগুলি দেখাইয়াছি, তাহা পদচ্ছেদ মাত্র ; কারণ, ওই ছেদগুলি, প্রত্যেক শব্দের আদ্য-অক্ষরে যে ঠেস বা ঝোঁক পড়ে, তাহারই অনুযায়ী ; শব্দও সর্ব্বত্র একক নহে, সমাস বা অন্বয়ের ফলে তাহা যুক্ত হইতেও পারে। তথাপি, এইরূপ পদচ্ছেদ হইতেই বাংলায় ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হইয়াছে ; সেখানে ঝোঁকগুলি আরও প্রবল বলিয়া ছেদগুলিও অন্যরূপ হইয়া থাকে ; যথা—

গাঁথিব—নূতন মালা, / তুলি—সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে—ফুল ; ইচ্ছা—সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে—ভাষা , কিন্তু—কোথা পাব,
(দীন আমি !)—রত্নরাজী,—তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ?—কৃপা, প্রভু, কর—অকিঞ্চনে।

উপরে উচ্চারণগত ছোট ঝোঁকগুলি বাদ দিয়া—বাক্যরীতিগত (syntactical) বড় ঝোঁকগুলিই দেখাইয়াছি। এইরূপ ঝোঁকের ঠিক আগেই একটি করিয়া ছেদ পড়িতেছে—পদচ্ছেদও সেই ভাবে হইতেছে। এ সম্বন্ধে পরে আরও বলিব।

মধুসূদনের ছন্দের Rhythm বা ছন্দস্পন্দের প্রাথমিক পরিচয় এই পর্য্যন্ত। এক্ষণে আমাকে বাংলা পয়ারের প্রকৃতি, ও তাহাতে এই ঝোঁকের স্থান এবং মূল্য সম্বন্ধে, পুনরায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে।

'মাত্রা' (Quantity), 'অক্ষর' (Syllable), এবং 'ঝোঁক' বা 'স্বরবৃদ্ধি' (Stress, Accent)—ইহাদের কোন-একটা ছন্দের unit বা পরিমাপক হিসাবে, ক্ষুদ্রতম অংশের কাজ করিয়া থাকে। আমাদের বাংলা ছন্দে 'অক্ষর' যে সেই কাজ করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজীতে যাহাকে Syllable বলে, আমাদের অক্ষর তাহাই; যদিও গুণ ও ক্রিয়াহিসাবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে এই অক্ষরের নাম—'বর্ণ'। অক্ষর যে ছন্দের unit বা মাত্রা (এখানে 'মাত্রা' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি), তাহাতে অক্ষর-সংখ্যা কম-বেশি হইবার জো নাই। সংস্কৃত ছন্দও মূলে অক্ষরমাত্রিক; Rhythm বা ছন্দতরঙ্গের জন্য অক্ষরের গুরু-লঘু গুণভেদ, এবং ছন্দে তাহার স্থান যেমনই হউক, —ওই অক্ষরের সংখ্যা সর্ব্বদা ঠিক থাকা চাই। কিন্তু পরে, এই অক্ষর-মাত্রা—যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব-বর্ণ এবং দীর্ঘস্বর-যুক্ত বর্ণের প্রভাব স্বীকার করিয়া—আর এক প্রকার ছন্দের উদ্ভব করিয়াছে; সংস্কৃতে ইহাকে 'জাতি-ছন্দ' বলে। প্রথমে প্রাকৃত বা ভঙ্গ-সংস্কৃত ভাষার কাব্যেই সম্ভবত এইরূপ মাত্রাবৃদ্ধিও ছন্দের ভিত্তি-স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল, এবং শেষে সংস্কৃতেও সেই ছন্দ চলিত হইয়াছিল—সে ইতিহাস আমার জানা নাই; কেবল ইহাই দেখিতেছি যে, বৈদিক ভাষার ছন্দ যেমনই হউক, খাঁটি সংস্কৃত ছন্দ বর্ণবৃত্ত ছিল; এইরূপ Quantity তাহার পরিমাপক ছিল না। বাংলার প্রাকৃতগোত্র-বশে আদিতে তাহার ছন্দও এইরূপ মাত্রাবৃত্ত ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি—পরে মাত্রার প্রভাবমুক্ত হইয়া আমাদের ছন্দ খাঁটি বর্ণবৃত্ত বা অক্ষরসংখ্যামূলক হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সংস্কৃত বা অন্য ছন্দের মত তাহাতে ছন্দস্পন্দের কোন উপকরণ রহিল না—অক্ষরগুলি যেমন সমমাত্রার, তেমনই তাহারা মাত্রাগুণবর্জ্জিত। এরূপ ছন্দ, গানে ভিন্ন কবিতায় চলে না। প্রত্যেক অক্ষরকে স্বরান্ত করিয়া একটা কাল-পরিমিত, যতিযুক্ত চরণ, এবং তাহার বিশিষ্ট ছাঁদটির পুনরাবর্ত্তন—ইহাই এই ছন্দের প্রকৃতি। মাত্রা যেমন ইহার উপাদান নয়, তেমনই Stress বা স্বরবৃদ্ধি এ ছন্দের কোনরূপ সহায় নয়। ইংরেজী ছন্দে অক্ষর বা Syllable-এর একটা হিসাব থাকিলেও, তাহা Stress-প্রধান; সংস্কৃত ছন্দ বর্ণবৃত্ত হইলেও, তাহাতে অক্ষরের মাত্রা-গুণ ছন্দের একটা বড় সহায় হইয়া আছে। আমাদের প্রাচীন বাংলা ছন্দে ওই বর্ণ ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু আমি পূর্ব্বে পদভূমক ছন্দকে—অর্থাৎ, এই জাতীয় বনিয়াদী বাংলা-ছন্দকে 'মাত্রিক'

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।* তাহার কারণ এই যে, আধুনিক পয়ারজাতীয় ছন্দ যেমন দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বর্ণেরও একরূপ মাত্রা-গুণ স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা ছন্দেরই প্রয়োজনে—ছন্দস্পন্দের নয়। আমরা এখন হসন্তবর্ণকে স্বরান্ত করিয়া পড়ি না, অথচ তাহাকেও একটা পূরা unit হিসাবে গণ্য করি; এবং তাহা সম্ভব হইয়াছে—পূর্ব্ব-বর্ণের ওজন বৃদ্ধি করিয়া। যেমন—

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি

ইহার 'সম্‌মুখ' যেমন চার অক্ষর নয়—তিন অক্ষর, তেমনই 'বীর'ও এক অক্ষর না হইয়া দুই অক্ষর। যুক্ত-অক্ষরটির কথা ছাড়িয়া দিলাম; হসন্ত-বর্ণটিকেও একটি পূরা unit ধরিতে হয়, এবং সেজন্য পূর্ব্ব-বর্ণের ওজন বা মাত্রা একটু বাড়াইয়া লওয়া হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, আধুনিক পয়ারজাতীয় ছন্দে, বর্ণসংখ্যার উপরে আর একটা বস্তুর যোগ হইয়াছে; ইহাকেই আমি একরূপ 'Quantity' বা মাত্রা-স্থানীয় করিয়া এ ছন্দকে 'মাত্রিক' বলিয়াছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, রহস্য এমনই যে, উহাও ঠিক মাত্রাবৃদ্ধি নয়; অর্থাৎ, ঐ পূর্ব্ব-বর্ণের ওজন বৃদ্ধির দ্বারাই ছন্দরক্ষা হইতেছে না—হসন্তবর্ণটিকেও ঠিক ওই স্থানে চাই; এই মাত্রাবৃদ্ধির দ্বারা তাহারই মাত্রার অপূর্ণতাটুকু কোনরূপে পূরণ করা হইতেছে; প্রমাণ—

কাশীরাম্ দাস্ কহে—

এই পদটির হসন্তবর্ণ দুইটি উঠাইয়া দিয়া, কেবল তাহার পূর্ব্ব-বর্ণ 'রা' ও 'দা'-এর মাত্রা বৃদ্ধি করিলে,—একটু টানিয়া পড়িলে,—ছন্দই নষ্ট হইয়া যাইবে; ওইরূপ দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলা ছন্দের স্বভাব-বিরুদ্ধ; ওই 'রা' ও 'দা'র পরে হসন্তবর্ণের স্থানটি লোপ পাইলে চলিবে না। বাংলার এই ছন্দকে 'মাত্রিক' বলিবার আরও কারণ এই যে, পদভূমক ছন্দে মাত্রার বিশেষ লক্ষণ না থাকিলেও সাধুভাষার এই বনিয়াদী ছন্দেই তাহার প্রাচীন মাত্রাধর্ম্ম যে এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ, ওই ভাষার ধ্বনি হইতেই আধুনিক পর্ব্বভূমক ছন্দের জন্ম হইয়াছে; এবং তাহাতে মাত্রাবৃত্তের স্পষ্ট আমেজ রহিয়াছে।

এইবার এই খাঁটি বর্ণবৃত্তের বর্ণবিন্যাসে rhythm কি করিয়া সম্ভব হইল তাহাই বলিব। আমাদের উচ্চারণে, শব্দ বা বাক্যাংশের (Phrase) আদ্য-অক্ষরে একটু যে ঝোঁক পড়ে, সে কথা বলিয়াছি। আবার হসন্ত-বর্ণের জন্য পূর্ব্ব-অক্ষরে যে একটু মাত্রাবৃদ্ধি হয়, তাহাও দেখিয়াছি। এই দুইটির সাহায্যে, বাংলা ছন্দে

* 'বাংলা কবিতার ছন্দ' দ্রষ্টব্য।

ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করার উপায় পূর্ব্ব হইতেই ছিল। তথাপি, এ পর্য্যন্ত বাংলা কবিতার ছন্দে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরভঙ্গি প্রশ্রয় পায় নাই—যেন প্রাণের ভাষা, কাব্যচ্ছন্দে ছন্দিত হইতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাঙালীর প্রাণ যে মুক্তিকামনার আবেগে স্পন্দিত হইয়াছিল—ভাবচিন্তার ক্ষেত্রে, নূতন করিয়া যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহে সে অধীর হইয়াছিল, সেই Romantic ভাবোৎসারের ফলে আর সকল আন্দোলনের মত, কাব্যের আদর্শ-কল্পনায় যে বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিল—মধুসূদন তাহারই প্রথম ও প্রধান নেতা; তিনিই, যে বস্তুর সহিত ভাষা অপেক্ষা কবিতার ভাবগত যোগ অধিক, সেই ছন্দকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বাক্যরীতি ও উচ্চারণ-রীতির সহিত যুক্ত করিলেন; তাহাতে সেই পুরাতন অক্ষর, বা স্বরান্ত বর্ণ, তাহার ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই, নূতন গুণ-সমৃদ্ধি লাভ করিল—বাংলা বর্ণবৃত্ত সত্যকার ছন্দ-গৌরবের অধিকারী হইল। অক্ষরগুলি পূর্ব্বের মতই পায়ে পায়ে ঠিক চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের মাথা শস্যশীর্ষের মত দুলিতে আরম্ভ করিল, আমাদের বর্ণবৃত্তেও অক্ষরের স্বরবৃদ্ধি ছন্দকে তরঙ্গিত করিতে লাগিল। এখনও বর্ণ ই ছন্দের পরিমাপক unit হইয়া আছে, কিন্তু অতঃপর Syllable-এর সহিত স্বরবৃদ্ধিও যুক্ত হইল; দীর্ঘস্বর-জনিত মাত্রার (Quantity) কথা পরে বলিব।

কিন্তু ইংরেজী ছন্দের মত আমাদের ছন্দে এই স্বরবৃদ্ধি (accent) প্রাধান্য লাভ করে নাই—তাহার দ্বারা বর্ণের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বাংলায় এই স্বরবৃদ্ধির এমন শক্তি নাই, যাহাতে অক্ষরপরিমাণকে গৌণ করিয়া, ওই স্বর-বৃদ্ধির নিয়মিত বিন্যাসই ছন্দকে ধারণ করিতে পারে। বর্ণের এই প্রাধান্য হেতু আমাদের ছন্দে—ধীর, দ্রুত, মন্থর—কত প্রকার লয় যে সম্ভব হইয়াছে, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ভাল করিয়া পড়িতে জানিলে, তাহা লক্ষ্য করিয়া, মুগ্ধ হইতে হয়। নিয়মিত গুরুলঘু বর্ণপরম্পরার উপরে নির্ভর করে না বলিয়া, এ ছন্দে কণ্ঠস্বরাশ্রিত ভাবের এমন লীলা সম্ভব হইয়াছে। সংস্কৃত গণ-মুক্ত অক্ষরবৃত্তেও এই কারণে কাব্যের ভাবরূপ এমন সজীবতা লাভ করে। বর্ণ বা অক্ষর, এবং এই স্বরবৃদ্ধি—এই দুইয়েরই সহযোগে মধুসূদনের ছন্দ এইরূপ সজীব ও শক্তিশালী হইয়াছে। মিল্টন যে উপাদান ও উপকরণ হইতে এমন অপূর্ব্ব ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—'Syllable', 'Accent' এবং 'Quantity', এ সকলকেই ছন্দ-রাসায়নিক যাদুকরের মত তিনি যেরূপ মিলাইয়াছিলেন,—সে বিষয়ে, মধুসূদনের কেবল ওই Syllable-এর সুবিধাই ছিল, অপর সুবিধাগুলি নিজেকেই করিয়া লইতে হইয়াছিল;

মিল্টনের কেবল Stress-এর সুবিধাই ছিল, অপরগুলিও তিনি নিজের শক্তিবলে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। মধুসূদনের ওই Stress, Accent বা Quantity-র সুযোগ ছিল না—বাংলার পক্ষে সে সুযোগ করিয়া লওয়া একরূপ দৈবীশক্তি-সাপেক্ষই বটে। কোথায় সংস্কৃত বর্ণবৃত্তের সেই স্বরতরঙ্গলীলা—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

অথবা—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি / বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ;

[সংস্কৃত ছন্দেও স্বরবৃদ্ধি একজাতীয় নয় বলিয়া দুইরকমের চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি।]

আর কোথায় সেই বর্ণমাত্রসম্বল নিস্তরঙ্গ পুরানো পয়ার—

রতনরঞ্জিত তার পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংস গতি যেন নূপুরের রব ॥

মধুসূদনের কানে অবশ্য সংস্কৃত অনুষ্টুভের বাজনা বাজে নাই—তাঁহার কানে বাজিতেছিল—

Hail—holy light / offspring—of Heaven—firstborn

* *

কিংবা—

Then feed on thoughts that voluntary move
Harmonious numbers, as the wakeful bird
Sings darkling, and in shadiest covert hid
Tunes her nocturnal song.

অথবা—

Bright effluence of bright essence incre-ate

[চিহ্নগুলি ছন্দ-ব্যাকরণের চিহ্ন নয়। প্রত্যেক চরণে যে প্রবল স্বরবৃদ্ধি (stress) আছে তাহার স্থানে (″) চিহ্ন, এবং যেখানে যেখানে ওই স্বরবৃদ্ধিতে দীর্ঘ স্বরমাত্রার বেগ আছে, সেখানে অক্ষরের নিম্নে (—) চিহ্ন দিয়াছি।]

সংস্কৃতের ছন্দস্পন্দ বাংলায় সম্ভব নয়, কিন্তু কতকটা এই ধরনের তরঙ্গ বাংলায় যে সম্ভব তাহার কারণ পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি; এবং ইংরেজী

ছন্দের সহিত এই ধ্বনিসাদৃশ্যের সম্ভাব্যতাও পূর্ব্বে উদাহরণসহ উল্লেখ করিয়াছি। উপরে উদ্ধৃত দুই ভাষার কবিতার একটি বর্ণবৃত্ত, অপরটি একরূপ Accent-বৃত্ত—ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির জন্য ছন্দই ভিন্নজাতীয়। আসলে, ওই Accent, Syllable এবং Quantity নামগুলির একটা সাধারণ অর্থ থাকিলেও, ভাষাবিশেষে উহাদের প্রত্যেকটির গুণ স্বতন্ত্র। সংস্কৃত Syllable এবং ইংরেজী Syllable যেমন ব্যাকরণ অনুসারে এক হইলেও, কার্য্যত বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ধ্বনিরূপ ধারণ করে, তেমনই ইংরেজীর Stress ও সংস্কৃতের স্বরবৃদ্ধি এক নয়—বাংলারও নহে। Quantity নামে ছন্দের যে সাধারণ উপাদান বুঝায়—দুই বিভিন্ন ভাষায় সেই Quantity-মূলক ছন্দ একইরূপ ধ্বনির সৃষ্টি করে না। উপরি-উদ্ধৃত সংস্কৃত ছন্দে যে Syllable এবং যে Stress বা স্বরবৃদ্ধি আছে, ইংরেজীতেও সেই দুই নামের দুই বস্তুই আছে, এমন কি দীর্ঘ-স্বরও যেমন আছে, তেমনই, যে-স্বরবৃদ্ধি বা Stress আছে, তাহাও সংস্কৃতের যুক্তাক্ষর-পূর্ব্ব বর্ণের প্রায় সমজাতীয়। তথাপি উভয়ের ছন্দধ্বনিতে আদৌ সাদৃশ্য নাই। বাংলা 'অক্ষর' ও সংস্কৃত 'অক্ষর' এক হইলেও, বাংলা পয়ারে যুক্ত বা অযুক্ত হসন্তের ব্যবহার একটু বিচিত্র বলিয়া, অক্ষরের ধ্বনিধর্ম্ম সম্পূর্ণ এক নহে। আবার ইংরেজীর সহিত বাংলা অক্ষরের তুলনা করিলে দেখা যাইবে উহাদের ওজনে কত পার্থক্য রহিয়াছে। ইংরেজী Syllable-এর শোষণশক্তি বাংলা অক্ষরের নাই; বাংলা 'সম্মুখ'-এর 'সম্' যদি এক অক্ষরও হয়, তথাপি তাহা ইংরেজী এক অক্ষর Heaven (Heav'n)-এর সমান নয়; বাংলা 'কবি'র দুই অক্ষর ইংরেজী 'holy'র দুই অক্ষরের সমান হইলেও, 'offspring'-এর সমান নয়। তথাপি মধুসূদন যে বাংলা অমিত্রাক্ষর রচনায় মুখ্যত ইংরেজীর সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহার কারণ, মিল্‌টনের ছন্দ ইংরেজী ছন্দ হইলেও, তাহার মধ্যেই মহাকবি যে সঙ্গীত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার সেই উদারতর নীতি যেন ভাষার ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়াও অতিক্রম করিয়াছে; তাই, অপর একটি ভাষাতেও সেই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছিল; সে যেন ছন্দেরই প্রতিচ্ছন্দ নয়—সেই সঙ্গীতেরই একটা প্রতিরূপ। মিল্‌টনের ছন্দ মধুসূদনের কানে কিরূপ বাজিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহার আভাস দিয়াছি; তাহাতে দেখা যাইবে যে, ইংরেজী Iambic Pentameter-এর বাঁধা foot, এবং নিয়মিত ছোট-বড় ঝোঁক-(accent)-এর দিকে দৃষ্টি রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই; তাহা না হইলে মধুসূদন ইংরেজী ছন্দের বন্ধন

হইতে ওই সঙ্গীতধ্বনিকে পৃথক করিয়া, বাংলায় প্রতিধ্বনিত করিতে পারিতেন না। ইংরেজী অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

"The lack of fixed syllablic quantities is just what I emphasise. This lack makes definite beat impossible; or at least it makes it absurd to scan English verse by feet."

এবং—

"If the student has a good ear he reads the verses as it was meant to be read, as a succession of musical bars (with pitch of course), in which the accent marks the rhythm, and pauses and rests often takes the place of missing syllables."

মধুসূদনের বাংলা ছন্দের পক্ষে, ওই 'definite beat impossible' বড়ই কাজে লাগিয়াছিল; 'succession of musical bars, with pitch of course' তাঁহার কানকে তৈয়ারি করিয়াছিল; এবং বাংলা পয়ারের (৮+৬) পদভাগের succession, তাহারই কতকটা উপযোগী হইয়াছিল। কেবল 'missing syllables'-এর স্থান পূরণ আর কিছু দ্বারা সম্ভব ছিল না—বাংলা বর্ণবৃত্ত তাহা সহ্য করিতে পারে না; তাই মধুসূদনের ছন্দের লয় আরও সংযত ও ধীর-মন্থর—সে ততটা মুক্তপক্ষ নয়। এইবার আমি মধুসূদনের পংক্তিগুলির ধ্বনিনির্ম্মাণ-কৌশলের বিশেষ পরিচয় দিব।

পঞ্চম অধ্যায়

অমিত্রাক্ষরের Rhythm বা ছন্দস্পন্দ।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের stress-গুলিকে আমি স্বরবৃদ্ধি বলিব, যদিও সাধারণ অর্থে আমি 'ঝোঁক' শব্দটিই ব্যবহার করিতেছি। আমাদের উচ্চারণে সর্ব্বদা আদ্য-অক্ষরে যে ঝোঁক পড়ে, তাহা এমন নয় যে, তাহার দ্বারা ছন্দস্পন্দের কাজ চলিতে পারে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পূর্ব্বভূমক ছন্দে এই ঝোঁকের উপরেই একটু জোর দিয়া তাহাকে rhythmical accent করিয়া লওয়া হইয়াছে; কিন্তু, আমি যাহাকে স্বর-বিস্ফোরণ বলিয়াছি ('বাংলা কবিতার ছন্দ'-গ্রন্থে)—এ ঝোঁক সেই ছড়ার ছন্দের ঝোঁকগুলির মত প্রবল নয়; সেরূপ ধাক্কা দিয়া পড়িলে, ছন্দ সাধুভাষার ধ্বনি-ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া ব্যঙ্গ করিতে থাকিবে। এই ঝোঁকগুলি মধুসূদনের ছন্দের কেবল এইটুকু উপকার করিয়াছে যে, সেই ঈষৎ-স্পৃষ্ট বর্ণগুলি চরণের ধ্বনি-প্রবাহকে একেবারে সমতল হইতে দেয় নাই। এগুলিকে স্ফুটতর করিবার জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে তিনি শব্দগুলিতে যে স্বরবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে ভাষা ও শব্দের উপরে তাঁহার কবিজনোচিত অধিকার ও আধিপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়; ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির উপরেই নির্ভর করিয়া, আর কেহ এমন ছন্দসৃষ্টির কৌশল করেন নাই। এই ঝোঁকগুলির মর্ম্ম—তাহাদের বৃদ্ধির তারতম্য, সংখ্যা, ও সজ্জা-কৌশল—তিনি মিল্‌টনের ছন্দ হইতেই উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়াছিলেন। মধুসূদনের ছন্দে আমরা এই ঝোঁকগুলির যে নিয়ম লক্ষ্য করিব, মিল্‌টনের ছন্দেও ঠিক সেইরূপ; সে সম্বন্ধে একজন ছন্দোবিদ্ যাহা বলিয়াছেন, এ প্রসঙ্গের ভূমিকাস্বরূপ এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।—

> "Nor should it be forgotten that the 'sense' of words, their meaning weight, their rhetorical value in certain phrases, constantly affects the theoretical number of stresses belonging to a given line ; in blank verse, for instance, the theoretical five stresses are often but three or four in actual practice, lighter stresses taking their place in order to avoid a pounding monotony."

আমি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর চরণের যে পরিচয় এক্ষণে দিব, তাহার মূলতত্ত্ব এই কথাগুলির মধ্যেই নিহিত আছে। এইবার আমি, এই ঝোঁকগুলির পরিচয় গোড়া হইতেই দিব।—

(১) মাত্র পদচ্ছেদ—ও তজ্জনিত ঝোঁক ; চরণমধ্যে তাহাদের ন্যূনতম ও অধিকতম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।—

জন্মভূমি রক্ষাহেতু | কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ় | শত ধিক তারে !
*　　　*　　　*
নতুবা এসেছি মিছে | সাগরে বাঁধিয়া
এ কনক-লঙ্কাপুরে, | কহিনু তোমারে।
*　　　*　　　*
দানব মানব দেব | কার সাধ্য হেন,
ত্রাণিবে সৌমিত্রি তোরে | রাবণ রুষিলে ?

[৮+৬ ভাগের চৌদ্দ অক্ষরে ন্যূনতম পদচ্ছেদের সংখ্যা—চার, অধিকতম সংখ্যা, ছয়। এইরূপ পদচ্ছেদ যে পর্ব্ব বা foot নয়, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শব্দের আয়তন ও স্বাভাবিক উচ্চারণরীতির ফলে যেখানে যে কয়টি ঝোঁক পড়িতে পারে—কেবল তাহারই একটা হিসাব। প্রবল ঝোঁক বা 'beat'-এর সাহায্যে, আমাদের ভাষায় 'bar' বা অমিতাক্ষর 'foot' যে হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।* প্রাচীন পুঁথির লিপিদোষ, অথবা কবিদেরই অক্ষমতা, কিংবা ছন্দে সুর-সংযোগের ফলে, যে সকল অনিয়ম প্রাচীন বাংলা ছন্দে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে ছন্দপদ্ধতির লক্ষণ নয়।]

(২) ঝোঁকগুলি প্রধান ও অপ্রধান-ভেদে ছন্দকে কিরূপ স্পন্দিত করিতেছে, তাহাই দ্রষ্টব্য।—

হে রাঘবকুল—চূড়া ! তব কুলবধূ
রাখে বাঁধি—পৌলস্তেয় ? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন ? বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু—
*　　　*　　　*
তোমার, ভোমর. শূল, মুষল মুদ্গার,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে !
*　　　*　　　*

* 'বাংলা কবিতার ছন্দ' দ্রষ্টব্য।

নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি—মহাবল রহিলা ভূতলে।
*　　*　　*
নীরব—রবাব, বীণা, মুরজ মুরলী

[প্রধান ঝোঁকের সংখ্যা সাধারণত দুই বা তিনটি, তৎসহ একাধিক অপ্রধান ঝোঁক—ছন্দস্পন্দের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু চরণের মধ্যে, শব্দের উপর পৃথক ঝোঁকের সংখ্যা বাড়াইতে পারিলে ছন্দের ধ্বনিগৌরব বৃদ্ধি হয় এবং ছন্দের বৈচিত্র্য ঘটে।]

(৩) ঝোঁকগুলি প্রায় সমান, বিশেষ বড় ঝোঁক নাই—চরণমধ্যে সমাস-বদ্ধ দীর্ঘ পদের জন্যই এরূপ ঘটে; অথবা, কেবল পদচ্ছেদের ঝোঁকগুলির দ্বারাই ছন্দ স্পন্দিত হইয়া থাকে,—ইহাতে ছন্দে লিরিক সুরের সঞ্চার হয়, যথা—

পিকবর—রব নব—পল্লব মাঝারে
*　　*　　*
কুসুমবন-জনিত পরিমল-সখা
সমীর, জুড়ায় কাণ শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব জনরব সহ—
*　　*　　*
—যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে প্রবাল-আসনে
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা—

(৪) বাংলা উচ্চারণরীতির সাহায্যে চরণমধ্যে কয়েকটি ঝোঁক আমদানি করা সম্ভব হইলেও, তাহাদের পরস্পরের দূরত্ব কত অসমান, তাহাও লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ, পদচ্ছেদের আয়তন দুই হইতে পাঁচ অক্ষর তো হয়ই; তাহার উপর, যদি সমাসের উপদ্রব থাকে, তবে ছয় অক্ষর পর্য্যন্ত হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে, অন্তত চরণের সেই অংশে, বর্ণবৃত্তের বর্ণধ্বনিই ছন্দের লয়কে দ্রুততর করিয়া, সুরের বৈচিত্র্যবিধান করে, যথা—

নয়ন-রঞ্জন—কাঞ্চী / কৃশ—কটিদেশে
*　　*　　*

বনিবাসিনী—দাসী / নমে—রাজপদে
*   *   *

দৈত্যকুলদল—ইন্দ্রে / দমিনু সংগ্রামে
*   *   *

মুছ—অশ্রুবারিধারা / দাশরথি রথি

[এরূপ স্থলে, syllable ও accent দুইয়ে মিলিয়া ছন্দ-সঙ্গীত বৃদ্ধি করিতেছে।]

(৫) বড় ঝোঁকগুলির অবস্থানগুণে চরণমধ্যে ছন্দতরঙ্গের উত্থান-পতন নানা রকমের হইয়া থাকে। মিলটনের ছন্দে এই তরঙ্গ ক্রম-ঊর্দ্ধমুখী হইবার যে সুযোগ আছে—বাংলায় তাহা নাই; কারণ আমাদের ছন্দের বর্ণগুলি বড় ঠাসা, এবং পর্ব্বের আভাসমাত্র নাই বলিয়া, ঝোঁকগুলি কোথাও তেমন ধারাক্রমিক হইতে পায় না। এজন্য, মিল্‌টনের চরণের মত—"O Prínce, O Chiéf of mány-thróned pówers"—ছন্দতরঙ্গের এই ক্রমিক উচ্চতা (rising rhythm), আমাদের ছন্দে সম্ভব নয়। তথাপি তরঙ্গের নানাবিধ উঠা-নামা মধুসূদনের ছন্দেও দেখা যায়। কোথাও মধ্যস্থলে উঠিয়া শেষের দিকে নামিয়া গিয়াছে; কোথাও শেষ পর্য্যন্ত উচ্চতা রক্ষা করিয়াছে; কোথাও বা দুই পদভাগেরই আদিতে সমান উচ্চ হওয়ায়, ছন্দটি আর এক ভাবে দুলিয়াছে।—

অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি
*   *   *

লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে
*   *   *

সোনার প্রতিমা যথা বিমল সলিলে
*   *   *

গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে।
*   *   *

মজালে রাক্ষসকুলে মজিলে আপনি!

এ পর্য্যন্ত, আমি ছোট ও বড় 'ঝোঁক' এবং তদ্দারা ছন্দস্পন্দ-(rhythm)-সৃষ্টির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। এইবার সামান্য ঝোঁকগুলিকে জোরালো করিবার

উপায় এবং সেগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিবার যে কৃতিত্ব, সে সম্বন্ধে সবিস্তারে কিছু বলিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাংলা বাক্যের উচ্চারণে প্রত্যেক পৃথক শব্দের বা বাক্যাংশের আদ্য-অক্ষরে যে একটু ঝোঁক পড়ে, মধুসূদন তাহা দ্বারাই তাঁহার চরণগুলির rhythm-এর গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু এই ঝোঁকগুলি একটু বৃদ্ধি করিতে না পারিলে ছন্দ রীতিমত তরঙ্গিত হইতে পারে না,—যদিও গীতিসুরের ছন্দে তাহার দ্বারাই কাজ চলিতে পারে। অতএব, মিল্‌টন যেমন ইংরেজী শব্দের মৌলিক (Etymological) accent-কেই সাধারণভাবে কাজে লাগাইয়া, তাঁহার অমিত্রাক্ষরের ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন,—তেমনই, মধুসূদনও প্রায় সেই কৌশলে ভাষার সেই সামান্য ঝোঁকগুলিকে বাংলা অমিত্রাক্ষরের উপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি প্রধানত, বাক্যরীতি- এবং শব্দের ভাব-অর্থ-ঘটিত গুরুত্ব ('meaning weight', 'rhetorical value') এই দুইয়ের উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন। কিন্তু, কাব্যের ভাষা গদ্যের ভাষা নয় বলিয়া, যে সকল শব্দালঙ্কার সেই ভাষাকে সমৃদ্ধ করে, তাহাও এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছে। আমি এই উপায়গুলির একটি তালিকা দিলাম।

(১) বাক্যরীতির (Syntactical বা Logical) কারণে শব্দবিশেষে স্বরবৃদ্ধি; অর্থাৎ, বাক্যের মধ্যে যে শব্দগুলি প্রধান—তাহারই উপরে স্বাভাবিক ঝোঁক পড়িয়াছে,—

> ″যা কহিলে—″সত্য,—ওহে ″অমাত্য-প্রধান—
> ″সারণ!—″জানি হে আমি—″এ ভবমণ্ডল
> ″মায়াময়,—″বৃথা এর—″দুঃখ-সুখ যত!
> *　　　*　　　*
> ″নিশায়—পাইলে ″রক্ষা, মারিব—″প্রভাতে।
> *　　　*　　　*
> এ ″বৃথা গঞ্জনা,—প্রিয়ে,—″কেন দেহ ″মোরে?
> ″গ্রহদোষে—দোষী-জনে—″কে নিন্দে—″সুন্দরী?

[এই বাক্যরীতিঘটিত উপায়টিই স্বরবৃদ্ধির প্রধান উপায়—এবং সর্ব্বত্র তাহাই দেখা যাইবে। কিন্তু মধুসূদন ইহার মর্ম্ম যেমন বুঝিয়াছিলেন—যে ভাবে Logical Accent ও Rythmical Accent-

কে তাঁহার ছন্দে এক করিয়া লইয়াছিলেন—তেমনটি তাঁহার পরবর্ত্তী কবিদের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই; তাহার কারণ, তাঁহারা 'অমিত্রাক্ষর'-ছন্দের কেবল ওই নামটাই বুঝিয়াছিলেন—এ ছন্দের জ্ঞানই তাঁহাদের ছিল না।]

(২) উপরে প্রদর্শিত ওই জাতীয় ঝোঁক ছাড়াও আর একপ্রকার ঝোঁক—যাহাকে বক্তার নিজের ভাব-অনুরূপ কণ্ঠস্বরের জোর (Rhetorical বা Emphatic) বলা হইয়া থাকে, তাহাও এই ছন্দে বড় কাজে লাগিয়াছে। এই ধরণের ঝোঁকই সবচেয়ে বড় ঝোঁক—

নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখরণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে!
*　　*　　*
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে!
শতপুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি!
*　　*　　*
হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা তাত, কহ তা' দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে,
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়!

[উপরে আমি কেবল Rhetorical accent-গুলিই চিহ্নিত করিয়াছি—অন্যবিধ ঝোঁকও যথাস্থানে আছে।]

এইবার, কাব্যকলাকৌশল বা শব্দালঙ্কার-ঘটিত ঝোঁকের নমুনা দিব। ইহাকেও দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়—

(ক) অনুপ্রাস। [অনুপ্রাসের দ্বারা কাব্যভাষার সৌন্দর্য্য এবং ছন্দের যে মাধুরী বৃদ্ধি হয়, সে কথা যথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছি। কিন্তু মিল্‌টনের ছন্দের মত মধুসূদনের ছন্দকেও এই অনুপ্রাস কতখানি ধারণ করিয়া আছে, তাহাও লক্ষণীয়, —যেখানে শব্দহিসাবে অতি সামান্য ঝোঁক মাত্র পড়ে, সেখানে এই অনুপ্রাস সেই শব্দকে বাজাইয়া ঝোঁকের কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি সাধন করে। 'মেঘনাদে'র ভাষায় প্রায় আগাগোড়া অনুপ্রাসের এমন ছড়াছড়ি যে, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, মধুসূদন প্রায় প্রতেক চরণকে অল্পবিস্তর অনুপ্রাস-শিঞ্জনে শিঞ্জিত করিয়াছেন— সর্ব্বত্র কেবল ঝোঁকবৃদ্ধির জন্যই নয়। আমি এখানে তাহার কয়েকটি মাত্র, ছন্দস্পন্দের কৌশল-হিসাবে, উদ্ধৃত করিতেছি। এখানেও অন্যবিধ ঝোঁক চিহ্নিত করিব না; যেখানে অনুপ্রাস ছাড়া ঝোঁকের অন্য কারণ আছে, সেখানেও ঝোঁক চিহ্ন দিলাম না।]

সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে।
*   *   *

ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র রণে!

কি সাধ্য আমার সাধিব, রোধি আমি গতি?
*   *   *

রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে,
*   *   *

মানস সকাশে শোভে কৈলাস-শিখরী

আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন!

দ্বিরদরদনির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
*   *   *

কাঁদে অনুসূয়া সই বিলাপি বিষাদে।
*   *   *

এ বর বরণ মম—

উপরে আমি কেবল অনুপ্রাস দ্বারা ঝোঁকবৃদ্ধির উদাহরণ দিলাম; ইহাতে কেবল ঝোঁকের সংখ্যাবৃদ্ধিই হয় না—যেখানে ঝোঁক স্বভাবতই অল্প, সেখানেও তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠে।

(খ) যমক, একই শব্দের পুনঃপ্রয়োগ, চরণের মধ্যে শব্দের মিলজনিত অনুপ্রাস,—প্রভৃতির দ্বারা ছন্দকে স্পন্দিত করিবার উপায়। এইগুলিতে কোথাও আমি ঝোঁক-চিহ্ন দিলাম না; চিহ্ন না দেখিয়া, কেবল একটু মনোযোগ সহকারে আবৃত্তি করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—কোথায় ঝোঁকটি কি কারণে স্পষ্টতর হইয়াছে।—

হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী
*　　*　　*
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে।
*　　*　　*
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা গদাধর যথা।
*　　*　　*
রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
*　　*　　*
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরী, ভবেশ্বর-ভালে।
*　　*　　*
খুল্লতাত বিভীষণ বিভীষণ রণে।
*　　*　　*
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে।

এতক্ষণ আমি, মধুসূদনের ছন্দে, আদ্য-অক্ষরে স্বরবৃদ্ধির দ্বারা ছন্দ স্পন্দিত করিবার নানা উপায় বিশেষ করিয়া দেখাইলাম। এইবার এই স্বরবৃদ্ধির একটি অন্য উপায়, ও তাহার বিশিষ্ট গুণের উল্লেখ করিব। 'মাত্রা' বা 'quantity' বলিতে যে ধরনের স্বরবৃদ্ধি বুঝায়—মধুসূদনের ছন্দে তাহারও অবকাশ রহিয়াছে, দেখা যায়। যদিও দীর্ঘস্বরের গুরুত্ব বাংলা ভাষার স্বভাবসিদ্ধ নয়—বাংলা ছন্দেরও প্রকৃতিগত নয়, তথাপি, ওই-জাতীয় স্বরধ্বনিও ইহার ছন্দস্পন্দকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কোনরূপ হিসাবের মধ্যে ইহাকে পাওয়া না গেলেও, এবং এ ছন্দের Rhythm মুখ্যত ওই ঝোঁকগুলির দ্বারাই সম্পন্ন হইলেও, পাঠক পড়িবার সময়ে কানকে একটু সজাগ রাখিলেই বুঝিতে পারিবেন—কোন্ কোন্ স্থানে অক্ষরের দীর্ঘস্বর সত্যই একটু দীর্ঘত্ব কামনা করে; তাহাতে ছন্দস্পন্দের যেমন বৈচিত্র্য ঘটে, তেমনই তাহার সঙ্গীত-গুণও বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে, ছন্দের সঙ্গীতটি

সম্পূর্ণ আদায় করিবার মত ছন্দরসপিপাসাও পাঠকের থাকা চাই। মাত্রাজাতীয় স্বরবৃদ্ধি হয় দুই কারণে; প্রথম, যুক্তবর্ণের অবস্থান: দ্বিতীয়, দীর্ঘস্বরযুক্ত বর্ণ। আমি এ পর্য্যন্ত স্বরবৃদ্ধির প্রসঙ্গে যুক্তবর্ণের উল্লেখ করি নাই; তাহার কারণ, এই যুক্তাক্ষরের জন্য পূর্ব্ব-অক্ষরে যে ঝোঁক পড়ে তাহা একটু ভিন্ন রকমের—উহা কতকটা সংস্কৃত গুরুবর্ণের মত। 'সম্মুখ সমরে'—এখানে 'সম্মুখে'র 'সম্', 'কশ্চিৎ কান্তা'র 'কশ্', অথবা 'পশ্যতি'র 'প'-এর মত গুরু অক্ষর। যদিও এই গুরুত্ব ঠিক দীর্ঘস্বরযুক্ত অক্ষরের সমতুল্য নয়, তথাপি এই স্বরবৃদ্ধি ঠিক stress-এর মতও নয়; উচ্চারণে একটু দীর্ঘতার আভাস আছে। প্রসঙ্গক্রমে, এইখানে একটা অপণ্ডিত-সুলভ কথা বলিব; প্রাচীন বা আধুনিক সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রীরা এ পর্য্যন্ত তাহা বলিয়াছেন কি না জানি না। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে, যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণও যেমন গুরু, দীর্ঘস্বরমাত্রাও তেমনই গুরু—দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা গণনার মধ্যে আসে না। 'কশ্চিৎ কান্তা'র আদ্য-অক্ষর ওই 'ক', এবং মধ্যের ওই 'কা' এই দুইয়ের স্বরবৃদ্ধি নিশ্চয় একরূপ নহে। অতএব, এমন কথা বলিলে ভুল হইবে না যে, সংস্কৃত ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গের যে বৈচিত্র্য এমন শ্রুতিসুখকর হয় তাহার মূলে আছে, এই বিভিন্ন মাত্রাধ্বনির সমাবেশ—চরণমধ্যে ওই দুই-জাতীয় অক্ষরের গণনা একই হিসাবে করিলে চরণগুলির ধ্বনিবৈচিত্র্য অস্বীকার করা হয়। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। মধুসূদনের ছন্দেও স্বরবৃদ্ধির যে মাত্রাগুণ আছে, তাহার একটি ওই-জাতীয়, অর্থাৎ যুক্তাক্ষরঘটিত। বাংলা সাধুভাষার পর্ব্বভূমক ছন্দে যে Rhythmical accent অধুনা আমরা পাইয়াছি, তাহা কথ্য বাংলার ছড়ার ছন্দের মত ধাক্কাযুক্ত নয়; ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির বশে তাহা ঈষৎস্পৃষ্ট হইয়া থাকে, যুক্তাক্ষর সহযোগে এই ঝোঁক স্ফুটতর হয়। মধুসূদনের ছন্দে এইজন্য ইহার মূল্য সমধিক হইয়াছে। তথাপি ইহাকে আমি খাঁটি stress বা আঘাত-মূলক স্বরবৃদ্ধি না বলিয়া একরূপ মাত্রাগন্ধী 'গুরু'-ঝোঁক হিসাবে ইহার প্রাথমিক আলোচনা করিব। প্রথমে আমি ইহারই কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি; লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইহা সর্ব্বত্র আদ্য-অক্ষরের ঝোঁক নয়।—

দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে

* * *

মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী

হে কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব ! মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী ?

*   *   *

অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে

[ইহার সহিত, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি দুইটিতে যুক্তাক্ষর-পূর্ব্ব বর্ণের ঝোঁক তুলনীয় :—

তোম্‌রা বিপ্র হয়ে ভৃত্যকার্য্য করে' বাড়ি ফিরে'
শাস্ত্র ভুলে, রেখে শুধু আর্কফলা শিরে—

মধুসূদন যে ধরনের ঝোঁক তাঁহার ছন্দে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা স্বরধ্বনি-প্রধান ভাষারই উপযোগী। এ বিষয়ে তাঁহার কান এত সজাগ ছিল যে, তিনি কোথাও প্রাচীন কবিদের মত কোন কারণে, 'হৈল' 'কৈল'—প্রভৃতিরও শরণাপন্ন হয় নাই।]

যুক্তবর্ণঘটিত স্বরবৃদ্ধির—এবং তদ্দ্বারা ছন্দস্পন্দ-সৃষ্টির উপায় সম্বন্ধে ইহার অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এইবার দীর্ঘস্বরঘটিত মাত্রাবৃদ্ধি ও সেই কারণে ছন্দের গৌরববৃদ্ধির নমুনা দিব—

(১) যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণে দীর্ঘস্বর থাকায় তাহার মাত্রাবৃদ্ধি।

রত্নাকর রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী।

*   *   *

নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে।

*   *   *

যাদঃপতি-রোধ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে।

(২) দীর্ঘস্বরের জন্যই অক্ষরের মাত্রাবৃদ্ধি।

ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,

আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি
তোমার।

*   *   *

দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে

*   *   *

সুবর্ণদীপ-মালিনী রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা।

*   *   *

এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ডটঙ্কারে !

*   *   *

ওই ভীম বামকরে

কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্তধামে

পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল !

* * *

উড়িছে কৌশিক ধ্বজ···

সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে···

[মধুসূদন বোধ হয় এইজন্যই, ঐ-কার ও ঔ-কারের ব্যবহারে কার্পণ্য করেন নাই ।]

উপরে দীর্ঘস্বরজনিত স্বরবৃদ্ধির যে উদাহরণগুলি দিলাম, তাহাদের ঠিক ওই গুণ ওই স্থলে আছে কি না—পাঠকের নিজের ছন্দরসবোধ ও আবৃত্তি-কৌশল তাহার মীমাংসা করিবে। আমি কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মধুসূদনের নিজের যে এই দিকে দৃষ্টি ছিল, তাহা, তাঁহার ছন্দ ভাল করিয়া পাঠ করিলে অনুমান করা যায়। তাহা ছাড়া, তাঁহার নিজেরই কথায় একটু প্রমাণ হয় যে, তিনি স্থানবিশেষে বাংলা অক্ষরের দীর্ঘমাত্রা মানিতেন, যথা (একখানি পত্রে)—

Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long....In that description of evening you have the lines—

আইলা তারাকুন্তলা, শশীসহ হাসি
শর্ব্বরী ;

—How, if you throw out the তারাকুন্তলা and substitute সুচারুতারা, you improve the music of the line, because the double syllable ন্ত mars the strength of লা। Read—

আইলা সুচারুতারা, শশীসহ হাসি
শর্ব্বরী—"

—ইহা হইতে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, মধুসূদনের কানে, স্থানবিশেষে এবং শব্দবিশেষে, দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতার প্রয়োজন-বোধ ছিল। ইহার পরে, মধুসূদনের ছন্দ সম্বন্ধে বোধ হয় এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে—

"As we listened, it was easy to believe that 'stress' and 'quantity' and 'syllable' all playing together like a chime of bells, are concordant and not quarrelsome elements in the harmony of modern Bengali Verse."

ষষ্ঠ অধ্যায়

অমিত্রাক্ষর ছন্দের যতি-স্বাচ্ছন্দ্য ও যতি-বৈচিত্র্য।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-চরণে বাংলা ছন্দের একটা প্রাথমিক অভাব দূর করিয়া কি উপায়ে বৃহত্তর ও জটিলতর ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যতদূর সাধ্য সবিস্তারে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে এই ছন্দের অপর প্রধান উপাদান—ইহার নূতন যতি-বিন্যাস, বা যতিস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে কিছু বলিব। মধুসূদন যেমন এই ঝোঁকগুলি দ্বারাই Rhythm সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইলেন, তেমনই ছন্দের ছাঁদ (৮+৬), এবং ছন্দের তরঙ্গটি রক্ষা করিয়া, যে কোন ছেদকে বাক্য বা বাক্যাংশের ছোট-বড় বিরাম-স্থল করিয়া লইতে, তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি ও দেখাইয়াছি, পয়ারের দুই পদভাগের শেষে যে দুইটি যতি আছে, তাহা এখানেও লুপ্ত হয় না; কেবল, চরণান্তিক যতিটি এক্ষণে আর সর্ব্বত্র pause বা বিরাম-যতি হইতে পারিতেছে না; কিন্তু উভয় যতিই সর্ব্বত্র ছন্দ-যতির যাহা কাজ সেই কাজ কবিতেছে, অর্থাৎ, চরণের পদভাগ ঠিক রাখিয়া তাহাব গতিকে পূর্ব্ববৎ ছন্দিত করিতেছে। আমি অতঃপর এই দুই প্রকার যতির দুই পৃথক নাম দিব—ছন্দভাগের যতিকে (Caesura, Harmonic Pause) 'ছন্দ-যতি', এবং বাক্যাংশ বা বাক্যশেষের যতিকে 'বিরাম-যতি' বলিব। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে এই দুই প্রকার যতির পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইবে।—

> বহিছে পরিখারূপে / বৈতরণী নদী /
> বজ্রনাদে, + রহি রহি / উথলিছে বেগে /
> তবঙ্গ, + উথলে যথা / তপ্তপাত্রে পয়ঃ /
> উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ, + / ত্রস্ত অগ্নিতেজে !
> নাহি শোভে দিনমণি / সে আকাশ দেশে, + /
> কিম্বা চন্দ্র, + কিম্বা তারা, + / ঘন ঘনাবলী, /
> উগরি পাবকরাশি, / ভ্রমে শূন্যপথে /
> বাতগর্ভ, + গর্জ্জি উচ্চে, / প্রলয়ে যেমতি /
> পিনাকী, + পিনাকে ইবু / বসাইয়া রোষে ।//

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা—কারণ, (১) এই পংক্তিগুলিতে ছন্দ-যতি ও বিরাম-যতি সর্ব্বত্র নির্ব্বিরোধে

অবস্থান করিতেছে; (২) বিরাম-যতির স্থান একরূপ নহে—৮ অক্ষরের মত, ৩ ও ৪ অক্ষরেও বিরাম ঘটিয়াছে (এ বিষয়ে আরও বৈচিত্র্য দেখা যাইবে); (৩) বিরাম-কালের স্বল্প-দীর্ঘ ভেদ রহিয়াছে। পংক্তিগুলির মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ আছে দুইটি; তৎসত্ত্বেও, সব পংক্তিগুলি মিলিয়া একটি পূর্ণ ছন্দ-মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে অমিত্রাক্ষরের 'Verse Paragraph' বা 'ছন্দ-ব্যূহ' বলে। এ সম্বন্ধে পরে বলিব। এক্ষণে উপরের verse paragraph-টির মধ্যে দুই প্রকার যতি-স্থান লক্ষ্য করিতে বলি; এবং আরও লক্ষ্য করিতে বলি—ওই বিরাম-যতিগুলি সত্ত্বেও সর্ব্বত্র সেই (৮ + ৬)-এর ছন্দ-যতি বজায় রহিয়াছে। ছন্দ-যতির চিহ্ন (/) এইরূপ, বিরাম-যতির চিহ্ন (+) এইরূপ, এবং পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন (//) এইরূপ দিয়াছি।

মধুসূদনের ছন্দে, কোন কোন স্থানে বিরাম-যতি ও ছন্দ-যতির এইরূপ নির্ব্বিরোধ অবস্থান দেখা যায় না, কিন্তু তাহাতে ছন্দ-হানিও হয় নাই। তথাপি, এই ছন্দের স্বাভাবিক (normal) গতি যে ওই নিয়মকেই মানিয়া চলে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, মধুসূদনের ছন্দ মহাকাব্যের ছন্দ, এজন্য এ ছন্দে সর্ব্ববিধ বৈচিত্র্যবিধান যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনই মধুসূদন নিজেও সর্ব্বত্র ছন্দের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহাও নিশ্চিত। আমি এইবার কয়েকটি এমন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, যাহাতে দেখা যাইবে, এই যতি-স্বাচ্ছন্দ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।—

(১) পশিল কাননে দাস ;+/ আইল গর্জ্জিয়া/
সিংহ ;+ বিমুখিনু তাহে , / ভৈরব হুঙ্কারে /
বহিল তুমুল ঝড় , + কালাগ্নি সদৃশ /
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ , + / পুরিল চৌদিকে /
বনরাজি ; + কতক্ষণে / নিবিলা আপনি
বায়ুসখা, + বায়ুদেব / গেলা চলি দূরে। / /

(২) দীপিছে ললাটে /
* শশিকলা' + মহোরগ-ললাটে যেমতি /
মণি ! + জটাজুট শিরে + / তাহার মাঝারে /
জাহ্নবীর ফেনলেখা + / শারদ নিশাতে /
কৌমুদীর রজোরেখা / মেঘমুখে যেন !//

(৩) গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া / কোষাকোষী + ভরা /
হে জাহ্নবী, তব জলে + / কলুষনাশিনী /

তুমি ! + পাশে ঘণ্টা ; / উপহার নানা /
হেমপাত্রে ; + রুদ্ধদ্বার ; + / বসেছে একাকী /
রথীন্দ্র, + নিমগ্ন তপে / চন্দ্রচূড় যেন /
যোগীন্দ্র, + কৈলাসগিরি, / তব উচ্চচূড়ে ।//

উপরে আর সব পংক্তির যতি-স্থান ঠিক আছে, কেবল (*) চিহ্নিত পংক্তিটির যতি-বিন্যাসে যেন নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। এখানে আট-ছয়ের মধ্যবর্ত্তী ছন্দ-যতিটি লোপ পাইয়াছে। এইরূপ আরও একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি—

ভেবে দেখ মনে, শূর, + / কালসর্প-তেজে /
* তবাগ্রজ, + / বিষদন্ত তার / মহাবলী /
ইন্দ্রজিৎ।

ইহার প্রথমটিতে যতিভঙ্গ-দোষ হইয়াছে ;—'মহোরগ-ললাটে', এই শব্দ দুইটির যতি রক্ষা করিতে গেলে অন্বয় রক্ষা হয় না ; অতএব এখানে ছন্দেরই দোষ ঘটিয়াছে। এইরূপ যতিভঙ্গ-দোষ মেঘনাদের ছন্দে অনেক স্থলে আছে ; বিশেষত এক ধরনের যতি-ভঙ্গকে কবি যেন, ভাবের বাক্য-স্রোতে ভাসিয়া, গ্রাহ্য করা আবশ্যক মনে করেন নাই ; যথা—

অলঙ্ঘ্য-সাগর-
সম রাঘবীর চমূ বেড়িছে তাহারে !
*　　*　　*
নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন !

এইরূপ আরও আছে। ইহার কোন কৈফিয়ৎ নাই। কিন্তু উপরে (*) চিহ্নিত দ্বিতীয় পংক্তিটির কথা স্বতন্ত্র। এখানে ছন্দ-যতির স্থান রীতিমত হটিয়াছে—যেন, আট অক্ষরের প্রথম পদভাগকে দুই ভাগ করিয়া (৪ + ৪), তাহার ফাঁকে দ্বিতীয় পদাভাগটিকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে ; ফলে, চরণের মধ্যে দুইটি ছন্দ-যতির স্থষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রথমটিতে ছন্দ-যতি ও বিরাম-যতি—দুই যতিই আছে ; দ্বিতীয়টিতে কেবল ছন্দ-যতিই আছে। এইরূপ যতি-বিপর্য্যয় 'মেঘনাদে'র ছন্দে খুব বেশি না থাকিলেও, ইহাকে ছন্দ-দোষ বলা যাইবে কি না সে বিষয়ে আমি নিসংশয় নহি। মধুসূদন, তাঁহার ছন্দে সর্ব্ববিধ বিরাম-যতির ব্যবস্থা করিয়াও, কোথাও ছন্দ-যতিকে স্থানচ্যুত করেন নাই ; এমন কি, ছন্দের এই অবারিত গতিমুখে, তিনি (৮ + ৬)-এর পরিবর্ত্তে (৬ + ৮)-এর ছন্দর্ভাগও পছন্দ করেন নাই ; কারণ, উহাতে এ ছন্দের প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্য, আমার মনে হয়, যেহেতু

এখানেও কানে ছন্দ ঠিক আছে, অতএব এমন একটা কিছু এখানে ঘটিয়াছে, যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত (৮ + ৬)-এর যতি কোন না কোন প্রকারে বজায় আছে, কান ওই (৮ + ৬)-এর ছাঁদকে হারাইয়া ফেলে না। আমি ইহাতেও সেই (৮ + ৬)-এর ভাগ দেখিতেছি; কেবল, আটের ভাগটি খণ্ডিত (split) হইয়া ছয়ের ভাগকে মাঝে বসাইয়াছে। আরও একটি যতি-ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক—

যোগাতেন আনি
নিত্য ফলমূল / বীর সৌমিত্রি / + মৃগয়া
* করিতেন কভু প্রভু ;

এখানেও, দ্বিতীয় পংক্তিটিতে বিরাম-যতি পড়িয়াছে 'সৌমিত্রি'র পরে; তাহাতে মাঝের ছন্দ-যতিটি যেন লোপ পাইয়াছে; এবং, ওই মাঝের পদটিতে ছয় অক্ষরও নাই। তথাপি, এখানে ছন্দ-যতি লোপ পাইতেছে অন্য কারণে। বিরাম-যতিটি ১১ অক্ষরের পরে থাকা সত্ত্বেও ছন্দ ক্ষুণ্ণ হয় না, তাহার প্রমাণ—

অদূরে শোভিল বনে /—দেউল, + উজলি
সুদেশ।

এখানে যথাস্থানে স্বাভাবিক ঝোঁক পড়ার ফলে, আট অক্ষরের ছন্দ-যতিটি অক্ষুণ্ণ আছে। 'দেউল' শব্দটির উপরে Logical Accent একটু প্রবল হওয়ায়, উহার আগে ও পরে, যে সামান্য যতির প্রয়োজন তাহাতেই, সুকৌশলে ছন্দ-যতি ও বিরাম-যতির বিরোধ মিটিয়াছে। এখানে ছন্দ-যতিটি বিরাম-যতির সহযোগিতা করিতেছে। আবার 'উজলি'র উপরেও বাক্যরীতি-ঘটিত একটু বিশেষ ঝোঁক পড়ে, এজন্য তাহার একটু পৃথক উচ্চারণের ব্যবস্থা ঠিকই হইয়াছে। প্রথম নমুনাটিতে এইরূপ যথাস্থানে আবশ্যকমত ঝোঁক পড়ে না বলিয়াই, ওই ছন্দ-যতিটিকে কষ্টে উদ্ধার করিতে হয়। এখানে 'বীর' ও 'সৌমিত্রি' দুইয়েরই ঝোঁক সমান, এবং শব্দ দুইটি অন্বয়-বদ্ধ, যথা—

নিত্য ফলমূল বীর—সৌমিত্রি, মৃগয়া—

তাই মাঝের ছন্দ-যতিটি রক্ষা করা দুরূহ। পড়িবার সময়ে 'সৌমিত্রি'র উপরে একটু বেশী ঝোঁক দিলে, যতিস্থান বজায় থাকিবে, এবং ছন্দটিও নির্দ্দোষ হইবে।

এই বিরাম-যতির সম্বন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। মধুস্দন তাঁহার ছন্দে, শব্দের মধ্যে বা শেষে হসন্ত-বর্ণ-ধ্বনি সম্বন্ধে বেশ একটু সজাগ ও সতর্ক ছিলেন—ছন্দের স্বর-বৈচিত্র্য, ও যথাস্থানে গীতকলধ্বনির প্রয়োজনে, তিনি হসন্তের ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু যতিস্থানের অক্ষরগুলিকে যতদূর সম্ভব স্বরান্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। 'মেঘনাদে'র যে কোন একটা অংশ পড়িলে দেখা যাইবে—মধুস্দনের ছন্দের যতিস্থানে স্বরান্ত অক্ষরই সংখ্যায় অধিক। উপরের উদ্ধৃত পত্রাংশেও, অন্তত ওই অষ্টম অক্ষরের যতিস্থানে তাঁহার এ বিষয়ে সতর্কতার প্রমাণ রহিয়াছে। ইংরেজী ছন্দেও masculine ও feminine pause নামে যতির যে একটা প্রকারভেদ করা হয়, বাংলায় সেইরূপ এই স্বরান্ত যতিগুলিকে masculine pause বা 'ধীর যতি', এবং ওই হসন্ত-শেষ যতিগুলিকে feminine বা 'ললিত যতি' নাম দেওয়া যাইতে পারে। আমি এখানে মধুস্দনের ছন্দে এই দ্বিবিধ যতির কিছু নমুনা দিব।—

দণ্ডক ভাণ্ডার যার / ভাবি দেখ মনে
কিসের অভাব তার? / যোগাতেন আনি
নিত্য ফলমূল বীর / সৌমিত্রি, মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু, / কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখী, / রাঘবেন্দ্র বলী—
দয়ার সাগর নাথ, / বিদিত জগতে;

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে দেখা যাইবে অধিকাংশ হসন্ত-বর্ণ পদশেষে (যতির স্থানে) না থাকিয়া পদমধ্যে রহিয়াছে। তথাপি এখানে কয়েকটি feminine pause বার বার আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার সহিত অপর যে কোন স্থানের কয়েক পংক্তির তুলনা করিলে দেখা যাইবে, মধুস্দন সাধারণত 'ললিত যতি' অপেক্ষা 'ধীর যতি'রই অধিকতর পক্ষপাতী; আমার মনে হয়, এইজন্যই তিনি বাংলা কর্ম্মকারকে এ-বিভক্তি, এবং বাংলা শব্দের শেষে সংস্কৃতের মত বিসর্গ ব্যবহার করিয়াছেন।—

বননিবাসিনী দাসী / নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি / ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু / পারে কি অভাগী?
হায় আশামদে মত্ত / আমি পাগলিনী!

হেরি যদি ধূলারাশি, / হে নাথ, আকাশে,
পবন-স্বনন যদি, / শুনি দূর বনে,
অমনি চমকি ভাবি, /—মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, / পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজিরাজি, / স্যন্দন, সারথি,
কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ! / আশার ছলনে
প্রিয়ংবদা, অনসূয়া, / ডাকি সখীদ্বয়ে,

যতিস্থানের অক্ষরগুলি চিহ্নিত করিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে, উপরের পংক্তিগুলিতে একটিও 'ললিত যতি' (feminine pause) নাই।

সপ্তম অধ্যায়

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান গৌরব—Verse Paragraph বা পংক্তি-পর্ব্ব, উপসংহার।

এইবার মধুসূদনের ছন্দের যাহা প্রথম ও শেষ, অর্থাৎ প্রধানতম লক্ষণ, তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া এই ছন্দ-পরিচয় শেষ করিব। মধুসূদনের এই মিল্‌টন-অনুগামী ("তব অনুগামী দাস") অমিত্রাক্ষর-ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য—ইহার Verse-Paragraph বা 'পদ্যপংক্তি-ব্যূহ'। বাংলা নামটা একটু শ্রুতিকটু হইল, কিন্তু ঠিক অর্থটি বজায় রাখিতে হইলে নামটিকে আরও ছোট করা দুরূহ। আমি সংক্ষেপে 'পংক্তিব্যূহ' বলিব। এই পংক্তিব্যূহ-রচনাতেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর প্রকৃত ছন্দ-গৌরব লাভ করিয়াছে। কেবল ছন্দ-যতিকে গৌণ করিয়া বিরাম-যতিকে মুখ্য করিয়া তোলাই ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়—এ কথা আমাদের ছন্দশাস্ত্রীরা একবারও ভাবিতে পারেন নাই। বাংলা ছন্দের পরিচয় দিতে গিয়া তাঁহারা, সমুদ্রকেও পুষ্করিণীর, এবং হিমালয়কেও উইঢিবির সমশ্রেণী বলিয়া প্রমাণ করিতেই ব্যস্ত; যাহারা গোঠে-মাঠেই বিচরণ করে, তাহারা পাঁচন-বাড়ি অপেক্ষা বড় মাপকাঠি কোথায় পাইবে? এই Verse-Paragraph-এর জন্যই মধুসূদনের ছন্দ মিল্‌টনের ছন্দের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে—এবং ইহারই গুণে, ওই এক ছন্দে একখানি বৃহৎ কাব্য বিচিত্র সঙ্গীতস্রোতে প্রবাহিত হইয়া, ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুরের আবর্ত্তন রক্ষা করিতে পারিয়াছে; নতুবা, কেবল চরণমধ্যে যতি-স্বাচ্ছন্দ্যের গুণেই ওই এক ছন্দে মহাকাব্য রচনা করা যাইত না। এই Verse-Paragraph-এর আয়তন ছোট বা বড় হইতে পারে; কিন্তু ইহা তিনটি বা চারিটি পংক্তির ব্যাপার নয়। স্বল্প ও দীর্ঘ বিরাম-যুক্ত বহু বাক্য ও বাক্যাংশের সমাহার—বা, সঙ্গীত-সঙ্গতির সহায়ে, একটি ভাব, একটি চিত্র, বা একটি ব্যাখ্যান যে পূর্ণ ছন্দ-রূপ লাভ করে—তাহাই অমিত্রাক্ষরের পংক্তিব্যূহ। এ যেন ছন্দের এক-একটি সৌরমণ্ডল—প্রত্যেক গ্রহের নিজস্ব গতি যেমন আছে, তেমনই, সকলে একটি এক-কেন্দ্রিক বৃহত্তর গতিচক্রের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমি মূল প্রবন্ধের একটি প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই কিছু আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু এখানেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিবার উপায় নাই—কারণ, এ বিষয়ে কোন মাপ-যন্ত্রের আস্ফালন চলিবে না; এখানে কেবল

কাব্যের স্বরে নিজের কান মিলাইতে হয়, এই 'পংক্তিব্যূহ'গুলি বার বার পড়িতে হয়। এ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিক কিছু বলিবার নাই। তাঁহার মতে—

"These combinations or paragraphs are informed by a perfect internal concent and rhythm—held together by a chain of harmony. With a writer less sensitive to sound this free method of versifying would result in mere chaos. But Milton's ear is so delicate that he steers unfaltering through these long involved passages, distributing the the pauses and rests, and alliterative balance with a cunning which knits the paragraph into a coherent regulated whole."

—এ সম্বন্ধে ইহার বেশি কেহ বলিতে বা বুঝাইতে পারেন না। মিল্টনের একটি Verse-Paragraph, ও তাহার পরেই মধুসূদনের একটি, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; পাঠকের যদি একটু ছন্দরস-বোধ থাকে (এবং সেই অনুপাতে ছন্দের ব্যাকরণবিদ্যা কম হয়), তাহা হইলে তিনি, যে বস্তুটি এত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা কানের দ্বারাই বুঝিয়া লইতে পারিবেন।—

Now came still Evening on, and Twilight gray
Had in her sober livery all things clad,
Silence accompanied; for beast and bird,
They to their grassy couch, these to their nests,
Were slunk, and all but the wakeful nightingale;
She all night long her amorous descant sung:
Silence was pleased. Now glowed the firmament
With living sapphires; Hesperus, that led
The starry host, rode brightest, till the Moon,
Rising in clouded majesty, at length
Apparent queen, unveiled her peerless light,
And o'er the dark her silver mantle threw.

এবং—

হাসি দেখা দিল উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে
দুঃখতমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী, মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে; উষার ললাটে
শোভিল একটি তারা শততারাতেজে!
ফুটিল কুন্তলে ফুল নব-তারাবলী!

এই সঙ্গে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' হইতে একটি পংক্তিব্যূহ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে দেখা যাইবে, বিভিন্ন আয়তনের ছোট-বড় পদ, এবং নানাবিধ ঝোঁকের 'rhythm—held together by a chain of harmony'—কি সুন্দর ও সুসম্পূর্ণ ছন্দমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে!—

যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তব চন্দ্রমুখ—অতুল জগতে!
যে দিন প্রথম তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে।
এ পোড়া বদন মুহু হেবিনু দর্পণে,
বিনাইনু যত্নে বেণী, তুলি ফুলরাজি,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে!
চির পবিধান মম বাকল, ঘৃণিনু
তাহায়। চাহিনু, কাঁদি বনদেবী-পদে,
দুকুল, কাঁচলি, সিঁথি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুক্তাহার, কাঞ্চী কটিদেশে।
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে!
হায়রে, অবোধ আমি! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু! পাইলে মধুরে
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী!—
তাবাব যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি!

* * *

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে ইহাব অধিক বলিবার অবকাশ উপস্থিত নাই—বোধ হয়, প্রয়োজনও নাই; অনেক সূক্ষ্ম বিচার যে বাদ পড়িল তাহাও স্মরণ আছে। কিন্তু আজ বাংলা কবিতা ও বাংলা ছন্দের যে দিন আসিয়াছে, তাহাতে সহস্র বিচারে কিছু হইবে বলিয়া আশা করি না। কেবল, যাঁহারা আধুনিক বাংলা ছন্দের পরিচয় লইবেন, তাঁহারা যাহাতে এই একটি কথা বুঝিতে পারেন যে, মধুসূদনের ছন্দ শুধুই একটা নূতন ছন্দ-সৃষ্টি নয়, উহা একাই বাংলা-ছন্দের একটা সম্পূর্ণ পৃথক রাজ্য; আর যাবতীয় বাংলা ছন্দ গীতিচ্ছন্দ, কেবল ভগবানের আশীর্ব্বাদে, আমরা ওই একটি অপর ছন্দ লাভ করিয়াছি—যাহাব দ্বারা কাব্যচ্ছন্দকেই, সাগর-কল্লোল হইতে তটিনীর কলধ্বনি পর্য্যন্ত, সকল সুরে ঝঙ্কৃত

করা যায়; বিশেষ করিয়া, জীবন ও জগতের যাবতীয় প্রত্যক্ষ রূপরসের অনুভূতিকে মানবকণ্ঠেরই বিচিত্র স্বর-ব্যঞ্জনায়, ভাষার ছন্দে প্রকাশ করা যায়। মধুসূদনের ছন্দে সাধু বা সংস্কৃত শব্দের ঝঙ্কার থাকিলেও, তাহা খাঁটি বাংলা বাক্‌পদ্ধতি ও উচ্চারণরীতির ছন্দ; ইহার চরণও পয়ারের চরণ; অতএব, Blank Verse-কে যেমন ইংরেজী 'National Verse' বলা হইয়া থাকে—এই অমিত্রাক্ষরকেও তেমনই আধুনিক বাংলার সেইরূপ বিশিষ্ট ছন্দ বলা যাইতে পারে। ভাষার সেই রূপ, ও সেই ধ্বনির চর্চ্চা এখন আর নাই বলিলেই হয়; তাই, কেবল, এই ছন্দের নির্ম্মাণ-কৌশল বুঝিতে পারিলেই ইহার বিচিত্র ও সূক্ষ্ম শ্রুতিমাধুর্য্যের ধারণা করা যাইবে না; এইরূপ লিখিত আলাপ-আলোচনার দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। ভাষা ও ছন্দের সে সংস্কার পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে হইলে রীতিমত পাঠ-চক্রের ব্যবস্থা করিতে হয়।

সর্ব্বশেষে আমি এই বলিয়া বিদায় লইব যে, মধুসূদন যেমন এই ছন্দ-সৃষ্টির জন্য কোনরূপ ছন্দ-বিজ্ঞান বা ছন্দ-সূত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই—সে বিষয়ে তাঁহার কানই একমাত্র গুরুর কাজ করিয়াছিল, আমিও তেমনই, মধুসূদনের সেই কানের সুরটিকে আমার কানে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি, এবং তাহারই সাহায্যে এই ছন্দ-পরিচয় লিখিয়াছি; কেবল, আমার সেই কানের সাক্ষ্যকে যাচাই করিবার জন্যই ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ সাক্ষ্যও সংগ্রহ করিয়াছি। ছন্দের ব্রহ্মসূত্র নির্ম্মাণ করিবার স্পর্দ্ধা বা দুঃসাহস আমার নাই। ইতিপূর্ব্বে, বাংলা ছন্দের পরিচয়, যে প্রয়োজনে আমারই জ্ঞান ও বুদ্ধিমত লিখিয়াছি, এবারকার প্রয়োজন তদপেক্ষাও গুরুতর। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ—তাঁহার কাব্যের মতই, গত ৪০ বৎসর বাংলা কবিতার বহির্ভূত হইয়া আছে—সে ছন্দ এখন আর কেহ পড়ে না, পড়িতে পারেও না। তাহাও বরং ভাল ছিল; ইহার উপরে, আধুনিক ছন্দপণ্ডিতগণের অত্যধিক পাণ্ডিত্যের দাপটে অমিত্রাক্ষরের পিতৃনাম পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এ ছন্দের ধর্ম্ম ও মর্ম্মের সন্ধান এ পর্য্যন্ত কেহ করিল না, তাহার উপর বাংলা সাহিত্যের ছাত্রগণকে ইহার একটি দুষ্ট নাম (অমিতাক্ষর) শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে! আমি আমার সাধ্যমত, বাংলার এই অদ্বিতীয় ছন্দের যে পরিচয় দিলাম, আশা করি, তদ্দারা, আর কিছু না হউক—বাঙালী কাব্যরসিক বিদ্বজ্জন, ইহার অপূর্ব্ব ধ্বনি-কৌশল ও ইহার মহিমা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিবেন।

তৃতীয় খণ্ড

মধুসূদনের কাব্য-প্রদর্শনী

মেঘনাদ-বধ কাব্য

——ঃ*ঃ——

(প্রথম সর্গ)

কবির প্রার্থনা

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি
রাঘবারি ? কি কৌশলে রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি ! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি !
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি !
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি ! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে !
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে ?

কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক ! উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে ! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত ; উরি, দাসে দেহ পদছায়া ।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা ! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি ।

বীর বাহুর মৃত্যু সংবাদে রাবণ

এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয় ! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে ।
আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে ! কতক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ ;—
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি !
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে ?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই ? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি ? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে !
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে

একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায়, সূর্পনখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল-পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম-গেহে? হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?”

সমুদ্রের প্রতি রাবণ

অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি;—
“কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!

এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি ? হায়, এই কিহে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ?
প্রভঞ্জন-বৈরী তুমি ; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে ! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলি ; বীর বলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু ।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি ।”

রাবণ-চিত্রাঙ্গদা-সংবাদ

কতক্ষণে মৃদু স্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে ;—
“একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী । কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূল্য রতন ?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম ; তুমি

রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?”
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী ;—
“এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে !
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি ! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী !
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে !
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি ! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ে যায় তূলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল-সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।”
নীরবিলা রক্ষোনাথ ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি ;—

“এ বিলাপ, কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্ম্মে হত পুত্রহেতু কি উচিত

ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দু-নিভাননে, তিত অশ্রুনীরে ?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা ;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর-সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈম-সিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, উর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !"

লঙ্কাপুরীর বন্দনা

অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে ; "নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,

আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি!
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী!
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম-করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম!
গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃপতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"

(তৃতীয় সর্গ)

প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি-বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায়রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।

অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি

কহিলা প্রমীলা সতী ; "এইত তুলিনু
ফুলরাশি ; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা ; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে !
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি ।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে ।"
কহিল বাসন্তী সখী ;—"কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি ? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে !
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা ।"

রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী ;—
"কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষঃ-কুল-বধু ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?"
যথা বায়ু-সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে ।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি ,
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা ? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে ।
কতক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী । একবারে শত শঙ্খ ধরি

ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে ; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রথী ; তুরঙ্গমে
সাদীবর ; সিংহাসনে রাজা ; অবরোধে
কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ;
পর্ব্বত-গহ্বরে সিংহ ; বন-হস্তী বনে ;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত !

শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি ;
করপুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মুরতি।
সহসা নাদিল ঠাট ; 'জয় রাম'-ধ্বনি
উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগর-কল্লোল যথা ! ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথি-পানে চাহি, কহিলা কেশরী ;—
"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির-বাহিরে।
নিশীথে কি ঊষা আসি উতরিলা হেথা ?"

বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির-বাহিরে।
"ভৈরবীরূপিণী বামা," কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া !
মায়াময় লঙ্কা-ধাম ; পূর্ণ ইন্দ্রজালে ;
কামরূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি ,
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে
আমি। তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে ?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে !"

হেনকালে হনূ সহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলিপুটে,

(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে !)
কহিলা ; "প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে ;—নৃ-মুণ্ড-মালিনী
নাম মম ; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী ।" আশীষিয়া, বীর দাশরথি
সুধিলা , "কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব ?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে ? কহ শীঘ্র করি !"
উত্তরিলা ভীমা-রূপী ; "বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে ;
নতুবা ছাড়হ পথ ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে ।"
এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশির-মণ্ডিত)
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ-সমীরণে !
উত্তরিলা রঘুপতি ; "শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে ।
অরি মম রক্ষঃ-পতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে" ।
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে ;—
"দেহ ছাড়ি পথ, বলি । অতি সাবধানে,
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে ।"
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ "দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি ! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক ।

না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি ?” কহিলা রাঘব ;—
“চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।”

যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদপুঞ্জে ! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া-দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্‌ঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী !
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা ;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজী-রাজী ;
বোলিছে ঘুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
গিরিচূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দু-পাশে
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দল !
উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।

সর্ব্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ডমালিনী,
কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে
হৈমময় ; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,
বিদ্যাধরী-দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত ! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্বণে !
তার পাছে শূল-পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা !

চলি গেলা বামাকুল। কেহ টঙ্কারিলা
শিঞ্জিনী ; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি ;

আস্ফালিলা শূলে কেহ ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিট্‌কারি ; কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী !

লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব ,—
"কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয় ? কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে !
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি ?"

উত্তরিলা বিভীষণ ; "নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-সম তেজে ! দম্ভোলি-নিক্ষেপি
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে !"

লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে ; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা !

উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃ-মুণ্ডমালিনী ;—
"কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে ?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
খুলি চক্ষুঃ দেখ্ চেয়ে।" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়ুকা ধরি হড় হড় হড়ে !
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।

———

(চতুর্থ-সর্গ)

সীতা-সরমা-সংবাদ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি ! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে !
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর ! শ্রীভর্ত্তৃহরি ; সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর-ভাষী ;
মুরারি-মূরলীধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর ; কীর্ত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার !—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি ?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল , ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি !) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে ।

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে ! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর-বনে !

মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত-মণি ;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে !
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা ! লড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে
শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে ; যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুখ-কাহিনী !
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে !
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন ! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে, সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে !
কতক্ষণে চক্ষু-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর স্বরে ; "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা-দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি !

কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি?"
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা-রত্ন যথা!
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে; আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ! মৃদু-স্বরে কহিলা মৈথিলী;—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,

নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল-মূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!

"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক, নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।
সরসী আরসি মোর! তুলি কুবলয়ে,

(অতুল রতন-সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে !
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা-দুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়ন মণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
কতক্ষণে চক্ষু-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে ;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে ; কি কাজ স্মরিয়া ?—
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে !"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা !) ;—"এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে ? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে ?
"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে ;

সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষিবংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে !
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি !
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে ! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে !
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র-কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,

নানাকথা! এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী!—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী;—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বনবাসে!
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে!
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্ব জন তথা,
জগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী!
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!"

(পঞ্চম সর্গ)

ইন্দ্রজিতের বিদায়

কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।

প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে,.হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি)—"ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল ! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন !
উঠ, চিরানন্দ মোর ! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তে, তুমি রবিচ্ছবি ;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন !
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার ! নয়ন-তারা ! মহার্হ রতন !
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম !" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে !

আবরিলা অবয়ব সুচারু-হাসিনী
শরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে ;—
"পোহাইল এতক্ষণে তিমির-শর্ব্বরী ;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুর্দ্বয় ? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে !
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।"

সাজিলা রাবণ-বধূ, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে ; বামাকুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী !
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে—

প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে !
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য ; নমিল রক্ষক ;
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে !
রতন-শিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতী। বহিলা যান যানবাহ-দলে
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণ-মন্দিরে।

প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু-নিভাননা
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে।
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া।
কহিলা বীর-কেশরী ; "শুন লো ত্রিজটে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে,
নাশিব রাক্ষস-রিপু ; তেঁই ইচ্ছা করি
পূজিতে জননী-পদ। যাও বার্ত্তা লয়ে ;
কহ, পুত্র, পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়াবে
তোমার, হে লঙ্কেশ্বরি !" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিলা শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী)—
"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে !
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে ?
কার বা এ হেন মাতা ?"—এতেক কহিয়া
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে।

বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে।
প্রণমে দম্পতী পদে। হরষে দুজনে
কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী।

কহিলা বীরেন্দ্র ; "দেবি, আশীষ দাসেরে।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে !

শিশু ভাই বীরবাহু ; বধিয়াছে তারে
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে ?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে
নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শর-জালে
লঙ্কা! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর-অতল-জলে!" উত্তরিলা রাণী,
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে ;—
"কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী ;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর ; কাল-সর্প-সম
দয়া-শূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে!
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি!"
হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী ;—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী ? দুইবার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে! ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম ; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী ;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্তে নগেন্দ্র। কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে ?

কি ছার সে রাম, তারে ডরাও আপনি ?”
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে,
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী ; “যাইবি রে যদি ;—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে ! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব ?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই !” কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা, চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে ;—
“থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ !
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।”
বন্দি জননীর পদ বিদায় হইলা
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূ সহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত পথে যজ্ঞ-শালা মুখে।

———

(ষষ্ঠ সর্গ)

মেঘনাদ-বধ

কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে ; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদানে ধূপ ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী

তুমি! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা
হেম-পাত্রে; রুদ্ধ দ্বার;—বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাসগিরি, তব উচ্চ-চূড়ে!

যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠ-গৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণে পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্‌ঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে।

চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ-অর্পণে!
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে? একি লীলা তব,
প্রভাময়?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।

উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে!
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্দ্ধফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!

প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে!

বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম-অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগরদ্বার; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ;—প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে;—
কোন্ মায়াবলে, বলি,? ভুলালে এ সবে
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক্? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ
রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে,
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!"

উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!

মদে মত্ত সদা তুই ; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস সতত
দেবকুলে ! এতদিনে মজিলি দুর্ম্মতি !
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে !”
এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে ! ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে,
ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র ! কহিলা রাবণি,—
“সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে ।
সাজি বীরসাজে আমি । নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে ।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে ;—কি আর কহিব ?”
জলদ-প্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—
“আনায়-মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে ? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে ! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে ? মারি অরি, পারি যে কৌশলে !”
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে !)—“ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ ! নির্লজ্জ তুই । ক্ষত্রিয়-সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে

নাম তোর রথীবৃন্দ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই! তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর? কে তোরে হেথা আনিল, দুর্ম্মতি?"
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে!
বহিল রুধির-ধারা! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ;—নারিলা তুলিতে
তাহায়! কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ! সাপটিলা কোপে
ফলক; বিফল বল সে কাজ-সাধনে!
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধর-শৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে!
চাহিলা দুয়ার-পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে!
"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে—
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলীশম্ভুনিভ

কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"

উত্তরিলা বিভীষণ; "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথি-প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে

এ কথা ! ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া
এখনি ! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি !
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের ! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে ?
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে
কীট-বাস ? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?”

মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ;—
“নহি দোষী আমি, বৎস ; বৃথা ভৎর্স মোরে
তুমি ! নিজ-কর্ম্মদোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি !
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল-সলিলে !
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি ! পরদোষে কে চাহে মজিতে ?”
রুষিলা বাসবত্রাস ! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—“ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে

তুমি ; কোন্ ধর্ম্ম-মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা !
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।”

হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস শরজালে বিঁধেন তারকে !
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী !
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহার-পাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে ;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্তরথী-অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়া, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে !
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে ! সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ-পানে গর্জ্জি ভীমনাদে,

প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী !
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে ;
শূল-হস্তে শূলপাণি ; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে ।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী—
নিষ্ফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে ; কিম্বা সিংহ আনায়-মাঝারে !
ত্যজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র । থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু ! ভৈরব-আরাবে
সহসা পূরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে ! যথায় বসি হৈম-সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচূড়া যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে ।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে !
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল !
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দূরবিন্দু সুন্দর ললাটে !
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে ! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে !

অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীর-কুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক্ তোরে!
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে।
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে!
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি!
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

(সপ্তম সর্গ)

রাবণের যুদ্ধ যাত্রা

রণমদে মত্ত সাজে রক্ষঃকুলপতি ;—
হেমকুট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল ! বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে ।
হেনকালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায় ! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল । রাজপদে পড়িলা মহিষী ।
যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ,—"বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি ;
আমা দোঁহা প্রতি বিধি ! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার ! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব !
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ । যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণী মন্দোদরি ?
বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি ;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবরশিরে ;
গগনরতন শশী চির রাহুগ্রাসে !"
ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে
অবরোধে ! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে ;—

"দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী ; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী ;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে ! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার ! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি ;—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতি-সম ? কিন্তু দেব-নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা ! নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বামতম মম প্রতি ; তেঁই শুকাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল-নিদাঘে !
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে ?
আর কি পাইব তারে ? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন ? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী ;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে ! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি !
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে,
বিশ্বজয়ী ; স্মরি তারে, চল রণস্থলে ;—

মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী !"

———

(অষ্টম সর্গ)

রামের বিলাপ

ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে ! নয়নজল, অবিরল বহি
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,
পড়ে তলে প্রস্রবণ ! শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য ;—বিভীষণ বিভীষণ রণে,
কুমুদ, অঙ্গদ, হনূ, নল, নীল বলী,
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ণ সবে প্রভুর বিষাদে !

চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে ;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনু করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি,
বিপদ্-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ?
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চির ভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,

প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি ! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় ? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে !
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল ! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি !

"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর ?' কি বলে বুঝাব

উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক ? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার ! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"

রামের প্রেতপুরী-দর্শন

পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী,
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
বসন্ত ; অমৃত কিম্বা জীবশূন্য দেহে !
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্ত্তনাদ ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল ; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি ; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে !

কতক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
মহাহ্রদ ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে
কালাগ্নি ! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী
ছটফটি হাহাকারে ! "হায় রে, বিধাতঃ
নির্দ্দয়, সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে
এই হেতু ? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে ?
কোথা তুমি, দিনমণি ? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু ? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে, দেব ? কোথা সুত, দারা,
আত্মবর্গ ? কোথা, হায়, অর্থ, যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ?"
এইরূপে পাপী-প্রাণ বিলাপে সে হ্রদে
মুহুর্মুহুঃ। শূন্যদেশে অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে,—
"বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা ? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে !
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু ?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে !"
নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মূরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে ;
কাটে কৃমি ; বজ্র-নখা মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়া-দেহে ছিঁড়ে নাড়ী-ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে ! আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী !
কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি,—
"রৌরব এ হ্রদ নাম, শুন, রঘুমণি,
অগ্নিময় ! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,
তার চির বাস হেথা ; বিচারী যদ্যপি

অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে ;
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে !
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে,
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর ; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
জ্বলে নিত্য ! চল, রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে ! ওই শুন, বলি,
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি ! মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি !
কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে
চিরবন্দী !" করপুটে কহিলা নৃপতি,
"ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে ! মরিব এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি
এইরূপ ! হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে ? অসহায় নর ; কলুষকুহকে
পারে কি গো নিবারিতে ?" উত্তরিলা মায়া,—
"নাহি বিষ, মহেষ্বাস, এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধে যারে ! তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে ?
কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ-সহ রণে যে সুমতি,
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা ;—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে !
এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি,
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে !"

কতদূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ ; নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটে কুসুমাবলী—বন-সুশোভিনী।
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগিহাস্য যথা।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
মক্ষিক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে,—
"কে তুমি, শরীরি ? কহ, কি গুণে আইলা
এ স্থলে ? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি ?
কহ কথা ; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা-বরিষণে ! যে দিন হরিল
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনা-জনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
ববাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে !"

———

(নবম সর্গ)

প্রমীলার চিতারোহণ

খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
কৌযিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে পূরে দেশ গম্ভীর আরাবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে ;

বাজীরাজী সহ গজ ; রথীবৃন্দ রথে
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে !
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল ! ঝক ঝক ঝকে
স্বর্ণ-বর্ম্ম ধাঁধি আঁখি ! রবিকর-তেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড, শিরোমণি শিরে ;
অসিকোষ সারসনে ; দীর্ঘ শূল হাতে ;—
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে !

স্বর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্ত্যে রতি মৃত-কাম-সহ সহগামী !
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে ; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষস-বধূ। ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সু-চামর ; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে ? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা,
দিনকর-কররাশি তোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি ? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে !
শুকাইলে তরুরাজ, শুকায় রে লতা,
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী। কাতারে, কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে !

উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে ;
বহে হবির্ব্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি ;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তূরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে ; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে ;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী ;
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ ; দেয় হুলাহুলি,
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে !

বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুল-রাজা
রাবণ ;—বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতূরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে ;—
চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষোপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল, বনিতা,
বৃদ্ধ ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে !
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে।

উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গম্ভীরে

মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুর ভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—"লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর"—হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার-রবে!
মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী,
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এতদিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে!"
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন!)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদ-তলে;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তূরী,
কেশর, কুঙ্কুম-আদি দিল রক্ষোবালা

যথাবিধি ; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে !
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ;
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা ! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে !
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ ! বৃথা আশা ! পূর্ব্বজন্ম-ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে !
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির-রাহুগ্রাসে !
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,—
হায়রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে ? হায়রে, কি কয়ে ?
হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"

দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে !
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে !
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে ॥

———

বীরাঙ্গনা কাব্য

সোমের প্রতি তারা

[যৎকালে সোমদেব—অর্থাৎ চন্দ্র—বিদ্যাধ্যয়ন-করণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে বাস করেন, গুরুপত্নী তারাদেবী তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিতা হইয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন। সোমদেব, পাঠ সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে, তারাদেবী আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে পারিলেন না, তিনি সতীত্ব-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সোমদেবকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন। সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকাপাঠে কি করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।]

কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা? গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন; কিন্তু ভাগ্যদোষে,
ইচ্ছা ক'রে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি!—
কি লজ্জা! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,
লিখিলি এ পাপ কথা,—হায় রে, কেমনে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে! হস্তদাসী সদা
তুই; মনোদাস হস্ত; সে মনঃ পুড়িলে
কেন না পুড়িবি তুই? বজ্রাগ্নি যদ্যপি
দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা!
হে স্মৃতি, কুকর্ম্মে রত দুর্ম্মতি যেমতি
নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে
তোমায় পাপিনী তারা! দেহ ভিক্ষা, ভুলি
কে সে মনঃ-চোর মোর, হায়, কেবা আমি!—
ভুলি ভূতপূর্ব্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে!
এস তবে, প্রাণসখে; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে,—ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়ে!
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-পথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ!—তারানাথ? কে তোমারে দিল
এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে!

এ পোড়া মনের কথা জানিল কি ছলে
নামদাতা ? ভেবেছিনু, নিশাকালে যথা
মুদিত-কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে
অন্তরিত ; কিন্তু—ধিক্, বৃথা চিন্তা, তোরে !
কে পারে লুকাতে কবে জ্বলন্ত পাবকে ?
এস তবে, প্রাণসখে ! তারানাথ তুমি,
জুড়াও তারার জ্বালা ! নিজ রাজ্য ত্যজি,
ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি ?
সদর্পে কন্দর্পনামে মীনধ্বজ রথী,
পঞ্চ খর শর তূণে, পুষ্পধনুঃ হাতে,
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী ;—
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে ?

যেদিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যেদিন হেরিল
আঁখি তব চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে !—
যেদিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে !
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে ;
বিনাইনু যত্নে বেণী ; তুলি ফুলরাজি,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে !
চির পরিধান মম বাকল, ঘৃণিনু
তাহায় ! চাহিনু, কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকূল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে !
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে !
হায় রে, অবোধ আমি ! নারিনু বুঝিতে

সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে ?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু ! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী !—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি !

বিদ্যালাভ-হেতু যবে বসিতে, সুমতি,
গুরুপদে ; গৃহকর্ম্ম ভুলি পাপীয়সী
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম সুখে
ও মধুর স্বর, সখে, চির-মধু-মাখা !
কি ছার নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা ?
কি ছার মুরজ, বীণা, মুরলী, তুম্বকী ?
বর্ষ বাক্যসুধা তুমি ! নাচিবে পুলকে
তারা, মেঘনাদে মাতি ময়ূবী যেমতি !

গুরুর আদেশে যবে গাভীবৃন্দ লয়ে,
দূর বনে, সুরমণি, ভ্রমিতে একাকী
বহু দিন ; অহরহঃ, বিবহ-দহনে,
কত যে কাঁদিত তারা, কব তা কাহারে—
অবিরল অশ্রুজল মুছি লজ্জাভয়ে !

গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে !
আশীর্ব্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি !

গুরুর প্রসাদ-অন্নে সদা ছিলা রত,
তারাকান্ত ; ভোজনান্তে আচমন-হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে
বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আনি আমি, পড়ে কি হে মনে ?
হরীতকী-স্থলে, সখে, পাইতে কি কভু

তাম্বূল শয়নধামে ? কুশাসন-তলে,
হে বিধু, সুরভি ফুল কভু কি দেখিতে ?
হায়রে, কাঁদিত প্রাণ হেরি তৃণাসনে ;
কোমল, কমল-নিন্দা ও বরাঙ্গ তব,
তেঁই, ইন্দু, ফুলশয্যা পাতিত দুঃখিনী !
কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে
শয়ন, এ পোড়া মনে, পার কি বুঝিতে ?

পূজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে
তোলা ফুল। হাসি তুমি কহিতে, সুমতি,
"দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি,
রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম !"
কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি ,—
নিশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে
এ কিঙ্করী ; ফুলরাশি তুলি চারিদিকে
রাখিত তোমার জন্যে ! নীর-বিন্দু যত
দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশু-নিধি,
অভাগীর অশ্রুবিন্দু—কহিনু তোমারে !
কত যে কহিত তারা—হায়, পাগলিনী !—
প্রতিফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুখে ?
কহিত সে চম্পকেরে,—"বর্ণ তোর হেরি,
রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে
ও কর-কমলে, সখা, কহিস তাঁহারে,—
'এ বর বরণ মম কালি অভিমানে,
হেরি যে বর বরণ, হে রোহিণীপতি,
কালি সে বর বরণ তোমার বিহনে !' "
কহিত সে কদম্বেরে,—না পারি কহিতে
কি যে সে কহিত তারে, হে সোম, শরমে !—
রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে !

শুনি লোকমুখে, সখে, চন্দ্রলোকে তুমি
ধর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগশিশু
ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে,
কি আর কহিব তার ? শুনিলে হাসিবে,
হে সুহাসি ! নাহি জ্ঞান ; না জানি কি লিখি !
ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে !
ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে
রোহিণীর স্বর্ণকান্তি। ভ্রান্তিমদে মাতি,
সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে !
প্রফুল্ল কুমুদে হ্রদে হেরি নিশাযোগে
তুলি ছিঁড়িতাম রাগে ;—আঁধার কুটীরে
পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে
তোমায় ! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুজলে,
কহিতাম অভিমানে,—'হে দারুণ বিধি
নাহি কি যৌবন মোর,—রূপের মাধুরী ?
তবে কেন'—কিন্তু বৃথা স্মরি পূর্ব্বকথা !
নিবেদিব, দেবশ্রেষ্ঠ, দিন দেহ যদি !
তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে ;
গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা তারে !
দেহ ভিক্ষা—ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবা নিশি ! দিবা নিশি সেবি দাসীভাবে
ও পদযুগল, নাথ,—হা ধিক, কি পাপে,
হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি
এ ভালে ? জনম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি ? ফলিল কি এবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল ?
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু ? কর্ম্মনাশা—পাপ-প্রবাহিণী !—
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ?

ক্ষম, সখে !—পোষা পাখী, পিঞ্জর খুলিলে,
চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্ব্ব কারাগারে !
এস তুমি ; এস শীঘ্র ! যাব কুঞ্জ-বনে,
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে !
দেহ পদাশ্রয় আসি,—প্রেম-উদাসিনী
আমি ! যথা যাও যাব ; করিব যা কর ;—
বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে !

কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব্বজনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা ! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে !
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তারে,
সুধাময় ; কোন্ দোষে দোষী তব পদে
অভাগিনী ? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য, কহ ? আরম্ভি সত্বরে
সে তপঃ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে !
কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি !
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি।

আর কি লিখিবে দাসী ? সুপণ্ডিত তুমি,
ক্ষম ভ্রম ; ক্ষম দোষ ! কেমনে পড়িব
কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল
লেখনী ? আইস, নাথ, এ মিনতি পদে।

লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে,
কাঁপি ভয়ে—কাঁদি খেদে—মরিয়া শরমে !
লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে
লিখিনু ! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিন্ধু তুমি।

আইলে দাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমিলে
দোষ তার, তারানাথ! কি আর কহিব?
জীবন মরণ মম আজি তব হাতে!

দশরথের প্রতি কেকয়ী

[কোন সময়ে রাজর্ষি দশরথ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে তিনি তাঁহার গর্ভজাত-পুত্র ভরতকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে রাজা স্বসত্য বিস্মৃত হইয়া কৌশল্যা-নন্দন রামচন্দ্রকে সে পদ-প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, কেকয়ী দেবী মন্থরা নাম্নী দাসীর মুখে এ সংবাদ পাইয়া, নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে!
কহ তুমি;—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল-কুসুম-ফল-পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ
মুহুর্মুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী?
কেন এত বীণা-ধ্বনি? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধন-জাল? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে?

কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জন-স্রোতঃ কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে ? রঘু-কুল-বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু,
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রথি ?
জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ
দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে !
কহ, শুনি, হে রাজন্ ; এ বয়সে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্য-বলে—ভাগ্যবান্ তুমি
চিরকাল !—পাইলা কি পুনঃ এ বয়সে—
রসময়ী নারী-ধনে, কহ, রাজ-ঋষি ?
হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি !
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,—‘অসত্য বাদী রঘু-কুল-পতি !
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে !
ধর্ম্ম-শব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে !’
অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি,
নররাজ ; কিম্বা দিয়া চূণ কালি গালে
খেদাও গহন-বনে ! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুঞ্জিবে
এ কলঙ্ক ? লোকমাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।
না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে !
নহে গুরু উরু-দ্বয়, বর্ত্তুল কদলী-
সদৃশ ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি

যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,
আর নহে সরু, দেব! নম্র-শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ! সুধা-হীন অধর! লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে!
কিন্তু পূর্ব্বকথা এবে স্মর, নরমণি!—
সেবিনু চরণ যবে তরুণ-যৌবনে,
কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ;—
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হলে!
কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি;—
প্রবঞ্চনা-রূপ ভস্ম মাখে মধুরসে!
এ কুপথে পথী কি হে সূর্য্য-বংশ-পতি?
তুমিও কলঙ্ক-রেখা লেখ স্বললাটে,
(শশাঙ্ক-সদৃশ) এবে, দেব দিনমণি!
ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর,—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যপ্রিয়!
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে? কোথা পুত্র তব
ভরত—ভারত-রত্ন, রঘু-চূড়ামণি?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী?
তিন রাণী তব, রাজা! এ তিনের মাঝে,

কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে? পুত্র তব চারি, নরমণি!
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইলা মনঃ তব? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি?
কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে?—
যাহা ইচ্ছা কর, দেব; কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে? বীতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী! দেশ দেশান্তরে
ফিরিব; যেখানে যাব, কহিব সেখানে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্বজনে!
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
পুষি সারী শুক, দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী।
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে। গাইবে তারা বসি বৃক্ষ-শাখে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি —
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!"

খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গদেহে।
রচি গাথা, শিখাইব পল্লী-বাল-দলে,
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি?
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
(এত যে বয়েস, তবু লজ্জাহীন তুমি!)—
যুবরাজ পুত্র রাম; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ;—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি!
পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন; প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে।
চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন। না থাকে যদি পাপ এ শরীরে;
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী,
বিচার করুন ধর্ম্ম ধর্ম্ম-রীতি-মতে!

———

জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা

[অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা দেবী সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের মহিষী। অভিমন্যুর নিধনানন্তর পার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে দুঃশলা দেবী নিতান্ত ভীতা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন।]

কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে,
হায়, কে কহিবে মোরে,—জ্ঞানশূন্য আমি!

শুন, নাথ, মনঃ দিয়া ;—মধ্যাহ্নে বসিনু
অন্ধপিতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্ত্তা। কহিলা সুমতি—
(না জানি পূর্ব্বের কথা ; ছিনু অবরোধে
প্রবোধিতে জননীরে ;) কহিলা সুমতি
সঞ্জয়,—'বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী
সুভদ্রানন্দনে, দেব ! কি আশ্চর্য্য, দেখ—
অগ্নিময় দশদিশ পুনঃ শরানলে !
প্রাণপণে যোঝে যোধ ; হেলায় নিবারে
অস্ত্রজালে শূরসিংহ ! ধন্য শূরকুলে
অভিমন্যু !' নীরবিলা এতেক কহিয়া
সঞ্জয়। নীরবে সবে রাজসভাতলে
সঞ্জয়ের মুখপানে রহিলা চাহিয়া।

'দেখ, কুরুকুলনাথ',—পুনঃ আরম্ভিলা
দূরদর্শী,—'ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ
পলাইছে সপ্তরথী ! নাদিছে ভৈরবে
আর্জ্জুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে !
পড়িছে অগণ্য রথী, পদাতিক-ব্রজ ;
গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে,
সভয়ে হ্রেষিছে অশ্ব ! হায়, দেখ চেয়ে,
কাঁদিছেন পুত্র তব দ্রোণগুরুপদে !—
মজিল কৌরব আজি আর্জ্জুনির রণে !'
কাঁদিলা আক্ষেপে পিতা ; কাঁদিয়া মুছিনু
অশ্রুধারা। দূরদর্শী আবার কহিলা ;—
'ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী,
কুরুরাজ ! লাগে তালি কর্ণমূলে শুনি
কোদণ্ড টঙ্কার, প্রভু ! বাজিল নির্ঘোষে
ঘোর রণ ! কোন রথী গুণসহ কাটে
ধনুঃ ; কেহ রথচূড়া, রথচক্র কেহ।

কাটিয়া পাড়িলা দ্রোণ ভীম-অস্ত্রাঘাতে
কবচ ; মরিল অশ্ব ; মরিল সারথি !
রিক্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুঝিছে
মদকল হস্তী যেন মত্ত রণমদে !'—
নীরবিয়া ক্ষণকাল, কহিলা কাতরে
পুনঃ দূরদর্শী ;—'আহা ! চিররাহু-গ্রাসে
এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে !
অন্যায়-সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ,
আর্জ্জুনি ! হুঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রথী,
নাদিছে কৌরবকুল জয় জয় রবে !
নিরানন্দে ধর্ম্মরাজ চলিলা শিবিরে।'
হরষে বিষাদে পিতা, শুনি এ বারতা,
কাঁদিলা ; কাঁদিনু আমি। সহসা ত্যজিয়া
আসন সঞ্জয় বুধ, কৃতাঞ্জলি পুটে,
কহিলা সভয়ে,—'উঠ, কুরুকুলপতি !
পূজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু !
ওই দেখ, কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুনী
অধীর বিষম শোকে ! গরজে গম্ভীরে
হনূ স্বর্ণরথচূড়ে ! পড়িছে ভূতলে
খেচর ; ভূচরকুল পলাইছে দূরে !
ঝক্‌ঝকে দিব্যবর্ম্ম ; খেলিছে কিরীটে
চপলা ; কাঁপিছে ধরা থর থর থরে !
পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে কুরু ; পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে
আপনি পাণ্ডব, নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে !
মুহুর্ম্মুহুঃ ভীমবাহু টঙ্কারিছে বামে
কোদণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডত্রাস ! শুন কর্ণ দিয়া,
কহিছে বীরেশ রোষে ভৈরব নিনাদে ;—
'কোথা জয়দ্রথ এবে,—রোধিল যে বলে
ব্যূহমুখ ? শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত ;

তুমি, হে বসুধা, শুন ; তুমি জলনিধি ;
তুমি, স্বর্গ, শুন ; তুমি, পাতাল, পাতালে ;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে
আছ যত, শুন সবে ! না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি !
অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে !'—
অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
পড়িনু, যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
এই অন্তঃপুরে—চেড়ী পিতার আদেশে।
কহ এ দাসীরে, নাথ ; কহ সত্য করি ;
কি দোষে আবার দোষী জিষ্ণুর সকাশে
তুমি ? পূর্ব্বকথা স্মরি চাহে কি দণ্ডিতে
তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ ? কোথায় রোধিলে
কোন্ ব্যূহমুখ তুমি, কহ তা আমারে ?
কহ শীঘ্র, নহে, দেব, মরিব তরাসে !
কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া থরথর করি !
আঁধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে,
নাহি সরে কথা, নাথ, রসশূন্য মুখে !
কাল-অজাগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে
প্রাণী ? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে ?
কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাল্গুনি রুষিলে ?
হে বিধাতঃ, কি কুক্ষণে, কোন্ পাপদোষে
আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে
তুমি ? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে !
নাদিল কাতরে শিবা ; কুকুর কাঁদিল
কোলাহলে ; শূন্যমার্গে গর্জ্জিল ভীষণে

শকুনি গৃধিনীপাল ! কহিলা জনকে
বিদুর,—সুমতি তাত !—'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ ! কুরুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে !' না শুনিলা পিতা
সে কথা ! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে !
ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল !
শরশয্যাগত ভীষ্ম, বৃদ্ধ পিতামহ—
পৌরব-পঙ্কজ-রবি চিররাহুগ্রাসে !
বীর্য্যাঙ্কুর অভিমন্যু হতজীব রণে !
কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল সমরে ?

এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি !
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনুঃ !
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।
এস, নিশাযোগে দোঁহে যাইব গোপনে,
যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদতীরে,
হেরে নিজ প্রতিমূর্ত্তি বিমল সলিলে,
হেরে হাসি সুবদনা সুবদন যথা
দর্পণে ! কি কাজ রণে তোমার ? কি দোষে
দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চ পাণ্ডুরথী ?
চাহে কি হে অংশ তারা তব রাজ্যধনে ?
তবে যদি কুরুরাজে ভালবাস তুমি,
মম হেতু, প্রাণনাথ ! দেখ ভাবি মনে,
সমপ্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী।
ভ্রাতা মোর কুরুরাজ ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি !
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে,
কুটুম্ব উভয় তব ?—আর কি কহিব ?
কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে ?
তবে যদি গুণ দোষ ধর, নরমণি ;—
পাপ অক্ষক্রীড়া-ফাঁদ কে পাতিল, কহ ?

কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা !) ধরিয়া
রজস্বলা ভ্রাতৃবধূ ? দেখাইল তাঁরে
উরু ? কাড়ি নিতে তাঁর বসন চাহিল—
উলঙ্গিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি ?
ভ্রাতার স্বকীর্ত্তি যত, জান না কি তুমি ?
লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী !

এস শীঘ্র, প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি !
নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও
স্বমন্দিরে বসি তুমি ! কে না জানে, কহ,
মহারথী রথীকুলে সিন্ধু-অধিপতি ?
যুঝেছ অনেক যুদ্ধে ; অনেক বধেছ
রিপু ; কিন্তু এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধামে
কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সদৃশ ?
ক্ষত্রকুল-রথী তুমি, তবু নরযোনি ;
কি লাজ তোমার, নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ
রণে তুমি হেরি পার্থে, দেবযোনি-জয়ী ?
কি করিলা আখণ্ডল খাণ্ডবদাহনে ?
কি করিলা চিত্রসেন গন্ধর্ব্বাধিপতি ?
কি করিলা লক্ষ রাজা স্বয়ম্বরকালে ?
স্মর, প্রভু ! কি করিলা উত্তর গোগৃহে
কুরুসৈন্যনেতা যত পার্থের প্রতাপে ?
এ কালাগ্নি কুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে ?
কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে ?

ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে,
সিন্ধুপতি ;—মণিভদ্রে ভুল না নৃমণি !
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে ; পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে !

জানি আমি, কহিতেছে আশা তব কানে—
মায়াবিনী!—'দ্রোণ গুরু সেনাপতি এবে;
দেখ কর্ণ ধনুর্দ্ধরে; অশ্বত্থামা শূরে;
কৃপাচার্য্যে; দুর্য্যোধনে—ভীম গদাপাণি!
কাহারে ডরাও তুমি, সিন্ধুদেশপতি?
কে সে পার্থ? কি সামর্থ্য তাহার নাশিতে
তোমায়?'—শুন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী!
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে!
মুদি আঁখি ভাব,—দাসী পড়ি পদতলে;
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে!
ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এসো ছদ্মবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে;
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে!—
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু-পাণ্ডু-কুলে!

পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশী

[চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। উর্ব্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্ব্বশী নামক ত্রোটক পাঠ করিলে, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।]

স্বর্গচ্যুত আজি রাজা, তব হেতু আমি!—
গতরাত্রে অভিনিনু দেব-নাট্যশালে
লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাম নাটক; বারুণী
সাজিল মেনকা; আমি অম্ভোজা ইন্দিরা।
কহিলা বারুণী,—'দেখ নিরখি চৌদিকে,
বিধুমুখি! দেবদল এই সভাতলে;

বসিয়া কেশব ঐ ! কহ মোরে, শুনি,
কার প্রতি ধায় মনঃ ?'—গুরুশিক্ষা ভুলি,
আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিনু—
'রাজা পুরূরবা প্রতি !'—হাসিলা কৌতুকে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত ;
চারিদিকে হাস্যধ্বনি উঠিল সভাতে !
সরোষে ভরতঋষি শাপ দিলা মোরে !
শুন, নরকুলনাথ ! কহিনু যে কথা
মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে,
কহিব সে কথা আজি—কি কাজ শরমে ?
কহিব সে কথা আজি তব পদযুগে !
যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিন্ধুনীরে,
অবিরাম ; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
স্থির-আঁখি সূর্য্যমুখী ; ও চরণে রত
এ মনঃ !—উর্ব্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি !
ঘৃণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি।
অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে
কলেবর ; ঘোরবনে পশি আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনীবেশে, দিয়ে জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে, শূর ! যদি কৃপা কর,
তাও কহ ;—যাব উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে,
পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা
নিকুঞ্জে ! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে ?
শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে
হেমকূটে। এখনও বসিয়া বিরলে
ভাবি সে সকল কথা ! ছিনু পড়ি রথে,
হায় রে, কুরঙ্গী যথা ক্ষত অস্ত্রাঘাতে !
সহসা কাঁপিল গিরি ! শুনিনু চমকি
রথচক্রধ্বনি দূরে শতস্রোতঃ সম !

শুনিনু গম্ভীর নাদ—'অরে রে দুর্ম্মতি,
মুহূর্ত্তে পাঠাব তোরে শমনভবনে,'—
প্রতিনাদরূপে কেশী নাদিল ভৈরবে!
হারাইনু জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে!
পাইনু চেতন যবে, দেখিনু সম্মুখে
চিত্রলেখা সখী সহ ও রূপমাধুরী—
দেবী মানবীর বাঞ্ছা! উজ্জ্বল দেখিনু
দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে
হেমকূট হৈমকান্তি—রবিকরে যেন!
রহিনু মুদিয়া আঁখি শরমে নৃমণি;
কিন্তু এ মনের আঁখি মীলিল হরষে,
দিনান্তে কমলাকান্তে হেরিলে যেমতি
কমল! ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে!
চিত্রলেখা পানে তুমি কহিলা চাহিয়া,—
'যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে
তমোহীনা; রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা
ছিন্নধূমপুঞ্জ-কায়া; দেখ নিরখিয়া,
এ বরাঙ্গ বররুচি রুচ্যমান এবে
মোহান্তে! ভাঙিলে পাড় মলিনসলিলা
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী
আবার প্রসাদে, শুভে!'—আর যা কহিলে,
এখনো পড়িলে মনে বাখানি, নৃমণি,
রসিকতা! নরকুল ধন্য তব গুণে!
এ পোড়া হৃদয়-কম্পে কম্পমান দেখি
মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি
পড়িলা যে শ্লোক, কবি, পড়ে কি হে মনে?
ম্রিয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে
জীবনদায়ক মন্ত্র, শুনিল উর্ব্বশী,
হে সুধাংশু-বংশ-চূড়, তোমার সে গাথা!

সুরবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে,
নররাজ! কেনই বা না ভুলাবে, কহ?—
সুরপুর-চির-অরি অধীর বিক্রমে
তোমার, বিক্রমাদিত্য! বিধাতার বরে,
বজ্রীর অধিক বীর্য্য তব রণস্থলে!
মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য্য হেরি!
তব রূপগুণে তবে কেন না মজিবে
সুরবালা? শুন, রাজা! তব রাজবনে
স্বয়ম্বর বধূ-লতা বরে সাধে যথা
রসালে, রসালে বরে তেমতি নন্দনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা! রূপগুণাধীনা
নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভবে কি দিবে,—
বিধির বিধান এই, কহিনু তোমারে!
  কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ; সর্ব্ব-অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
যে স্থির-যৌবন-সুধা—অর্পিব তা পদে!
বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণি,
আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে!
  উর্ব্বীধামে উর্ব্বশীরে দেহ স্থান এবে,
উর্ব্বীশ! রাজস্ব দাসী দিবে রাজপদে
প্রজাভাবে নিত্য যত্নে। কি আর লিখিব?
বিষের ঔষধ বিষ—শুনি লোকমুখে।
মরিতেছিনু, নৃমণি, জ্বলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
কৃপা করি! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া।
দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা
যথা, ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,—
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদে!

লিখিনু এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীরে
নন্দনে। ভূমিষ্ঠভাবে পূজিয়াছি, প্রভু,
কল্পতরুবরে, কয়ে মনের বাসনা।
সুপ্রফুল্ল ফুল দেব পড়িয়াছে শিরে!
বীচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে
আমায় কহেন—'তুই হবি ফলবতী।'
এ সাহসে, মহেষ্বাস, পাঠাই সকাশে
পত্রিকা-বাহিকা সখী চারু-চিত্রলেখা।
থাকিব নিরখি পথ, স্থির-আঁখি হয়ে
উত্তরার্থে, পৃথ্বীনাথ!—নিবেদনমিতি!

নীলধ্বজের প্রতি জনা

[মাহেশ্বরী-পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধৃত করিলে,—পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন। রাজা নীলধ্বজ পার্থের সহিত বিবাদপরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আ' '
হ্রেষে অশ্ব; গর্জ্জে গজ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু; মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য;—কিন্তু কোন্ হেতু?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে!
টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে!
খণ্ড মুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে!

অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে ;
নাশ মহেষ্বাস, তারে ! ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে !
জন্মে মৃত্যু ;—বিধাতার এ বিধি জগতে ।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখ-সমরে পড়ি গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে, প্রভু ? পাল', মহীপাল
ক্ষত্রধর্ম্ম—ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ' ভুজবলে ।

হায়, পাগলিনী জনা ! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি ! তব সিংহাসনে
বসেছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে !
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে ।—

কি লজ্জা ! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে ?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী ?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব ? তা না হলে, কহ মোরে, কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি ? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ' সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত ? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি নৃমণি ?
কোথা ধনুঃ, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম, অসি ?
না ভেদি রিপুর বক্ষ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে ? কি কহিবে, কহ,
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে
এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত ?

নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে ;—এ কি ভ্রান্তি তব ?
হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,
স্বৈরিণী ? তনয় তার জারজ অর্জ্জুনে
(কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ, রাজরথী,
নরনারায়ণ-জ্ঞানে ? রে দারুণ বিধি,
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে ?
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে ! আছিল মান,—তাও কি নাশিলি ?
নরনারায়ণ পার্থ ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তার কি যে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ ? কোন্ শাস্ত্রে কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে—এ কাহিনী ? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব-কীর্ত্তন-গান গায়েন সতত।
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে !
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ ! করিলা
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে
ধর্ম্মমতি ! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য্য তিনি
কু-কুলের ? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা ? দ্রৌপদী বুঝি ? আঃ মরি, কি সতী !
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ ! পৌরব-সরসে
নলিনী ! অলির সখী, রবির অধীনী,
সমীরণ-প্রিয়া। ধিক্ ! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা।
লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী ?

জানি আমি কহে লোক রথীকুল-পতি
পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ, বিবেচনা কর,

সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি
স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিতিল।
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী। দ্রোণাচার্য্য গুরু,—
কি কু-ছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি? বসুন্ধরা গ্রাসিল সরোষে
রথচক্র যবে, হায়, যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি,
মহরথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি?
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ; সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে।
কি না তুমি জান রাজা? কি কব তোমারে?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা, মহারথি? হায় রে কি পাপে
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,—হে বিধাতঃ!—পার্থের সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?—
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?

কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা, গুরুজন তুমি,
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা। নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা। দুরন্ত ফাল্গুনি
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ !) নিঃসন্তানা করিল আমারে !
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি ! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে ?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে। এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা ফলিল তা কালে।—
হা প্রবীর ! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশমাস দশদিন নানা কষ্ট সয়ে,
এ উদরে ? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি, বাছা,
এ তাপ ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি ?
হা পুত্র ? শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার ? এই কি রে ছিল তোর মনে ?—
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা ? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে ?
কেন বা জ্বলিস্, মনঃ ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে ? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর ; বিবরে লুকায়ে
কাঁদি খেদে, মর্ অরে মণিহারা ফণি !—
যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নবমিত্র পার্থসহ ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে !
ক্ষত্র-কুলবালা আমি, ক্ষত্র-কুল-বধূ,

কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি ?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে ;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
লভি অন্তে !   যাচি চিরবিদায় ও পদে !
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা ?"   বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা ?"   বলি !

———

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

—।—※—।—

বংশী-ধ্বনি

(১)

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন !
চাতকী আমি, স্বজনি, শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধ'রে থাকি লো এখন ?
যাক্ মান, যাক্ কুল, মন-তরী পাবে কূল ;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ !

(২)

মানস সরসে, সখি, ভাসিছে মরাল, রে,
কমল কাননে !
কমলিনী কোন্ ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে ?
যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে—
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে ?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে শম্বর অরি ;
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে !

(৩)

ওই শুন, পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, রে,
মুরারির বাঁশী !
সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কাণে—
আমি শ্যাম-দাসী।
জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে ;—
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি ?

সৌদামিনী ঘন সনে, ভ্রমে সদানন্দ মনে ;—
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী ?

(৪)

ফুটিছে কুসুমকুল মঞ্জু কুঞ্জবনে, রে,
যথা গুণমণি !
হেরি মোর শ্যামচাঁদ, পীরিতের ফুলফাঁদ,
পাতে লো ধরণী !
কি লজ্জা ! হা ধিক্ তারে, ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী ?
চল, সখি, শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হারাই,—
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো স্বজনি ?

(৫)

সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে, রে,
অবিরাম গতি ;—
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী ;
আমার প্রেম-সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি ? ধিক্ এ কুমতি !
আমার সুধাংশু নিধি— দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ-আঁধারে আমি ? ধিক এ যুকতি !

(৬)

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
গোকুল রতন !
মধু কহে ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙা চরণে,
যথা যাও ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন !
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন।

প্রতিধ্বনি

(১)

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে ?
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাক এ বিরলে, সতি,
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ?
অভয় হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে !

(২)

কুমুদিনী কায়, মনঃ সঁপে শশধরে—
ভুবনমোহন !
চকোরী শশীর পাশে, আসে সদা সুধা-আশে,
নিশি হাসি বিহারয়ে লয়ে সে রতন ;
এ সকলে দেখিয়া কি কোপে কুমুদিনী ?
স্বজনী উভয় তার—চকোরী, যামিনী !

(৩)

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ—
আকাশ-নন্দিনি !
পর্ব্বত-গহন-বনে, বাস তব, বরাননে,
সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি !
নিরাকারা ভারতি, কে না জানে তোমারে ?
এসেছ কি কাঁদিতে গো লইয়া রাধারে ?

(৪)

জানি আমি, হে স্বজনি, ভালবাস তুমি,
মোর শ্যামধনে !
শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে তুমি গো আসি,
শিখিয়া শ্যামের গীত, মঞ্জু কুঞ্জবনে !
রাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি—
রাধা রাধা বলি তুমি ডাকিতে, সুন্দরী !

(৫)

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশসম্ভবে,
ভূতলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পূরিছে আজি হাহাকার রবে!
কত যে কাঁদে রাধিকা কি কব, স্বজনি,
চক্রবাকী যে—এ তার বিরহ রজনী!

(৬)

এস, সখি, তুমি আমি ডাকি দুইজনে
রাধা-বিনোদন;
যদি এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধব
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন!
একশত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতুবরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে!

(৭)

না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল?
জানি পরিহাসে রত, রঙ্গিণি, তুমি সতত,
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
কাঁদ, কাঁদে; হাস, হাসে, মাধব-রমণি!

সখী

(১)

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন!
সহসা হইনু কালা; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন?
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ?

(২)

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে
কুসুমকানন ?
জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী,
পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন ?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন ?

(৩)

হায় লো সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে—
কতই যাতন !
যে জন অন্তরযামী সেই জানে আর আমি,
কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন ?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন।

(৪)

কোথা রে গোকুল-ইন্দু, বৃন্দাবন-সর—
কুমুদ-বাসন !
বিষাদ-নিশ্বাস-বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়,
কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন !
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ !

(৫)

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—
বিষের সদন !
বিরহ-বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে,
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন !
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন !

(৬)

এই দেখ্ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ গাঁথন !
দোলাইব শ্যাম-গলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন !
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন ?

(৭)

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর-বচন !
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন !
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন ?

সারিকা

(১)

ওই যে পাখীটি, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে রে,
সতত চঞ্চল,—
কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী-প্রায়,
জলে যথা জ্যোতিবিম্ব—তেমতি তরল !
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি,
পিঞ্জর ভাঙিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি !

(২)

নিজে যে দুঃখিনী, পরদুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে ;—
আজি ও পাখীর মনঃ বুঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে !

সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন !

(৩)

বন-বিহারিণী ধনী বসন্তের সখী রে—
শুকের সুখিনী ?
বলে ছলে ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে—
কেমনে ধৈরজ ধরি রবে সে কামিনী ?
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে,
রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার-পিঞ্জরে !

(৪)

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে—
হইয়া সদয় ।
ছাড়ি দেহ যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী—
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয় !
সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি,
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি ।

(৫)

এ ছার সংসার আজি আঁধার, স্বজনি রে—
রাধার নয়নে !
কেনে তবে মিছে তারে রাখ তুমি এ আঁধারে,
শফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে ?
দেহ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনমালী ;
লাগুক কুলের মুখে কলঙ্কের কালি !

(৬)

ভাল যে বাসে, স্বজনি, কি কাজ তাহার রে
কুল-মান-ধনে ?
শ্যামপ্রেমে উদাসিনী রাধিকা শ্যাম-অধীনী—
কি কাজ তাহার আজি রত্ন-আভরণে ?
মধু কহে, কুলে ভুলি কর লো গমন—
শ্রীমধুসূদন, ধনি, রসের সদন !

গোধূলি

(১)

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি ?
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি !
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব !

(২)

আইল লো তিমির যামিনী ;
তরুডালে চক্রবাকী বসিয়া কাঁদে একাকী—
কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী !
কিন্তু নিশা-অবসানে হাসিবে সুন্দরী ;
আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী ?

(৩)

ওই দেখ উদিছে গগনে—
জগত-জন-রঞ্জন— সুধাংশু রজনীধন,
প্রমদা কুমুদী হাসে প্রফুল্লিত মনে ;
কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি, তোষে লো নয়ন—
ব্রজ-নিষ্কলঙ্ক-শশী চুরি করে মন।

(৪)

হে শিশির, নিশার আসার !
তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আজি তব জলে,
বৃথা ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার ;
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল,
ভিজাইবে আজি ব্রজে—যত ফুলদল !

(৫)

চন্দনে চর্চ্চিয়া কলেবর,
পরি নানা ফুলসাজ, লাজের মাথায় বাজ ;
মজায় কামিনী এবে রসিক নাগর ;

তুমি বিনা, হে বিরহ, বিকট মূরতি,
কারে আজি ব্রজাঙ্গনা দিবে প্রেমারতি ?

(৬)

হে মন্দ মলয়-সমীরণ !
সৌরভ-ব্যাপারী তুমি, ত্যজ আজি ব্রজভূমি—
অগ্নি যথা জ্বলে তথা কি করে চন্দন ?
যাও হে, মোদিত কুবলয় পরিমলে,
জুড়াও স্বরতক্লান্ত সীমন্তিনীদলে !

(৭)

যাও চলি, বায়ু-কুল-পতি !
কোকিলার পঞ্চস্বর বহ তুমি নিরন্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী !
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন !

———

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায়, অনাহারে স'পি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি ;—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন !

সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে!
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান,
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্!

———

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণকাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি; নানা খেলা খেলিলা হরষে;
যমুনা হয়েছ পার, তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নিকষে
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে?

———

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ; তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—

বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে !
আর কি হে হবে দেখা ?—যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে !

নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্ম্মিল কবে ?
কোন্ জন্ ? কোন্ কালে ? জিজ্ঞাসিব কারে ?
কহ মোরে, কহ, তুমি কলকল-রবে
ভুলি যদি, কল্লোলিনি, না থাক লো তারে !
এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে,
থাকিবে এ কীর্ত্তি তার চিরদিন ভবে,
দীপরূপে আলো করি বিস্মৃতি-আঁধারে ?
বৃথা ভাব, প্রবাহিণি, দেখ ভাবি মনে।
কি আছে লো চিরস্থায়ী এ ভবমণ্ডলে ?
গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে
পাথর ; হুতাশে তার কি ধাতু না গলে ?—
কোথা সে ? কোথা বা নাম ? ধন ? লো ললনে ?
হায়, গত, যথা বিম্ব তব চল-জলে !

বিজয়া-দশমী

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে !—

উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বারোমাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণ-দীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি!"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

———

ব্রজ-বৃত্তান্ত

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রু-ধারা; মুকুতার কম রূপ ধরি?
বৃন্দা,—চন্দ্রাননা দূতী—মোরে ক', রূপসী
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা রাজ-পুরে পশি,
নব-রাজে কর-যুগ ভয়ে যোড় করি?—
বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি তলে
সাঙ্গিল কি এতদিনে গোকুলের লীলা?
কোথায় রাখাল-রাজ পীতধড়া গলে?
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা?—
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা!

———

ভারত-ভূমি

"Italia ! Italia ! O tu cui feo la sorte
Dono infelice di bellezza !"

FILICAIA

'কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি ! ইতালি !
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি।"

কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?—
হায় লো ভারত-ভূমি ! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা ? রতন-সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি !
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি ;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী
(হা ধিক্ !) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্ম্মতি !
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ ; সুধা তিত অতি ?

কবি

কে কবি—কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কিসে যম-দমী ? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।

আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে ;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত-কুসুমের রম্য পরিমলে ;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে !

মিত্রাক্ষর

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ী ! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে !
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে !
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণে ?—
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে ?
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে ।
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে ?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে ?
প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে ?

সৃষ্টিকর্ত্তা

কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কারে
এ রহস্য কথা, বিশ্বে, আমি মন্দমতি ?
পার যদি, তুমি দাসে কহ, বসুমতি !—
দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি—ভিক্ষা, চিনিবারে
তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি,—

ভ্রম অসম্ভ্রমে শূন্যে ! কহ, হে আমারে,
কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,—
যাঁর আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সঞ্চারে
তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জ্বলে ?—
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে
কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে,
নিশানাথ ! নদকুল, কহ, কলকলে,
কিম্বা তুমি, অম্বুপতি, গম্ভীর-স্বননে।

নূতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুকায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে !
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল !
বাড়িতে লাগিল বেলা ; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে ;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি ;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
উষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী !

শ্যামা-পক্ষী

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জ-বিহারী
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস্ সুস্বরে ?

ক' মোরে, পূর্ব্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
মনঃ তোর? বুঝা রে যা বুঝিতে না পারি!
সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে
অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি?
রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীত-ধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি?
কে ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে?—
কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।
দুখের আঁধারে মজি গাইস্ বিরলে
তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু-বরিষণে!
কে জানে যাতনা কত তোর ভব-তলে?—
মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে!

সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ব্বরী?
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে?
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে?—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে।

সাগরে তরী

হেরিনু নিশায় তরী অপথ সাগরে,
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে,
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি, ধীরে ধীরে চলে,
রঙ্গে সুধবল পাখা বিস্তারি অম্বরে।
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে
দীপাবলী, মনোহরা নানা বর্ণ করে,—
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, মিশ্রিত পিঙ্গলে।
চারিদিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুস্বরে
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী
বামারে, বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি।
ছাড়িতেছে পথ সবে আস্তে ব্যস্তে সরি,
নীচজন হেরি যথা কুলের যুবতী।
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি,
শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি।

যশঃ

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বলিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কিরে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?
অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে?
শূন্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে;
দেব-শূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে
দেবতা; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে।

সেইরূপে, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে
যশোরূপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্ত্যে বাস করে ;—
কুযশে নরকে যেন, সুযশে—আকাশে !

সাংসারিক জ্ঞান

"কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে ?
স্ব-তরীতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
সংসার-সাগর-জলে স্নেহ করি মনে
কোন জন ? দেবে অন্ন অর্দ্ধমাত্র খায়ে,
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে ?
ছিঁড়ি তার-কুল, বীণা ছুড়ি ফেল দূরে !"—
কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি ।
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি ?
উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি !

আরও দুইটি কবিতা

বঙ্গভূমির প্রতি

রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,—
মধুহীন ক'রো না গো তব মনঃ-কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,—
অমর কে কোথা কবে ?
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে, জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে,—
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেইধন্য নরকুলে,
লোকে যা'রে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতিজলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস—কি বসন্তে, কি শরদে।

———

আত্মবিলাপ

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে ?
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না একি দায় ?

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কতদিন রবে ?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝলঝলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?

নিশার স্বপনসুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভা দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে।
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে,
এ তিনের ছলসম ছল রে এ কু-আশার।

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে ;
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত পাবক-শিখা- লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি ;
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি ; এবে রে পরাণ কাঁদে।

বাকী কি রাখিলি তুই, বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে,
কমল তুলিতে।
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষ-জ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে ?

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়,
কব তা কাহারে ?
সুগন্ধ কুসুমগন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়
কাটিতে তাহারে ;—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ,
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে, অনিদ্রায় ?

মুকুতাফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কাল-সিন্ধু-জলতলে
ফেলিস্ পামর।
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে অবোধ মন !
হায় রে ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে ?"

———

প্রসিদ্ধ এবং স্মরণীয় কাব্য-পংক্তি

কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

—মেঘনাদবধ, প্রথম সর্গ।

*　　*　　*

ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?—

—ঐ, প্রথম সর্গ।

*　　*　　*

কুসুমদাম-সজ্জিত দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী ; কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকিরে এখানে ?

—ঐ, প্রথম সর্গ।

*　　*　　*

অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি !

—ঐ, প্রথম সর্গ।

*　　*　　*

অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ?

—ঐ, প্রথম সর্গ।

*　　*　　*

মলম্বা-অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ, বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর !

—ঐ, দ্বিতীয় সর্গ।

* * *

পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?

—ঐ, তৃতীয় সর্গ।

* * *

যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর তাহার পরশে।

—ঐ, তৃতীয় সর্গ।

* * *

নিশায় পাইলে রক্ষা মারিব প্রভাতে।

—ঐ, তৃতীয় সর্গ।

* * *

তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।

—ঐ, চতুর্থ সর্গ।

* * *

সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারা-রত্ন যথা !

—ঐ, চতুর্থ সর্গ।

* * *

বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।

—ঐ, পঞ্চম সর্গ।

* * *

মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে।

—ঐ, ষষ্ঠ সর্গ।

মারি অরি পারি যে কৌশলে।

—ঐ, ষষ্ঠ সর্গ।

*　　　*　　　*

স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ?

—ঐ, ষষ্ঠ সর্গ।

*　　　*　　　*

গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা।

—ঐ, ষষ্ঠ সর্গ।

*　　　*　　　*

দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে ?

—ঐ, ষষ্ঠ সর্গ।

*　　　*　　　*

এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হ'তে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক ! চিরস্থায়ী, হায় সে বেদনা—
সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে !

—ঐ, সপ্তম সর্গ।

*　　　*　　　*

ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি'
চতুরঙ্গে, রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে !

—ঐ, সপ্তম সর্গ

*　　　*　　　*

বন-সুশোভন শাল ভূপতিত আজি ;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর-শিরে ;
গগন-রতন শশী চির-রাহুগ্রাসে ।

—ঐ, সপ্তম সর্গ ।

* * *

নাহি বিষ, মহেম্বাস, এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধে যারে ! তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে !

—ঐ, অষ্টম সর্গ ।

* * *

যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙালী ।

—ঐ, অষ্টম সর্গ ।

* * *

মম ভাগ্যদোষে
ভুলিলা স্ব-ধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি !

—ঐ, নবম সর্গ ।

* * *

রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয় ? যে তরুরাজ জলে তার তেজে
অরণ্যে, মলিন-মুখ সেও হে সে কালে !

—ঐ, নবম সর্গ ।

* * *

বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে !

—ঐ, নবম সর্গ ।

* * *

স্বর্ণ-অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে
কণ্ঠে, হস্তে, পরে না কি রজত চরণে ?

—বীরাঙ্গনা, ষষ্ঠ সর্গ ।

* * *

মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি !

—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী ; বঙ্গভাষা।

* * *

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে !

করি ভস্মরাশি, ফেল, কর্ম্মনাশা-জলে !—

—ঐ, কোন পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া।

* * *

ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার

পথিক ধাঁধিতে !

—আত্মবিলাপ।

* * *

মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে।

—বঙ্গভূমির প্রতি।

নির্দ্দেশিকা